বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী

বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা — চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান

অধ্যাপক শাহেদ আলী

প্রকাশক ঃ
এন, এম, হাবিবউল্লাহ
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ২২৭৩২৫
ঢাকা অফিস ঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
১৫০-১৫২, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৯৭
পৌষ, ১৪০৩
রমজান, ১৪১৭
স্বত্ব ঃ লেখক
প্রচ্ছদ ঃ
সমর মজুমদার
কম্পোজ ঃ এপেক্স কম্পিউটার
৬৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মুদ্রণঃ
আল-মানার প্রিন্টিং প্রেস
১০, নন্দলাল দত্ত লেন,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।
দাম ঃ ৮৫.০০ টাকা।

Bangla Shahittaye Chattragramer Aubodan By Professor Shahed Ali. Published by N. M. Habib Ullah, Director-in-charge, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Manjil, Jubilee Road, Chittagong. Phone : 227325. Dhaka Office : : 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Phone :: 9569201 Sales Center : 150-152, New Market, Dhaka-1205 & Niaz Manjil Jubilee Road, Chittagong Second Edition : January, 1997.

Price Tk. 85.00 US $ 8.5 ISBN : 984-493-019-7

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব শাহেদ আলী পেশাগত জীবনে বহু কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। সৃষ্টি কর্মের দিক দিয়ে তিনি মূলতঃ কথা শিল্পী হলেও প্রবন্ধ রচনার জন্য ও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর "বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৫ ইং সনে। বইটি তখন প্রকাশ করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল। এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে চট্টগ্রামের প্রায় সকল লেখকের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য কর্ম এতে তুলে ধরা হয়েছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি ছিলো একটি পথিকৃৎ গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও এতে বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের পরিচয় রয়েছে। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে এর একটি গুরুত্ব রয়েছে। বহু বছর বইটি বাজারে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ কোঃ বুঃ সোঃ লিঃ এর পক্ষে এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের সামনে আবার পেশ করার জন্য আমরা এর পূনর্মুদ্রনের ব্যবস্থা করে। আশা করি এ বইটি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাংলা ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সমাদৃত হবে। এবং সাহিত্য গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা মিটাতে কিছুটা সহায়ক হবে।

এন, এম হাবীব উল্লাহ্

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

বাংলাদেশ কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বইটি সাবেক চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয় খৃষ্টীয় ১৯৬৫ সালে। আমি চট্টগ্রাম থেকে চলে আসার পর বইটি মুদ্রিত হয়েছিল বিতরণের কি ব্যবস্থা হয়েছিলো আমি জানি না। গ্রন্থকার হিসাবে আমাকে মাত্র একটি কপি দেয়া হয়েছিলো। সেই কপিটিও সম্ভবত অন্য কেউ নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি আর ফেরত দেননি। এর পরে শত চেষ্টা করেও আমি আর সেটি সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিলো বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমি আগা-গোড়া দেখে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্প্রসারন করবো। কিন্তু বইয়ের মূল কপি হাতে না থাকায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তিরিশ বছরেরও আমি অধিক কাল পরে বইটি আবার পূন মুদ্রিত হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার অতৃপ্তি রয়ে গেলো। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকাশনা পরিচালক প্রফেসর এন, এম হাবিবুল্লাহ এবং চেয়ারম্যান জনাব আ, জ, ম, শামসুল আলমের উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়েছে। কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরম করুনাময় আল্লাহ তৌফিক দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করনটি পূর্ণতর কলেবরে প্রকাশের জন্য এরাদা রাখি। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে স্নেহ ভাজন মাছুম খানের আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম প্রশংসার দাবী রাখে।

অধ্যাপক শাহেদ আলী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান" প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৬৫ সনে। চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের তদানীন্তন সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আমাদের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর স্বাপ্নিক জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমদ নিজে উদ্যোগী হয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত কথাশিল্পী জনার শাহেদআলী তখন চট্টগ্রামে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি নিজে চট্টগ্রামের লোক না হয়েও জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমদ ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব এ, এ রেজাউল করিম চৌধুরীর অনুরোধে গ্রন্থটি রচনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। এর ভূমিকা স্বরূপ চট্টগ্রামের মনীষী জনাব ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক একটি "সংক্ষিপ্ত চট্টল পরিচিতি" লিখে দেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন হলো এই মূল্যবান গবেষনা গ্রন্থটি বাজারে নেই। বাংলা ভাষার ছাত্র- ছাত্রীদের জন্যতো বটেই, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্যও এটি একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের উপর এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। কোন কোন জেলায় এই প্রকল্পের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মানের জন্য এই পুস্তক গুলো মূল্যবান বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ "বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান" পুন মুর্দ্রনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বহু বছর পর বইটি আবার পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দ বোধ করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ, জেড, এম শামসুল আলম

চেয়ারম্যান

বাঃ কোঃ বুঃ সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল চট্টগ্রামের সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আমার কিছুটা দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম নৈশ কলেজের অধ্যক্ষ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরীর বিশেষ উৎসাহ ও অনুরোধে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করি। জেলা কাউন্সিলের তৎকালীন সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ, সি-এস-পি'র উদ্যোগে ও প্রেরণায়ই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়।

পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার আগে চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের চেষ্টায় চট্টগ্রাম লোকসাহিত্যের অনেক মাল-মশলা সংগৃহীত হয়। লোক সাহিত্যের বিচারে সে গুলোতে অনেক মূল্যবান উপাদান থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্যে ওগুলো অপরিহার্য নয়। তাই চট্টগ্রামী সাহিত্যের একটা ইতিহাস দাঁড় করানোর জন্যে আমাকে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালাতে হয়। জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পর জনাব জাকি আজম, সি-এসপি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমার পরামর্শমতো জনাব জাকি আজম চট্টগ্রামের প্রতিটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নিকট প্রতিটি ইউনিয়নের জীবিত ও মৃত প্রতিটি কবি-সাহিত্যিকের নাম-ধাম ঠিকানা এবং পান্ডুলিপি ও পুঁথি-পুস্তকের খবর আমাকে জানানোর জন্য একটি নির্দেশনামা পাঠান। এ ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকে কোন মূল্যবান তথ্য না পাওয়া গেলেও অনেকেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং কেউ কেউ কিছু খবরও দিয়েছিলেন। এই সহযোগিতার জন্য তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

যে এলাকার নির্ভরযোগ্য কোন রাজনৈতিক ইতিহাসই আজো রচিত হয়নি সেই এলাকার সাহিত্যের ইতিহাস রচনা যে কী কঠিন কাজ তা অনেকের পক্ষে আন্দাজ করাও কঠিন। সুখের বিষয়, চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান মরহুম মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ জীবনব্যাপী সাধনায় যেসব পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর সাহায্যে চট্টগ্রামের সাহিত্যের একটা কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এসব পুঁথি-পুস্তকের যে সামান্য পরিচয় সাহিত্য-বিশারদের পুঁথিপরিচিতি ও প্রবন্ধাবলীতে পাওয়া যায় সেগুলোকে ভিত্তি করেই আমি আমার অনুসন্ধানকার্য চালাই এবং অজস্র পুঁথি-পুস্তক এবং সাময়িক পত্র পাঠ করি, বহু পন্ডিত ব্যক্তির সংগে আলোচনা ও পরামর্শ করি—তারই ফল এই ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ শরীফ আমার চিঠি পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে আমি কোথায় কি সাহায্য পেতে পারি তা আমাকে লিখে পাঠান।

www.pathagar.com

'মাহেনও' সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছ থেকে কোন কোন ব্যাপারে আমি পরামর্শ নিয়েছি। জনাব এনামুল হকের বইগুলো থেকেও সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। তা ছাড়া ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, চট্টগ্রাম নৈশ কলেজের অধ্যাপক আহমদ হোসেন, কথাশিল্পী ও সাংবাদিক সৈয়দ শাহাদাত হোসেন আমাকে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই-পুস্তক দিয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান সুলেখক আবুযুযোহা নূর আহমদ, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে আমি যখনি যে বই চেয়েছি আমাকে তা বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন। এ ব্যাপারে আমি ঢাকা যাদুঘর লাইব্রেরী এবং পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পত্র-পত্রিকা এবং মূল্যবান পুস্তকও ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি কম-বেশী ঋণী।

পাণ্ডুলিপি কপি করার ব্যাপারে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সুলেখিকা কল্যাণীয়া সুরাইয়া বেগম স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে যে শ্রম স্বীকার করেছে তা কখনো ভুলবার নয়।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের বর্তমান সেক্রেটারী জনাব, এস, আর খান ইতিহাস লেখার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে আমাকে একাধারে তাগিদ দিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এজন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল, চট্টগ্রাম সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদের আজো অলিখিত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে পথিকৃতের যে ভূমিকা নিয়েছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা কাউন্সিলগুলি তা অনুসরণ করলে আমাদের সেই ইতিহাসের মাল-মশলার জন্যে সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লেখককে অন্ধকারে হাতড়াতে হবেনা বলে আমার বিশ্বাস। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জেলা যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যাদের জন্যে চট্টগ্রামের সাহিত্যের এ ইতিহাস লেখা চট্টগ্রামের সেই তরুণ সমাজের মনে যদি এই ইতিহাস তাদের নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সামান্য গর্ব ও গৌরববোধ জাগাতেও সক্ষম হয় তবেই আমার এ পরিশ্রম সার্থক বলে গণ্য হবে।

আগষ্ট,

ঢাকা ১৯৬৫ শাহেদ আলী

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সাগরপারের এ চট্টগ্রামের অবস্থান যেমন বৈশিষ্টপূর্ণ, তেমনই তার ভাষাটিও বৈশিষ্টময়। চট্টগ্রাম সাহিত্যক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী, চট্টগ্রামের নাবিক, চট্টগ্রামের কৃষক উদ্বেল প্রাণের চঞ্চলতায় কঠোরতম জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রেরণায় উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে বর্মা আর দূর প্রাচ্যে উপনীত হবার পর চট্টগ্রামের সাহিত্য এক নব রূপ লাভ করে। মগ-হিন্দু-মোগল-পাঠান-দিনেমার-পর্তুগীজ-ইংরেজ, এই জাতি সমূহের ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কেন্দ্র, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ধর্মের সংযোগস্থল, আওলিয়া পীর-বুজর্গদের সাধনার পীঠস্থান, অপরূপ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা কেন্দ্র চট্টগ্রাম স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যে মহীয়ান, বৈশিষ্টে গরীয়ান।

পণ্ডিতব্যক্তিগণ ভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণে বিভ্রান্ত। সুষ্ঠু সংজ্ঞাদানে কঠিন বলেই তাঁরা মনে করেন। বাঙলা ভাষাকে মনীষীগণ দেশজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ দেশজ ভাষাই দেশের সাহিত্য এবং সেই হিসাবে চট্টগ্রামী ভাষাকেও বাঙলা সাহিত্য বলা চলে। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে চট্টগ্রামের ভাষার বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতির আদুরে পরিবেশে ধর্মের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম যেমন সুফী মতবাদ লালন করে চলেছে, তেমনই আন্তর্জাতিক সংযোগ, ঘটনার সংঘাত, চট্টগ্রামের ভাষায়, সাহিত্যে, যে রোমাঞ্চ, যে প্রেমের অবতারণা করেছে তা বৈশিষ্ট্যময়।

রাস্তা-ঘাট তৈরী করা, তার সংরক্ষণ আর সংস্কারের মধ্যে একটি দেশ বা জাতির পূর্ণ রূপায়ন হয় না। বাহ্যিক সৌষ্ঠবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য, শিল্প, কলা,কৃষ্টি আর সংস্কৃতি স্বকীয়তা বজায় রেখে যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখনই তাকে উন্নতি বলা যেতে পারে। স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় আজ সর্বত্র লোকগীতি, পল্লীগাঁথা, কথ্যভাষা—সব কিছুকে বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।

"বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান"—কেন এর প্রকাশনা এই প্রশ্নের উত্তরে তাই বলা যায়ঃ বৈশিষ্টময়, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ কিন্তু অবহেলিত একটি অঙ্গকে শুধী সমাজের সামনে পেশ করে তার বিকাশের পথকে সুগম করা—চট্টগ্রাম জিলা কাউন্সিল নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে। জিলা কাউন্সিল দেশের সাহিত্য, কলা ও কৃষ্টির ধারক ও বটে।

চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের এটা প্রথাম প্রচেষ্টা। তাড়াহুড়োর মধ্যে বিরাট একটি কাজ শেষ করার যেসব গলদ থাকে, তা হয়ত এ বইয়েও দেখা যাবে। খুবই তথ্যময়, স্বয়ংসম্পূর্ণ বই প্রকাশ করার অহমিকা জিলা কাউন্সিলের নেই। প্রথম সংস্করণের ত্রুটি বিচ্যুতি এই বইএর পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবার ইচ্ছা জিলা কাউন্সিলের রয়েছে। তাড়াতাড়িতে যে বই প্রকাশ পেল, আশা করি তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সকলেই ক্ষমার চোখে দেখবেন।

কাজী জালালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জিলা কাউন্সিল, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

উৎসর্গ ঃ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব, দুর্লভ প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ও সম্পাদক, চট্টগ্রামের সু-সন্তান মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে--

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
▼ **প্রথম অধ্যায় ঃ**	
বাংলার ইতিহাসে চট্টগ্রাম	১৯
▼ **দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ**	
ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ বৌদ্ধ-হিন্দু আমল	২৩
ভাষার মুক্তি ঃ মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা	২৪
▼ **তৃতীয় অধ্যায় ঃ**	
মুসলিম চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি	২৬
▼ **চতুর্থ অধ্যায় ঃ**	
মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (১)	২৮
পঞ্চদশ শতক	
(ক) শাহ্ মুহম্মদ সগীর	২৮
(খ) মুজম্মিল	৩০
▼ **পঞ্চম অধ্যায় ঃ**	
কাব্য পরিচয় (২)	৩৩
ষোড়শ শতক	
(ক) আফজল আলী	৩৩
(খ) সাবিরিদ খান	৩৬
(গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ মহাভারতের অনুবাদ	৪১
(ঘ) শ্রীকরণ নন্দী	৪৫
(ঙ) দৌলত উজীর বাহরাম খান	৪৬
(চ) হাজী মোহম্মদ	৪৯
(ছ) মুহম্মদ কবীর	৫১
(জ) শ্রীধর	৫৫
(ঝ) সৈয়দ সুলতান	৫৬
(ঞ) শেখ পরান	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	৬৪
মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (৩)	৬৪
(ক) মোহাম্মদ নস্‌রুল্লাহ্ খাঁ	৬৪
(খ) মুহম্মদ খান	৬৬
(গ) নওয়াজিশ খাঁ	৭৪
(ঘ) কমর আলী	৭৮

www.pathagar.com

(ঙ) আব্দুল নবী ৭৯
(চ) মুহম্মদ নকী ৮১
(ছ) শমশের আলী ৮৩
(জ) মুজাফ্ফার ৮৪
(ঝ) শরীফ শাহ্ ৮৫
(ঞ) রতিদেব ৮৭
(ট) দ্বিজ রামদেব ৮৮
▼ সপ্তম অধ্যায় ঃ ৯০
আরাকানের রাজদরবারে চট্টগ্রামের কবি ৯০
(ক) দৌলত কাজি ৯১
(খ) মরদন ৯৯
(গ) কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬) ১০০
(ঘ) আলাওল ১০৩
(ঙ) সপ্তদশ শতকের আরও কতিপয় কবি ১০৮
▼ অষ্টম অধ্যায় ঃ ১১৩
অষ্টাদশ শতকের কতিপয় কবি ১১৩
(ক) শেখ মনসুর ১১৩
(খ) মুহম্মদ মুকীম ১১৭
(গ) শেখ সেররাজ চৌধুরী ১১৯
(ঘ) রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১২০
(ঙ) ভবানী শঙ্কর দাস ১২২
(চ) মুহম্মদ রজা ১২৩
(ছ) আলী রজা ১২৪
(জ) মুহম্মদ আলী ১২৫
(ঝ) ছৈয়দ নুরুদ্দিন ১২৭
(ঞ) মুহম্মদ উজির আলী ১২৯
(ট) দ্বিজ রাধাকান্ত ১৩০
(ঠ) নিধিরাম আচার্য ১৩১
(ড) মুক্তারাম সেন ১৩২
(ঢ) বদীউল (কাজী) ১৩৪
(ন) বালক ফকির ১৩৫
(ত) মুহম্মদ দানীশ ১৩৬
(থ) শেখ তনু ১৩৭
(দ) অষ্টাদশ শতকের আরো কতিপয় কবি ১৩৫

www.pathagar.com

▼ নবম অধ্যায় ঃ
গীতি কবিতা ১৩৯
(ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক)
▼ দশম অধ্যায় ১৪৫
ইংরেজ আমল ও মুসলমান ১৪৫
(সাধারণ আলোচনা)
▼ একাদশ অধ্যায় ঃ ইংরেজ আমলের কবি ও কাব্য পরিচিতি ১৪৯
(ক) কবি চুহর ১৪৯
(খ) হাজীদুল্লাহ্ খান ১৫১
(গ) হাসমত আলী চৌধুরী ১৫৪
(ঘ) সৈয়দ নাসির উদ্দিন ১৫৫
(ঙ) মোশারফ আলী ১৫৭
(চ) উজির আলী মুন্সী ১৫৭
(ছ) হায়দর আহমদ ১৫৮
(জ) আসাদ আলী চৌধুরী ১৫৯
(ঝ) সলিম উদ্দিন ১৫৯
(ঞ) ওয়াজি উদ্দীন চৌধুরী ১৬০
(ট) তমিজী ১৬২
(ঠ) হাজী আলী ১৬৩
(ড) কবি ফকির আসকর আলী ১৬৪
(ঢ) লোকমান আলী ১৬৪
(ন) নীল কমল দাস ১৬৫
(ত) শঙ্করভট্ট ও সদানন্দ ভট্ট ১৬৬
(থ) রঞ্জিত রাম দাস ১৬৭
(দ) রামতনু আচার্য ১৬৭
(ধ) রামলোচন দাস ১৬৮
(ন) ভৈরব আইচ ১৬৯
(প) কবিরাজ ষষ্ঠিচরণ মজুমদার ১৭০
প্রাচীন ধারার গীতি কবি ১৭০
▼ দ্বাদশ অধ্যায় ১৭২
আধুনিক ধারা ১৭২
নবীন চন্দ্র সেন ১৭২
নবীন চন্দ্র দাস ১৭৪
শশাঙ্ক মোহন সেন ১৭৫
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৭৫

www.pathagar.com

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৭৭
নজীর আহম্মদ চৌধুরী ১৭৮
আবুল মা আলী মুহম্মদ হামিদ আলী ১৭৯
মাহবুব উল আলম ১৮০
দিদারুল আলম ১৮০
আবুল ফজল ১৮০
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ১৮১
বুলবুল চৌধুরী ১৮১
ওহীদুল আলম ১৮১
আবুল কাসেম ১৮২
ফেরদৌস খান ১৮২
আবদুর রহমান ১৮২
আহমদ শরীফ ১৮২
আব্দুল হক চৌধুরী ১৮২
সফিনাজ নুরুন্ নাহার ১৮২
সুচরিত চৌধুরী ১৮৩
সুলতানা রহমান ১৮৩
এন, এম, হাবিব উল্লাহ্ ১৮৩
হাল আমলের আরো কতিপয় লেখক-লেখিকা ১৮৩
ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৮৪
চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য ১৮৪
পালাগান পরিচয় ১৮৪
ভেলুয়া ১৮৪
ভেলুয়ার পালার পটভূমিকা ১৮৫
কাহিনী ১৮৫
চরিত্র সৃষ্টি ১৮৭
হাদী খেদা ১৮৭
কমল সদাগর ১৮৯
কাফন চোরা ১৯০
নসর মালুম ১৯২
নুরুন্নেহা ও কবরের কথা ১৯৫
কাহিনী ১৯৬
সূজা তনয়ার বিলাপ ১৯৮
পরীবানুর হাঅলা ২০০
লোক সাহিত্যের আরো কয়েকটি দিক ২০২
গ্রন্থ পঞ্জী ২০৬

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত চট্টল পরিচিতি

— ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক,
এম-এ, পি এইচ-ডি, এস-আই]

চট্টলা (প্রাচীন—চাটিল্ল>চট্টল>চট্টলা) আমার জন্মভূমি। এখানে জন্মেছি বলে আমি গৌরব বোধ করে থাকি। এ দেশ আর কাকে কতখানি ভুলিয়ে রাখে, জানিনে। আমার প্রতি এর যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, তা ভাল করেই বুঝতে পারি। আমি এ টানটুকুন জীবনে কখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

চট্টলার প্রতি আমার যে মমতা, তা চিরকেলে। সেই হৃদয়ের অঞ্জনটুকুনই সুর্মার মতো চোখে মেখে আমি চট্টলার প্রতি অবাক-বিস্ময়ে তাকাই, আর চট্টলাও আমার প্রতি স্নেহের আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে থাকে। তাই, আমাদের কারও এ দৃষ্টি চোখের নয়,—হৃদয়ের। চোখের দেখা যে দেখাই নয়,—এতে তৃপ্তি নেই। তাই হৃদয় দিয়েই চট্টলাকে দেখে থাকি। সে যে আমার সামনে খু'লে দেয় তার হৃদয়ের অর্গলবদ্ধ গোপন দুয়ার, না চাইতেই বিছিয়ে দেয় তার মনের মণিকোঠায় রক্ষিত নক্সী-কাঁথা, আর অকৃপণ হ'য়ে তু'লে ধরে তার অন্তরের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

মোট কথা, চট্টলার পরিচয় তার হৃদয়ে এবং হৃদয় দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। তার সংস্কৃতি হচ্ছে তার আপন সত্তার মন্ময়-বিকাশ; আর তার সাহিত্য এ মন্ময়-বিকাশেরই একটা তন্ময়রূপ মাত্র। তাইতে, চট্টল সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হলে, তার সাহিত্যের রূপ ও রস বোঝা সহজ নয়। আমার হৃদয় চট্টলা সাংস্কৃতিক-রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, আমার প্রাণে চট্টলার সাহিত্য যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ লেখায় তারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকে দিচ্ছি এ ভরসায় যে, আলোচ্য গ্রন্থে অঙ্কিত চট্টলা-সাহিত্য-চিত্র এতে যৎকিঞ্চিত স্পষ্টতরো হবে।

শৈল-কিরীটিনী, নদী-মালিনী, বনানী-কুন্তলা চট্টলা, প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া দুলালী কন্যা। সে যেন এক শবরী বালিকা,—অধিত্যকায় হরিণ চরায়, উপত্যকায় হাতী পোষে, পর্বত-গাত্রে 'জুম' বুনে, 'ঢেবার' আর্শিতে মুখ দেখে, গহণ অরণ্যে মহাভয়াল 'গয়াল' পালে, আর পুষ্পিত তরুর ডালে ডালে লতার দোলায় দোল খায়।

আবার সে যখন ঝঞ্ঝা বাত্যায় রুখেয়া দাঁড়ায়, 'গর্কী' বন্যায় গোসল করে, দাবাগ্নির লেলিহান শিখায় আগুন পোহায়, 'ঠাডার'-বজ্রে বুক পেতে দেয়, আর দিগন্ত-বিদারী বিদুৎ -ঝলায় ঝলমল করে, তখন তার সে কি রুদ্র মূর্তি!

পুনরায়, সে যখন অতি সন্তর্পণে সমতল ভূমিতে নে'মে এসে মাঠে-মাঠে সোনা ছড়ায় , গলায় গলায় গান জাগায়, ঘাটে-ঘাটে শহর, বন্দর ও পথে পথে হাট বাজারে ভিড় জমায়, তখন তার সে কি ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি! যে কখনও তা দেখেনি, সে কি করে উপলব্ধি করবে, এই যে চট্টলা, সে কি স্বপ্নপুরী!

www.pathagar.com

যখনই চট্টলার কথা চিন্তা করি, মনে হয়, কি বিচিত্র এই দেশ! এ যে, "বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদনি কুসুমাদপি,"—বজ্রের চাইতেও কঠোর, কুসুমের চাইতেও মৃদু। এর বুকে জ্বলছে সৃষ্টির অনির্বাণ অগ্নিশিখা, মুখে উচ্চারিত হচ্ছে নব-নবীনের বাণী, চক্ষে স্ফুরিত হচ্ছে প্রজ্ঞার বিদ্যুদ্দীপ্তি। মহাসমুদ্রের মহা আহবানে সানন্দে সাড়া দিয়ে সে যেমন বর্হিবিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ মিতালি পাতাচ্ছে, অভ্রভেদী পর্বতের ধ্যান গাম্ভীর্যে অনন্তের সাথেও সে তেমনই ঘটাচ্ছে নিবিড় পরিচয়। চট্টলা যেন কোমলে-কঠোরে, শান্তিতে-সংগ্রামে, সৃষ্টিতে-ধ্বংসে খোদার এক অপূর্ব কীর্তি।

এখানে যে যখন এসেছে, পরম আদরে স্থান পেয়েছেঃ অহম ব্রহ্মের পার্বত্য পথে এসেছে আদিম অনার্য অধিবাসী জুমিয়া-চাক্‌মা, কুকী-তিপ্‌রা ও মুরুং। তারা শুধু বনের মাঝখানে 'টং' বেঁধে 'জুমের' রং দেখে না, বাঘ ভালুকের সাথে যুদ্ধ করে বাজুর কুঅওৎ পরখ করে। এমন কি বনের অজগরের টুটি টিপে মেরে তার মাংস উৎসব করে খায়। আজও তারা মহামুনিতে মেলা বসিয়ে পুণ্য ও পত্নী,—দুইই লাভ করে।

আর্য হিন্দু এলেন সীতা দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সীতাকুন্ডের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করতে। তাঁরা দেখলেন, সিন্ধুর শীতল-বক্ষ-প্রদাহী বাড়বাগ্নিকে বাড়বকুন্ডে বেঁধে রেখে চট্টলা সিন্ধু বুকের জ্বালা মিটিয়েছে। তাই, আজও সিন্ধু চট্টলার রাঙা পা দু'খানি ধুইয়ে দিচ্ছে ব'লে সে শুধু সিন্ধুবন্দিতা নয়,—হিন্দু-সম্পূজিতাও বটে।

ভারতের বুকে শঙ্করাচর্যের প্রচারে বৌদ্ধ জাতি যখন নিশ্চিহ্ন হল, চট্টলাই তখন তাকে মায়ের মত বুক পেতে নিল। তাই, ভারতের বৌদ্ধ-ধর্মের একটি শেষ আশ্রয় হ'ল চট্টলা। চক্রশালা ও চন্দ্রনাথে বুদ্ধ পদ-চিহ্ন স্থাপিত হ'ল; তার সাথে মগধের 'মগধেশ্বরী' ও চট্টলায় এসে বাসা বাঁধলেন।

আরবের ধূসর-বুকের উষর-মরু ছেড়ে মুসলিম-আরব যখন বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টির সন্ধানে দিকে দিকে ছুটে চলল, চট্টলা তখন তাঁদেরকে চোখ ইসারায় দরদীর মতো ডাক দিল। তাঁরা শোলকবহরে এসে 'সুলুকু-ল্‌-বহর' বা সমুদ্র-পথ ভুলে গেলেন, 'বাঅল্যার' পলল ভূমিতে 'বাবুল্লা' বা সবজী বাগান রচনা করলেন, 'আলকরনে' ঘর বেঁধে গন্ডারের সিঙের কারবার ফাঁদলেন , আর গুদিরপারে সমুগ্রগামী 'গদীরা', বা জাহাজ তৈরির কারখানা খুললেন।

খ্রীষ্টানেরা এলেন পর্তুগীজ নামে হজরৎ ঈসার বাণী নিয়ে ইউরোপ থেকে; আর আত্মপ্রকাশ করলেন 'হার্মদ' বা জলদস্যুরূপে। তবু, চট্টলা তাঁদেরকে ঘরের 'জানালা' খুলে দেখলে, বারান্ডায় 'মেজ' পেতে 'কোদারায়' বসতে দিলে, আলমারি থেকে 'পেঁপে' 'পেয়ারা' 'সফেটা, 'আনারস' প্রভৃতি ফল বা'র করে পিরিচে 'পাউরুটির' সাথে খেতে দিয়ে অতিথি সৎকার করলে। এঁরাও চট্টল ভূমে স্থায়ী হলেন।

সত্যই চট্টগ্রাম হরেক রকম মানুষের আবাসভূমি। এরা সবাই মিলে চট্টগ্রামকে করেছে এক আন্তর্জাতিক অঞ্চল। এখানে মন্দিরে-মসজিদে, ক্যায়াঙে-গীর্জায়, দরগা-আখড়ায়, আশ্রম-খানকায় বিবাদ নেই। এখানকার সাধু-সন্ত, পীর-ফকীর, মোল্লা-মৌলবী, রাউলী-পাদ্রী সমভাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের আর কোথাও তো এমনটি দেখিনি।

www.pathagar.com

শুধু চট্টগ্রামের নয়,-পৃথিবীর যে কোন দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে সেখানকার অধিবাসীর জীবন-বিকাশের সম্বন্ধ অতি গভীর। চট্টলবাসীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানকার আবহাওয়ার ফলেই এঁরা যেমন পরিশ্রমী, তেজস্বী, সৎসাহসী ও স্পষ্টবাদী, তেমনি উদারহৃদয়, ধর্মপরায়ণ, সরলপ্রাণ ও অতিথিবৎসল। বৃষ্টি-বাদল আগ্রাহ্য ক'রে এঁরা মাঠে মাঠে সোনা ফলায়, হাঙর কুমীরের সাথে সংগ্রাম ক'রে অসীম সমুদ্রের অথৈ-জলে পাড়ি জমায়, ঝড়-তুফান উপেক্ষা ক'রে অনন্ত-আকাশের নীলিমায় নিখোঁজ হয়।

স্বীকার করি, চট্টলবাসী নিয়েছেন বহু, দিয়েছেনও অনেক। কিন্তু, তাঁরা যা নিয়েছেন তা যেমন সবার আগে, তাঁরা দিয়েছেন, তাও সবার আগে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাই ধরা যাক না। শধু পূর্ব-পাকিস্তান নয়,—সমগ্র বাংলায় যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঠাঁই ছিল না, তখন চট্টগ্রামের দুই বীর সন্তান—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও সৈয়দ সুলতান, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম 'পরাগলী মহাভারত' ও 'নবী-বংশ', রচনা করে বাংলা ভাষীর মুখে ফুটালেন অফুরন্ত-ভাষা এবং বুকে জাগালেন অনন্ত-আশা। অতঃপর, ধীরে ধীরে বাংলায় রচিত হ'ল মনসা, চন্ডী ও ধর্ম মঙ্গল, লাইলী মজনু , ইউসুফ জুলেখা ও মকতুল হোসেন। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'ল, বাংলা সাহিত্যের জয় হ'ল।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টলাই ছিল অগ্রণী। যতীন্দ্রমোহন সেন, কাজেম আলী ও ইসলামাবাদীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অধিকন্তু, চট্টলা পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুকে দিয়েছে সীতাকুন্ড, বাড়ব কুন্ড ও আদিনাথের পুন্য তীর্থ; বৌদ্ধকে দিয়েছে মহামুনি ও চক্রশালার পবিত্র চৈত্য; মুসলমানকে দিয়েছে, বদর ঔলিয়ার বদরপাতি, বায়েজিদ বোস্তামির দরগাহ্, শেখ ফরীদের চশমা ও হজরৎ মুহম্মদের কদম মোবারক আর খ্রীষ্টানকে দিয়েছে গীর্জায় গীর্জায় ভজনালয়। এমন কি, জরাব্যাধি-গ্রস্ত আধুনিক মানুষকে দিয়েছে কাপ্তাই ও কক্সবাজারের স্বাস্থ্য-নিবাস। তাঁদের জন্য বন্দর, পোতাশ্রয়,কলকারখানাও গ'ড়ে উঠেছে; বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হ'য়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব পকিস্তানে চট্টলা এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিকারিণী। এ সংস্কৃতির মেজাজ বিচিত্র, প্রকৃতি উদার ও চরিত্র প্রগতিশীল। দেখতে পাই, এখানকার সাহিত্যে চট্টলার এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কুমদকহ্লারের মতই ফুটে আছে। দেখবার চোখ ও বুঝবার মন যাঁর আছে, তাঁর কাছে এ সত্য গোপন থাকার কথা নয়।

"বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান" নামক এই গ্রন্থটিতে গোষ্পদে আকাশ বিম্বিত হওয়ার মতো এ সত্যের যে একটা আভাস, একটা ঈঙ্গিত পাওয়া যাবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। অতএব, এ গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শাহেদ আলী সাহেবের এবং যাঁরা (অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিল) এ -গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন, তাঁদের এ মহতী প্রচেষ্টার জন্য আমি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

ঢাকা, আগষ্ট ১৯৬৫ মুহম্মদ এনামুল হক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে চট্টগ্রাম

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বৈশিষ্ট মন্ডিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রত্যন্তবর্তী এ জেলাটির আয়তন—আড়াই হাজার বর্গমাইলেরও কিছু উপরে; সম্প্রতি (১৯৫৪) সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত হওয়ায় এ জেলার আয়তন আরো বেড়েছে। চট্টগ্রামের উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ্ নদী, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ফেনী নদী চট্টগ্রামকে নোয়াখালী থেকে এবং নাফ্ নদী এ জেলাকে ব্রহ্মদেশ থেকে আলাদা করেছে। মানচিত্রের দিকে তাকালে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক—এলাকাটি যেন বাংলাদেশ থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা। আসলেও এ এলাকাটির অধিকার নিয়ে প্রথমে তিপ্‌রা ও আরাকানীদের মধ্যে, পরে তিপ্‌রা, আরাকানী ও মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চলে; এবং মাত্র ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এ এলাকাটি মুঘল শক্তির সহায়তায় স্থায়ীভাবে বাঙ্‌লা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চট্টগ্রামে প্রথমে যারা বসতি স্থাপন করে তারা তিবেতো-বার্মান ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক—এ অনুমান অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। এর পর পুরাণের যুগে নাকি চট্টভট্ট নামে আরেকটি জাতি চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে; চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো দক্ষিণ দিকে। এ সময় আরাকান থেকে খউংতা বা কান্‌রান নামে আরেকটি জাতি উত্তর দিকে এগোতে থাকে। পাহাড়ী জাতিগুলোর মধ্যে তিপ্‌রারাই ছিলো সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী; তাই সহজেই তারা অন্যান্য পাহাড়ী জাতিগুলোর উপর জয়ী হয়। এই সুদীর্ঘকাল ধরে বর্তমান চট্টগ্রাম এলাকার নাম কি ছিলো তা জানবার উপায় নেই।

বলা হয়, মৌর্যরাই প্রথম (৩২৪ খৃঃ পূঃ অব্দ) বাঙ্‌লা দেশকে আর্যাবর্তের সাথে সুদৃঢ়বন্ধনে যুক্ত করে, তবু গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের (৩২ঃ খৃঃ অঃ) আগে ত্রিপুরার উপর

www.pathagar.com

আর্যাবর্তের সরাসরি আধিপত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ও কামরূপ জয় করেন এবং ত্রিপুরাকে কর দানে বাধ্য করেন। কাজেই, চট্টগ্রাম এলাকা তখন আর্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়, এ অনুমান করা যেতে পারে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের শিষ্যেরা উড়িষ্যায় প্রবল হয়ে উঠ্‌লে বৌদ্ধদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। তখন পূর্বদেশে বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তীরভুক্তি, বাঙলা এবং কামরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। বিমলের পুত্র গোপীচন্দ্রে রাজধানীর ছিলো চট্টগামে।

আনুমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে রাজত্ব করতেন চন্দ্রবংশের রাজাগণ। চন্দ্রবংশের ষোলচন্দ্র সিংহ ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তিনি নিজনামে চট্টগ্রামে পাথর দ্বারা একটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং তার গায়ে 'চেত্তগৌং' 'যুদ্ধ করা অন্যায়'—এই কথাগুলো খোদাই করে দেন!

নব শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ সময়ের বৌদ্ধ গ্রন্থে চট্টগ্রামকে 'রম্য-ভূমি' ও 'পন্ডিত বিহার' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকাটি চট্টগ্রাম নামে পরিচিত তা' স্থায়ীভাবে মুসলিম দখলে আসার অনেক আগেই এর সঙ্গে আরব দেশের মুসলমানেরা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। ৮ম ও ৯ম শতাব্দী থেকেই পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। এই সময়ে পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম অতি স্বাভাবিক ভাবেই আরবদের বিশ্রাম স্থান ও উপনিবেশে পরিণত হয়।

সুলায়মান (৮৫৩ খৃঃ জীবিত), আবু জায়দুল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইব্‌নে খুরদবা (মৃঃ ৯১২ খৃঃ) আল্‌ মাসুদী (মৃঃ ৯৫৬ খৃঃ) ইব্‌নে হাওকল (৯৭৬ খৃঃ জীবিত), আল্‌-ইদরিসী (জন্ম একাদশ শতকের শেষাংশে) প্রভৃতি আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, আরাকান থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগটি খৃষ্টীয় ৮ম শতক থেকে আরব বনিকদের কর্ম-তৎপরতায় মুখর হয়ে উঠে। এ সময় অনেক আরব বনিক চট্টগ্রামে কেউ স্থায়ী ভাবে, কেউবা অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামে আরবী প্রভাব এতোটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, এই সমতলে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। শাসন-কর্তার উপাধি ছিলো 'সুলতান'। সম্ভবত মেঘনা নদীর উত্তর

www.pathagar.com

তীরবর্তী সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূ-ভাগ এই আরব সুলতানের অধীনে ছিলো। রোসাঙ্গ বা আরাকানের জাতীয় ইতিহাসে এই সুলতানের উল্লেখ রয়েছে। পূর্বোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা ষোলচন্দ্র (সুলতানই গৎচন্দয় অ) ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এই 'সুরতন'কেই (আরবী সুলতান শব্দের অপভ্রংশ) পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। ষোলচন্দ্রের বিজয়স্তম্ভে খোদিত চেত্তগৌং থেকেই আধুনিক চট্টগ্রাম জেলার নাম উদ্ভূত বলে অনেকের ধারণা। চট্টগ্রাম শহরের নিকট 'সুলুকবহর' নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। এই 'সুলুক বহর' 'আরবী সুলুকুল বহর' থেকেই গৃহীত; এর মানে সমুদ্রপথ। পূর্বভারতীয় দ্বীপগুলোর সাথে আরবদের যে সম্বন্ধ ছিলো তার ফলেই ভারতের পূর্বপ্রান্তবর্তী শেষ বিশ্রামস্থল চট্টগ্রাম 'সুলুকবহর' নামে পরিচিত হয়ে থাকবে। এই 'সুলুকবহরে' নাকি আরবদের জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিলো, এখানে আরবদের একটি পোতাশ্রয়ও ছিলো।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী থেকেই মেঘনা নদীর পূর্বতীর থেকে আরম্ভ করে রোস'ংগদেশ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত হতে থাকে ও মুসলমান প্রভাব বর্ধিত হতে থাকে। চতুর্দশ শতকে ইব্‌নে বতুতার ভ্রমণ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে 'মূর' বা আরবদের প্রভাব দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১২০৩ খৃঃ অব্দে বখতিয়ার খিল্‌জী লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাঙলা দেশকে মুসলিম অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, অথচ তার বহু আগে থেকেই বাঙলার এই প্রত্যন্ত প্রদেশটিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। বাঙলা দেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং তা' খুবই স্বাভাবিক।

পূর্বেই বলা হয়েছে চন্দ্রবংশীয় ষোলচন্দ্র সিংহ ৯৫৩ খৃঃ অব্দে সুলতানকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। এরপর সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে প্রথমে তিপ্‌রা ও আরাকানীদের মধ্যে, পরে তিপ্‌রা , আরাকানী ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সর্বশেষে এসে যোগ দেয় পর্তুগীজেরা। এই সময়ের মধ্যে নয়বার আরাকানীরা চট্টগ্রাম দখল করে। অমর মাণিক্য কর্তৃক ১৬২০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয় হচ্ছে তিপ্‌রাদের সর্বশেষ বিজয়। এই সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম সাতবার আসে মুসলিম অধিকারে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হাতে আরাকানীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং চট্টগাম স্থায়ীভাবে বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আলমগীরের রাজত্বকাল; শায়েস্তা

www.pathagar.com

খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রামের কিল্লায় প্রবেশ করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আরাকানী, তিপ্‌রা, আরব, মুঘল, পাঠান, তুর্কী ও পর্তুগীজের মধ্যে শধু যে সংগ্রামই চলেছে, তা নয়—বহু আরাকানী, তিপ্‌রা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে, বহু মুঘল, পাঠান ও আরব ইসলামাবদকেই আপন ঘর করে নিয়েছে; এমন কি বহু পর্তুগীজও এদেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। এদের সকলের মিলিত রক্তেই গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামের জন-সমষ্টি। মুসলিম আমলের আগে মগধ ও গৌড়-তাড়িত বৌদ্ধগণ চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল, এ তো ঐতিহাসিক সত্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা ও সংস্কৃতি: বৌদ্ধ-হিন্দু আমল

খৃষ্টীয় নবম শতকে মাগধী প্রাকৃতকে অবলম্বন করে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। তার আগে থেকেই সংস্কৃত ভাষার বাঙলার বিদ্বজ্জন ধর্মগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যেও গৌড়ীয় রীতি বলে একটি রচনা-শৈলী দাঁড়িয়ে গেছে।

আনুমানিক ৮০০-১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও বাঙলা ভাষা সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় সাহিত্যে ভাষা হিসেবে বাঙলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ,—এ তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিলো। সংস্কৃতই ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। প্রাকৃতের চর্চাও বাঙলা দেশে হয়েছে, তার প্রমাণ চতুর্দশ শতাব্দীতে সংগৃহীত প্রাকৃত পৈঙ্গল। এ দেশের মহাযানী, বজ্রযানী বৌদ্ধরাও প্রাকৃত ও অপভ্রংশ মিশ্রিত সংস্কৃতে লিখতেন। এই ভাষাকে বলা হয় বৌদ্ধ সংস্কৃত।

বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে যে চর্যাপদগুলোকে ধরা হয় তার রচনা কালও বৌদ্ধপাল যুগ। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বংগ বিজয় করেন, তখন লক্ষ্মণ সেনের দরবারে সংস্কৃত কবিদের আড্ডা ছিলো; বাঙলার চর্চা হতোনা। বাঙলা ছিলো জনসাধারণের ভাষা, যারা 'ইতর' বলে বিবেচিত হোতো ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক-গোষ্ঠীর কাছে। কাজেই যথার্থ বাঙলা রচনার নমুনা মুসলিম আমলের আগে মেলে না। চর্যাপদগুলো বাঙলা ভাষায় রচিত কিনা এ ব্যাপারেও নানা মুনির নানা মত।

মৌর্যযুগ থেকে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি আরম্ভ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, এ সব ধর্মমত কত প্রসারিত। পাল ও সেন রাজারা সেই আর্য সংস্কৃতির বিজয় সুদৃঢ় করেন। কিন্তু তথাপি বিজিত সাধারণ বাংগালী সমাজ এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার নিয়ম সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে উঠতে পারেনি; তারা তাদের আদিম তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-প্রক্রিয়া,

www.pathagar.com

মৌলিক দেব-দেবী ছাড়েনি। তাই বাঙলা দেশ ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা মহাযানীতন্ত্রের ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লৌকিক ভাষায় ধর্মপ্রচার এই সিদ্ধাচার্যদের কীর্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই বাঙলা রচনাই এদের বিদ্রোহের একটি প্রমাণ। সেন যুগে বৌদ্ধ জাতিগুলোর কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিলোনা। উৎপীড়িত, নির্যাতিত বৌদ্ধেরা মুসলমানদের বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয়, "নিরঞ্জনের রুষ্মা" তারই ইংগিত বহন করে। যারা তারপরেও বৌদ্ধ ছিলো তারা নিত্যানন্দ ও গোস্বামীদের প্রয়াসে নেড়া-নেড়ীরূপে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়।

ভাষার মুক্তি ঃ মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা

প্রাচীন ভারতীয় পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মতো বাঙলা ভাষা ব্রাহ্মণ্য সমাজের গন্ডীর বাইরে জন্ম ও প্রসার লাভ করে। মুসলিম আমলেই বাঙলা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলো প্রথম। "ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়,—প্রচারশীল ধর্ম; এ অন্যকে জয় করে ক্ষান্ত হয় না; কোলে টেনে লয়।" মুক্তির পয়গাম নিয়ে প্রচারকেরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে; শাসকেরা প্রসারিত করলেন ভ্রাতৃত্বের হস্ত। ফলে নিপীড়িত বাঙলার জনমানব অতি সহজেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো। বৌদ্ধ সম্প্রাদয়তো সানন্দে বরণ করে নিলো এই সর্বগ্রাসী মতবাদকে। "শেখ শুভোদয়া" ও "নিরঞ্জনের রুষ্মা" এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের সরল বলিষ্ঠ তওহিদবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্য-দৃষ্টি ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ জনতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসে। ফলে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে। দেবভাষা সংস্কৃতের জগদ্দল পাথরের চাপ থেকে রেহাই পেলো মানুষ; সাধারণের মুখের ভাষাই ক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্লো।

খৃষ্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীর আগে বাঙলা সাহিত্যের সার্থক কোনো নজীর-ই মেলেনা। ত্রয়োদশ এবং চতুদর্শ শতকে রচিত বলে মনে করা যেতে পারে, অমন একছত্র বাংলা রচনারও সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না বলে সুকুমার বাবু মুসলিম বিজয়কে দায়ী করেছেন। কিন্তু, সেন বংশ বা তাঁদের পূর্বে বহু শতকের মধ্যেও কেন একছত্র বাঙলা রচিত হলোনা, তার জবাব দেবে কে? এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর উক্তি উল্লেখযোগ্য—

"ব্রাহ্মনগণ প্রধানতঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা সর্বনেশে উপাধি দান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য

www.pathagar.com

ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের (সেনরাজদের) সভাতে সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে'র ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসা হইত, এবং নৈষাদাধি কাব্যের অলংকার রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগ্রহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মনগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন? আমাদের বিশ্বাস,—মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই, বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

বাঙলা দেশের উপর দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য বরাবরই একটা অনিশ্চিত ব্যাপার ছিলো। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী বাঙলা জয় করেন। অবশ্যি সারা বাঙলা দেশ জয় করতে আরো শতাধিক বছর লাগে। দিল্লীর প্রভূত্ব অস্বীকারের ব্যাপারে বাঙলাকে অন্যতম অগ্রণী প্রদেশ বলা যেতে পারে। ইলতুতমিশ এবং বলবনকে বাঙলার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা পোহাতে হয়। বলতে গেলে বলবনের বংশধরদের অধীনে বাঙলা দেশ দিল্লীর প্রভূত্ব থেকে সম্পূর্ণ আজাদই ছিলো। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সময় আবার দিল্লীর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্‌কে পরাজিত করে বাঙলাকে তিনটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত করেন,—লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। তখ্‌তে বসেই মুহম্মদ বিন্ তুঘলক কদর খানকে লখনৌতিতে, ইজদুদ্দীন আজমুল মুলুককে সাতগাঁয় এবং গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্‌কে সোনার গাঁয় প্রতিষ্ঠিত করেন। (১৩৩০)। শীঘ্রই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোসণা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নিহত হলে, বাহরাম খান সোনার গাঁ'র একচ্ছত্র শাসক হন। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁরই অস্ত্রবাহক ফখরুদ্দিন, 'ফখরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্' নামে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪০ খৃঃ)। তিনি ত্রিপুরাকে পরাজিত করে নোয়াখালীর পথে অগ্রসর হয়ে আরাকানীদের নিকট থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। তিনি চট্টগ্রাম হতে গৌড় পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

আরাকান রাজ মেংদি ১৩৫৩ খৃঃ অব্দে সম্ভবতঃ উত্তরে মাতামুড়ির তীর পর্যন্ত পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নরমিখ্‌লা আরাকানের সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় আভার রাজপুত্র আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখ্‌লার রাজধানী 'লৌঙ-এত্' এর পতন হয় এবং নরমিখ্‌লা গৌড়ের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় শামসুদ্দিন তখন গৌড়ের সুলতান (১৪০৬-১৪০৯)। নরমিখ্‌লা ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সুলতানদের আশ্রয়ে বাস করেন।

www.pathagar.com

সুলতান জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৪-১৪৩১) সুলতানের সাহায্যে নরমিখ্‌লা আবার রোসাঙ্গ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। (১৪৩০)। স্বরাজ্য ফিরে পেলেও তিনি গৌড়ের করদ রাজে পরিণত হলেন। জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা থেকে জানা যায়, তিনি চট্টগ্রামসহ সারা বাঙ্‌লা দেশের অধীশ্বর ছিলেন। নরমিখ্‌লার সঙ্গে যে সব মুসলমান আরাকানে আসেন তাঁরা 'ম্রোহাঙ' নামক স্থানে 'সন্ধিকন' মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

নরমিখ্‌লা চার বছর গৌড়ের সুলতানের করদরাজরূপে রাজত্ব করেন। রোসাঙ্গ রাজ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু এদের উপর মুসলিম প্রভাব এতো বেশী গভীরভাবে পড়ে ছিলো যে, এ সময় থেকে এঁরা এঁদের বৌদ্ধনামের সাথে একটা করে মুসলমানী নাম ব্যবহার করতে থাকেন এবং তাঁদের মুদ্রার এক পিঠে ফারসী অক্ষরে ইসলামী কলেমা ও মুসলমানী নাম লেখার নিয়ম চালু করেন।

নরমিখ্‌লার পরবর্তী রাজারা স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও এই প্রথা অব্যাহত রাখেন। নরমিখ্‌লার ভাই মেনখরী (১৪৩৪-১৪৫৯) স্বাধীনতা অবলম্বন করেও আলী খাঁ নামে নিজের পরিচয় দেন। 'মেন্‌-খরী'র রাজত্বকাল থেকে আরম্ভ করে রোসাঙ্গ-রাজ নরপিদিগ্যির (১৬৩৮-১৬৪৫) রাজত্বকাল পর্যন্ত দুশো বছরেরও অধিক কাল ধরে রোসাঙ্গ রাজেরা মুদ্রায় মুসলমানী নাম ব্যবহার করতে থাকেন। এই দুশো বছর ধরে বাঙ্‌লার মুসলিম শক্তির সঙ্গে আরাকান রাজদের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিলোনা। অথচ দেশে তারা মুসলমানী রীতি ও আদব-কায়দা অনুসরণ করেছেন; এর কারণ মুসলমানদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের রাষ্ট্র ও শাসননীতির উৎকৃষ্টতা এবং তাদের সংস্কৃতির উদারতা। সপ্তদশ শতকের বাঙ্‌লা সাহিত্য থেকে জানা যায়, বাঙ্‌লার মুসলমান রাজ-শক্তির সাথে আরাকানের রাজশক্তির সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। তবু মুসলমান জাতির প্রতি আরাকানের রাজাদের বিদ্বেষ নেই, বরং তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

সৈন্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বিভাগের প্রধানদের পদ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। গৌড়ের মুসলমান শাসক, শাসন-ব্যবস্থা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড় পরিচয়ের ফলে বৌদ্ধ আরাকানে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। পঞ্চদশ শতক থেকে রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলিম প্রভাব প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী কালে তার সঙ্গে যুক্ত হলো সাধারণ মুসলমানের প্রভাব; এর সোনালী ফসল ফলে সপ্তদশ শতকে—এই শতকের বাঙ্‌লা সাহিত্যে সে ফসলের পূর্ণ বিবরণ মেলে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (১)

পঞ্চদশ শতক

(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর

১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস (আলাউদ্দিন আলী শাহের সৎভ্রাতা) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ নামে (সারা দেশে) বাঙলা দেশের স্বাধীন সুলতান রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো আন্তরিক। তাঁর বিশেষ পৃষ্ঠ পোষকতায় গৌড়ের শাহী দরবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৩৫০ থেকে শুরু করে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোয়া দুশো বছর ধরে গৌড়ের মুসলিম শাহী দরবারে একটানা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই পৃষ্ঠ পোষকতা চলতে থাকে।

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের আমলে দিল্লীর বংগ জয়ের চেষ্টা বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে বাঙলার সাথে বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন সম্রাট 'হুইতির প্রতিদ্বন্দ্বী য়্যুনলা'র দরবারের এক রাজদূতকে গ্রহণ করেন এবং ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেও দূত পাঠান। তিনি জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি হাফিযের সাথে পত্রালাপ করতেন। তিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন বাঙলা দেশে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং মুসলিম বাঙলার কবি মুহম্মদ সগীরেরও তিনি ছিলেন সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। এ জন্যই বিদ্যাপতি তাঁকে "প্রভু গ্যাসদেব সুরতান" বলে উল্লেখ করেছেন এবং শাহ্ মুহম্মদ সগীর লিখেছেনঃ

-"রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত

www.pathagar.com

মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।
যাবৎ জীবন মুঞি দেখিলু হিঁ কাম
তান ভক্তি বিনা ধিক্ নাহি আর ধাম।"

শাহ্ মুহম্মদ সগীর বাঙলার মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'য়ুসুফ-জুলিখা"। এই কাব্যের তিনখানি অনুলিপি মরহুম সাহিত্য বিশারদ সাহেব আবিষ্কার করেছেন। একখানি সাম্প্রতিক অনুলিপিতে ডক্টর এনামুল হক্ 'ইছুপ-জুলিখা' পুঁথির রাজবন্দনা অংশ পেয়েছেন। এই রাজবন্দনার অংশটি নিম্নরূপঃ

পয়ার ছন্দ

তিন তিএ পরনাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর
বাঘ ছাগে পানি খায় নিভয়, নিডর
রাজ-রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পন্ডিত
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার
মহানরপতি 'গ্যেছ' পিরথিম্বীর সার
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপন বিজএ
পুত্র শিষ্য হন্তে তেঁহ মানে পরাজয়
মোহাজন বাক্য ইহা পূরণ করিয়া
লইলেন্ত রাজ্যপাট বাংগাল গৌড়িয়া
করুণা হীদএ রাজ পূন্যবন্ত তর
পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর।—ইত্যাদি।.....

সুলতান 'গ্যেছ দেবে'র বন্দনা-ই রাজবন্দনায় স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর পিতা সিকান্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করে গৌড় সিংহাসন দখল করেন। "পুত্র শিষ্য হন্তে তাঁহ মানে পরাজএ"—এই ছত্রে, ডাঃ এনামুল হকের মতে, কবি বলতে চানঃ 'গ্যেছ দেবে'র পিতা যেন পুত্র 'গ্যেছ দেবে'র কাছ থেকে পরাজয় কামনা করেছিলেন।—পুত্রের হাতে পরাজয়েই যেন গৌরব। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের হাতে পিতা সিকান্দার শাহ্-এর পরাজয়ের ইঙ্গিতই আছে এখানে। এ কাব্যের কোনো অনুলিপিতেই কবির ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

পরিচয় নেই। তবে এতে এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আজও চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে। এ জন্য কেউ কেউ অনুমান করেন তিনি চট্টগ্রামের বাসিন্দাও হতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চয় করে বলার মতো কোনো মাল-মশলা এখনও আমাদের হাতে নেই। অবশ্যি তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, তা' বোধ হয় মেনে নেয়া যেতে পারে, কারণ তাঁর পুঁথির সবক'টি অনুলিপি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলেই পাওয়া গেছে।

'আল্ কোরআনে' বর্ণিত হযরত ইউসূফের কাহিনী অবলম্বনেই এ কাব্য রচিত; ইউসূফ-জোলায়খার প্রেম কাহিনীই এ কাব্যের মূল কথা। তবু শুধু কাহিনী বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য নয়। তাঁর শাহ্ উপাধিতে মনে হয় তিনি কোনো দরবেশের বংশোদ্ভূত ছিলেন; কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে ধর্মের সত্য প্রচারই কবির উদ্দেশ্য। কবি নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিধাশূন্য। দেশী ভাষায় মুসলিম কাহিনী বর্ণনাই কবির অন্যতম লক্ষ্যঃ-

"কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুপ জুলেখা পদ
দেশী ভাষা পয়ার রচিত।"

কবি যেহেতু সত্যিকার কবি এবং জীবনরসিক তাই তাঁর রচনা ধর্ম কাহিনীকেও রসস্নিগ্ধ করে তুলেছে। ফারসী ভাষায় 'জামী'র বিখ্যাত কাব্যের নাম—"ইউছুফ-জোলায়খা"। কাহিনী একই; কিন্তু 'সগীরে'র রচনা 'জমী'রও পূর্ববর্তী। মহাকবি ফেরদৌসিরও এই নামীয় একটি কাব্য আছে; কিন্তু তাঁর প্রভাব সগীরের উপর পড়েছে কিনা তা পন্ডিতদের গবেষণা সাপেক্ষ। সগীরের কাব্যের পরিবেশ অনেকখানি বাঙলারই পরিবেশ এবং কাহিনীতেও কতিপয় বাঙালী চরিত্র স্থান পেয়েছে।

(খ) মুজম্মিল

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে যে ক'জন মুসলিম কবির সাক্ষাৎ মেলে কবি মুজম্মিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর দু'টি পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলির কোনো নাম দেয়া নেই, তবে বিষয়বস্তু অনুসারে পুঁথির নাম "সায়াৎনামা" বা "নীতিশাস্ত্রবার্তা" হতে পারে। তৃতীয় আরেকটি পুঁথি পাওয়া গেছে যাতে গ্রন্থকার হিসেবে মুজম্মিলের সঙ্গে য়ুসুফের নাম উল্লিখিত হয়েছে। য়ুসুফ গ্রন্থকার না হয়ে লিপিকারও হতে পারেন। যাই হোক তিনটি পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রায় একই।

"নিতি শাস্ত্র বার্তা জান পাসাণের রেক
এ সব জানিলে লোকে জ্ঞান বাড়িবেক।"

www.pathagar.com

গৃহ-নির্মাণ, খঞ্জন দর্শন, নববস্ত্র পরিধান, স্নান, স্বপ্নফল, শুভাশুভযোগ প্রভৃতি বিষয় এ পুঁথিগুলোতে যেমনি আলোচিত হয়েছে, তেমনি ভূমিকম্প, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ, স্বপ্ন বৃত্তান্ত, গৃহদাহ, নহছ আকবর, ইত্যাদির আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ইসলামী 'জ্যোতিষ ও নিত্য কৃত্যের,'— এই পুঁথিখানার রচনাকাল— ১৬৭৯ শকাব্দ (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। কিন্তু সাহিত্য বিশারদ সাহেব মনে করেন মুজম্মিল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের কবি। ডঃ এনামুল হক এই দুই মতের কোনোটাই গ্রহণ করেন নি। 'সায়াৎনামা'র শেষে মুহম্মদ "ছপী" গ্রন্থ রচনার যে তারিখ দিয়েছেন, তাই সুকুমার সেনের উল্লিখিত তারিখ, মুজম্মিলের রচনার তারিখ নয়। কবি মুজম্মিলের প্রথম উল্লেখ মেলে 'গোলে বকাউলী'র কবি 'মুকীমে'র কাব্যে। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের কবিদের একটা তালিকা দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে মুজম্মিলের নামও উল্লেখ করেছেন। মুকীমের 'গোলে বকাউলী' রচনার তারিখ নেই, কিন্তু তাঁর 'ফায়দুল মুক্তদী' গ্রন্থের তারিখ আছে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচিত। তাহলে কবি মুজম্মিল সপ্তদশ শতকের পরের কবি হতে পারেন না, একথা ধরে নেয়া যেতে পারে। 'সায়াৎনামা'র ভাষা বিচার করেও ডঃ হক এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এর ভাষা সপ্তদশ শতকের নয়, আরো প্রাচীন। এবং তার প্রমাণ স্বরূপ ডঃ হক কবির নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ-

"শাহা বদ্‌রুদ্দিন পীর কৃপাকুল হরি
শত মুখে সে বাখান কহিতে না পারি
তাহান আদেশ মাল্য শিরেতে ধরিয়া
রচিলেন্ত মোজাম্মিলে মন আকলিয়া।"

বিহারের পীর বদরুদ্দীন বদ্‌র-ই-আলম ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের বদর পাঁতিতে তাঁর নকল সমাধি রয়েছে। তিনি বিহারেই দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম প্রচারার্থে চট্টগ্রামে এসেছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। অনেকে মনে করেন, চট্টগ্রামের বদর শাহ (প্রাচীন পুঁথির বদর আলম) ও বিহারের পীর বদর-ই-আলম একই ব্যক্তি। তিনি যখন চট্টগ্রামে অবস্থান করেন তখন কবি তার মুরীদ হয়ে থাকবেন, ডঃ হক এমনি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। এ কথা সত্য হলে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের আগেও কবি মুজাম্মিল জীবিত ছিলেন। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। কবি মুকীমের জবানীতে আমরা আরও জানতে পেরেছি কবি মুজাম্মিল চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

কবির নিজের জবানীতে বোঝা যায়- 'সায়াৎনামা' আরবী থেকে তর্জমা করা হয়েছে। আরবী ভাষা সকলে বোঝেনা বলে তিনি তা' বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে অনুবাদ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ দেশী সংস্কারেরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এই পুঁথির একটি প্রাচীন প্রতিলিপির যে একটি মাত্র পাতা পাওয়া গেছে তার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

'নব গৃহ কোন মাসে নিরম্মিবেক নরে।
সে ঘর বান্ধিব আর কোন্ কোন্ বারে॥
ভালামন্দ জানিবারে মনুষ্য উচিত
কহিব পয়ার ছন্দে উপদেশ হিত॥
কার্তিক, আগুনে যদি কেহ বান্ধে ঘর।
সুভক্ষণে সুভদিনে বান্ধিব সত্তর॥'

কবির ভাষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রকাশভঙ্গীর এই ঋজুতা। বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার এই ক্ষমতাই সে কালের কাব্যের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

কাব্য পরিচয় (২)

ষোড়শ শতক

(ক) আফজল আলী

আফজল আলীর একটি পদে ছৈয়দ ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ফিরোজ শাহ্ খুব সম্ভব গৌড়ের স্বাধীন সুলতান ছৈয়দ হোসেন শাহের পৌত্র ও নস্‌রত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩)। পদটিতে কবি বলেছেন ঃ

ছৈয়দ পেরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা

ভজ সয়খি সুরংগচরণ।'

এই ছৈয়দ 'পেরোজ শাহ্' যে কবির পীর নন তার প্রমাণ কবির পীরের নাম শাহ্ রুস্তম। এক ব্যক্তির দুই পীর থাকে না। তাছাড়া সমকালীন রাজা-বাদশাহ্‌দের নাম প্রাচীন কাব্যে যেভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে এখানে 'ছৈয়দ পেরোজ শাহ'র নাম সেভাবেই উল্লিখিত হয়েছে—এই যুক্তিতে ডঃ এনামুল হক অনুমান করেছেন—এই ছৈয়দ পেরোজ শাহ্ হচ্ছেন গৌড়ের ছৈয়দ বংশীয় সুলতান ছৈয়দ হোসেন শাহের পৌত্র ও নসরত শাহের পুত্র। এই অনুমান অভ্রান্ত হলে কবি আফজল আলী ষোল শতকের দ্বিতীয় দশকে বর্তমান ছিলেন। কাজেই তিনি বাঙলার প্রাচীন কবিদের অন্যতম। তবে জনাব আহমদ শরীফ মনে করেন, 'নসিয়ত নামা'র রচয়িতা আফজল আলি ও পদকর্তা আফজল আলি ভিন্ন ব্যক্তি। তার ধারণা 'নসিয়ত নামা'র লেখক আফজল আলি আঠারো শতকের লোক। তবে পদকার সৈয়দ আফজাল ও পদকার আফজাল আলি অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। তার দু'টো পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

'নসিয়ত নামা'য় কবি আফজল আলীর যে আত্মপরিচয় আছে, তা' থেকে জানা যায়, কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার মিলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কবির পিতা

www.pathagar.com

'ভাংগু' ফকির আলেম ও দরবেশ ছিলেন। কবির পীরের নাম শাহ্ রুস্তম। পীরের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ-

"চাটিগ্রাম মধ্যে ক্ষুদ্র এক গ্রাম।
মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম ॥
সেই গ্রামে ছিল এক ফকীর আল্লার।
এ চারি মঞ্জিল ভেদ দিল করতার ॥
শাহা সে রুস্তম করি ছিল তার নাম।
আল্লার হৈল কৃপা গুণে অনুপাম॥
গায়েবী মর্তবা প্রভু তাহানে যে দিলা।
গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা॥
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর।
তান খ্যাতি একে একে হইল প্রচার॥'

সাতকানিয়ায় শাহ্ রুস্তমের নামে 'রুস্তমের হাট' ও হাটের কাছেই শাহ্ রুস্তমের মাযার আছে বলে ডাঃ এনামুল হক লিখেছেন। স্থানীয় লোকেরা মনে করে তিন চারশো বছর আগে শাহ্ রুস্তম জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ নিছক অনুমান মাত্র। 'নসিয়ত নামা'র পাণ্ডুলিপির অনুলেখক—১২২৪ মঘীতে, অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পুঁথিটি নকল করেন। একে ১১২৪ মঘী, অর্থাৎ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের নকলও মনে করা যেতে পারে বলে ডঃ হক অনুমান করেছেন এবং তাঁর অনুমানের সপক্ষে তিনি পদকর্তা আফজল আলির পূর্বোধৃত পদটি উদ্ধৃত করে কবির প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

'নসিয়ত নামা'র বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত কাব্যের মধ্যেই নিহিত। মুর্শিদ শাহ্ রুস্তম স্বপ্নে কবিকে কতকগুলি নির্দেশ দান করেন। এই উপদেশগুলোর মূলে রয়েছে 'আল কোরআন' ও 'হাদীসে'র শিক্ষা। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ-

'শাহা রুস্তম পদে মাগি পরিহার।
যতেক কহিলা গুরু সব বাক্য সার॥
দিনে দিনে বুঝি পাঁইলু বচন তোমার।
হেন বুদ্ধি না দেখি আখের হইতে পার॥

www.pathagar.com

অধম আফজল আলী অতি গুনাহ্‌গার।
পদ বন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তোমার।॥

* * * *

উপহাস্য করে বুঝি মোনাফেকগণ।
আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তে কারণ॥
খোয়াব বলিয়া শাহা রুস্তম কঁহিল।
খোয়াব বলিয়া তবে পদবন্ধী কৈল॥

লেখকের উদ্দেশ্য কাব্য রচনা নয়, ধর্মোপদেশ প্রচার। কবির কাল সম্পর্কে ডঃ হকের মত স্বীকার করে নিলে, কাব্যটি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সামান্যই। এদিক দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান আছে।

আফজল আলীর খন্ড কবিতাগুলির ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। পদাবলীর রচনারীতির আদর্শে রচিত এই কবিতাগুলিতে সাধক কবির ব্যাকুলতা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। বসন্তের বর্ণনায় কবির ভাষা উচ্ছ্বসিত ঃ-

"সব ঋতু সঙ্গে আইল রসরংগ সহিত
বিরহিনী ক্ষীণতনু মদনে চিন্তিত
আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব নব
মনোজ্ঞ সারথি লইয়া সঙ্গে ...
তরু সব হরষিত, সতত যে পুলকিত
দশদিক শোভে নানা রঙে।
নানা তরুলতা ফুলে শিরীষ চামর দুলে
ষঠপদ যন্ত্রের ঝঙ্কার।"

কবির প্রার্থনার ভাষা ঃ

হামে অলস গুরু তুঞি কল্পতরু
তছুপরে সাঞ্জি সুখ চাহি
আদি অন্ত মোহে করো ফলোদয়
মুঝে না কর নৈরাশি।

www.pathagar.com

খাক্ পাক্ করি তাহে জিউ ধরি
তমরজ সত্ব সাঞিপুরা
সোহি দয়াময় আফজলে ভাবয়
মুঝে গৌরব কর থোড়া॥

(খ) সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খানের তিনটি পুঁথিই পাওয়া গেছে খণ্ডিত আকারে। কোনো পূর্ণ পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পুঁথিগুলি হচ্ছে—(১) বিদ্যাসুন্দর, (২) রসুল বিজয়, (৩) হানিফা ও কয়রা পরী। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটির মাত্র অল্প কয়েকখানি পাতা পাওয়া গেছে।

পীয়ার মল্লিক সূত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান
তানপুত্র জি ঠাকুর তিনসিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান।
তান সূত গুণাধিক নানুরাজ ময়ল্লিক
জগত প্রচার যশখ্যাতি
তান সূত অল্প জ্ঞান হীন সাবিরিদ্ খান
পদ বন্ধে রচিত ভারতী।

কবি যে খান বা পাঠান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা এই বংশ বিবরণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। কবি বংশের সকলেই মহল্লিক অথবা সরকার পদে কাজ করতেন। ফটিকছড়ি থানার ইছাপুর পরগণার নানুপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিলো। কথিত আছে, এই গ্রামটি কবির পিতা নানুরাজা কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই গ্রামে কবির বংশধরেরা এখনো আছেন বলে জানা যায়।

কবির খণ্ডিত কাব্যগুলিতে কবির সময় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এসব কাব্য যে ভাষায় লিখিত হয়েছে তাতে কবির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ মেলে। 'রসুল বিজয়,' 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'হানিফা-কয়রা পরী'র ভাষা ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের ভাষা। ডঃ সুকুমার

www.pathagar.com

সেন অবশ্যি অনুমান করেন—সাবিরিদ্‌খান সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। কিন্তু কবির রচনায়, যে সব ভাষা-তাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তা' ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রন্থে দেখা যায়। কাজেই ডঃ হকের মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। —অর্থাৎ সাবিরিদ খান ষোড়শ শতকের শেষের দিকের কবি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

বিদ্যাসুন্দর ঃ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অতি পুরোনো। এ কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি কোনো সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসরণ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ—কবি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে তারই ব্যাখ্যা করেছেন পয়ার ত্রিপদীতে।

ষোড়শ শতকে দ্বিজ শ্রীধর ও কবি কঙ্ক আরো দু'খানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লেখেন গোবিন্দ দাস ও কৃষ্ণরাম দাস। এঁদের কারো ভাষাই সাবিরিদ খানের ভাষার মতো প্রাচীন নয়। কাজেই তিনি এঁদের সকলের থেকে প্রাচীন কিনা তাই বা কে বলবে।

সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরকে কাব্য না বলে একটা নাট্য-কাব্য বলাই সংগত। তাঁর প্রত্যেকটি বর্ণনাই যেন এক একটি দৃশ্যের চিত্র। কবি নিজেও তাঁর কাব্যের নাট্য গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।—

"এ নাট গীতেত তাল না করিয়া ভঙ্গ
এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গ।"

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সুপরিচিত হলেও সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দরে' নতুনত্ব আছে। এ কাব্যে সুন্দরের পিতা হচ্ছেন গুণসাগর, আর মাতা—কলাবতী। গুণসাগর হচ্ছেন বিজয়নগরী রাজ্যের রত্নাবতী পুরীর রাজা। জ্ঞানে ও কাব্যকলায় অসাধারণ পারদর্শী পুত্রের নাম রাখলেন—'বিদ্যাসুন্দর'।—আর বিদ্যার পিতার নাম কখনও বিক্রম কেশরী, আর কখনও বা বীর সিংহ; মাতার নাম শিলাদেবী। সর্বশাস্ত্রে বিদুষী বিদ্যার নাম হলো—'বিদ্যাবতী'। তার পণ—বিদ্যায় যে তাকে হারাবে তাকেই সে বরণ করবে পতিত্বে। এই কথা শুনে 'বিদ্যাপতি সুন্দর' এলো কাঞ্চীপুর। সুচরিতা মালিনীর কাছে সে আশ্রয় চায় রাতের মত। কাব্যের এই অংশের ভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রাঞ্জলতা সংশয়াতীতঃ-

www.pathagar.com

সুন্দর ঃ—

"আম্মাজান বৈদেশী নিশ্চিত
দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত
পাঠ পড়ি ভ্রমি এ নগর
পণ্ডিতানী করিতে বিচার।
বেলাশেষে অস্ত যায় সূর
বাসাখানি মাগি তোহ্মা পুর
পালহ বচন সুনয়নী
প্রেম চিত্তে দাও বাসাখানি।"

উত্তরে মালিনী বলছে ঃ-

"জবে আর ভিন্ন দেশী পাই
যত্ন করি তাহাক রহাই
মনে ভীত বাসি তোহ্মা দেখি
মহারাজ সূত হেন লখি।"

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি আপাতঃ দৃষ্টিতে একটি প্রেম কাহিনী মনে হলেও আসলে এ হচ্ছে একটি রূপক কাব্য—ইহাই ডঃ হকের ধারণা। তাঁর মতে সুন্দর হচ্ছে—শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক এবং বিদ্যা মানুষের জ্ঞানের প্রতীক। মূল রূপক কাব্যটিকে সাবিরিদ খান রূপক নাট্যের রূপ দিয়েছেন, এখানেই কবির কৃতিত্ব।

কারো কারো ধারণা এ রূপকের মূলে আছে দেহমনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী। তত্ত্বটির মতে সুন্দর সুডোল, সুগঠিত দেহে যখন মার্জিত, উন্নত রুচি, সৌন্দর্যরসিক সুন্দর মনের বিকাশ ঘটে, তখনই হয় মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। মনুষ্যত্বের এই পূর্ণতার আদর্শই বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ। শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে মানসিক সৌন্দর্যের মিলন দেখানোই এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্দেশ্য। কবির রচনা কতো প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী পূর্বের উদ্ধৃতিতেই তা প্রমাণিত হয়। সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত; অলংকার ও উপমা প্রয়োগে তিনি অব্যর্থ। এ প্রসঙ্গে বিদ্যার রূপ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

মুখ বিধু পূর্ণ হলো কিএ অরবিন্দ।
মৃগবৎস নেত্র কিবা নীল মত্ত ভৃংগ॥

www.pathagar.com

বালেন্দু জিনিয়া ভাল সীমন্ত উজ্বল।
বান্দুলি প্রসূন নিন্দি অধর যুগল॥
রদ শাঁতি মুতি জ্যোতি বাচি সুমধুর।
ভূরুভংগে কামশর নিঃসরে প্রচুর॥
কণ্ঠরেখা দেখি কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল কলিকা কুচ হৃদয়ে উগিল॥

রসূল বিজয় ঃ—সাবিরিদ খানের এই খণ্ডিত পুঁথিটির ২১-৩২ পর্যন্ত মাত্র ১২টি পাতা পাওয়া গেছে। কাব্যটির বিষয়বস্তু কাব্যের নামেই স্পষ্ট; অর্থাৎ রসুলের জীবন বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। রসুলের দেশ বিজয় উপলক্ষে কবি তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। 'রসুল-বিজয়' নামক আরেকখানি কাব্যের রচয়িতা হচ্ছেন—জৈনুদ্দিন। সুপণ্ডিত সাবিরিদ খানের কবি প্রতিভা ছিলো জৈনুদ্দিনের কবি প্রতিভার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। নিম্নের উদ্ধৃতিতে কবির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কিছু পরিচয় মিলবে ঃ

"প্রমোদিত পাএগামুর প্রশংসি বুলিলা
মিত্রভাবে আল্লাএ তোমাকে জএ দিলা
আল্লার কেসারী তুমি না থাকিত জদি
তবে তাকে ধরি আনি কে করিত বন্দী
আলিক বাখানি নবী কৈলা আশীর্বাদ
আনন্দ উল্লাসে সব জএ জএ বাদ
ছালার হৈলা বন্দী সর্ব সৈন্য ত্রাস
নৃপতি দেখিয়া শোকে হৈলা হতাশ।
সাবিরিদ খানে কহে রসুল বিজএ
সুনি বধু কর্ণ পুরি সুধা বরিষএ।"

পুত্রের বন্দীত্বে কাতর নৃপতির উচ্ছ্বাস আমাদের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে পুত্রশোকে কাতর রাবণের শোকোচ্ছ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

"ছালার বিচ্ছেদের ক্লেশ পাইলা।
কেন নবিদরে বজ্র হিয়া॥
অবসেস মোহর কুঞ্জর।
সংগ্রামে রুস্তম সমসর॥

www.pathagar.com

ভুবন-বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর।
রণে দক্ষ প্রতাপে ভাস্কর॥
দেখিলু প্রত্যক্ষ নয়ানে।
হেন পুত্র বান্ধি রিপুগণে॥
এত দুঃখ সহিব কার প্রাণ।
অপমানে তেজিনু পরাণ॥
হাহা পুত্র ছিপাহ্ ছালার॥
জগত বিজয়ই বলি আর॥"

নৃপতির বীরপুত্র সিপাহ্-সালার আলী কর্তৃক বন্দী হওয়ার পর সিপাহ্-সালারের ভ্রাতা মুলুক সাহা প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে রণসাজে সজ্জিত হয়। এই রণসজ্জা বীরবাহুর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা মেঘনাদের রণসজ্জারই অনুরূপ।

'রসুল বিজয়' কাব্যটিতে একটি বিবাহের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় কবির সমকালীন বিবাহোৎসবের একটা মোটামুটি চিত্র মেলে। সেনাপতি খবাইলের সংগে জয়কুন রাজকন্যার বিয়ে হয় হযরতের আদেশে। সে বিয়েতে—"ঘরে ঘরে সুগন্ধি তাম্বুল বণ্টিত হয় এবং সব মহাজন সে বিয়েতে আসেন। আনন্দ আর ধরে না; নাচ-গান-বাজনায় একেবারে হুলস্থুল ব্যাপার। এমনকি ঃ-

"বেশ্যানারীগণ নাচএ ঘন ঘন

মোহাম্মদ রাজপুরে"!—কনের গায়ে হলুদ কস্তুরী চন্দনের প্রলেপ, মাথায় সিন্দুর, কুঞ্চিত চুলের সু-উচ্চ কবরী, তার সঙ্গে

—"সপ্তদিন রাতি তেলে আই নিতি

নারী সবে দিলা রঙ্গে।' —কল্পনার কি বাহাদুরি?

— রসুলের ঘরে বিয়েতে "বারবণিতা' আমদানী ইসলাম সম্পর্কে কবির সীমাহীন অজ্ঞতাই প্রমাণ করে।

কবি সাবিরিদ খানের 'হানিফ ও কয়রাপরী' ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে নুতনত্বের দাবী করতে পারে। এ গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জলতর এবং বিষযবস্তু স্ব-কপোল কল্পিত—যদিও ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করেই কবি কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হানিফের সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধে পরাজিতা বীর কন্যা জৈগুনের বিয়ে,

www.pathagar.com

সহিরাম রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হানিফার আহত হওয়া এবং শাহা পরীর কন্যা কয়রা পরীর নজরে পড়া ও প্রেমাসক্তা কয়রা পরী কর্তৃক হানিফার হরণ; পরে কয়রা পরীর বিরুদ্ধে জৈগুণ বিবির যুদ্ধাভিযান, দুর্মিক রাজার পরাজয় ও ইসলাম গ্রহণ—ইত্যাদি বর্ণনার পর পুঁথিখানি খণ্ডিত।

(গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ মহাভারতের অনুবাদ

১৪৯৩ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট হোসেন শাহ্ ছিলেন গৌড়ের সুলতান। হোসেন শাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়; চট্টগ্রামে মগেরা পরাস্ত হয় এবং ত্রিপুরা রাজও ভীত হয়ে পড়েন। 'রাজমালা'র লেখক বলেন—আরাকানীরা পরে হোসেন শাহের নিকট থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। এই হোসেন শাহের দরবারেই, শ্রীযুত গোপাল হালদারের মতে 'বাঙলা কাব্য ভূমিষ্ঠ হয়'। হোসেন শাহ্ ছিলেন জ্ঞানী, গুণীর পৃষ্ঠপোষক, বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভক্ত ও উৎসাহদাতা। হোসেনী বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়টা সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার জন্য বাঙলাদেশ অবিস্মরণীয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, মর্যাদা দান, অনুশীলন ও বিস্তৃতির জন্য হোসেনী বংশের তুলনা এদেশের ইতিহাসে মেলে না।

হোসেন শাহ্ ছিলেন খাঁটি আরব বংশজাত। ইসলামের উদার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আদর্শের সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো প্রত্যক্ষ; তাই তিনি ছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করায় বাঙলাদেশের সঙ্গেও তার পরিচয় হয় নিবিড়তর। বাঙলাদেশ ও আরবের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হোলো বাংলা কাব্যের। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত (অনুমান ১৪৯৫ খৃঃ) এবং চব্বিশ পরগণার কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর কাব্যে হোসেন শাহের প্রশংসা কীর্তন করেছেন। বাঙলায় ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার রেওয়াজ হয় হোসেন শাহের-ই আমলে। হোসেন শাহের বর্ণনাকারী শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান একাধারে তাকে 'জগৎভূষণ' এবং 'বিদগ্‌ধজন' বলে উল্লেখ করেছেন। বৈদগ্ধ্য বা রসজ্ঞানই বাঙলা সাহিত্যের প্রতি হোসেন শাহের পোষকতার একটি কারণ। ধর্ম সাহিত্যের বাঙলায় অনুবাদ হোসেন শাহের অন্যতম কার্তি,—তার প্রমাণ পরাগলী 'মহাভারত'। তাঁর আমলের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫০৩) আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা। তাতে করে বৈষ্ণব সাহিত্যের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

হোসেন শাহের সভাসদ ছিলেন রূপ সনাতন, পুরন্দর খাঁ। তাঁর দরবারে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চা হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবেই করেছেন। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মা পুরাণে' তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। পদাবলীতেও হোসেন শাহের উল্লেখ বহু; যেমন ঃ

"শ্রীযুক্ত হুসন জগৎভূষণ, সেহ এ রস জানে,
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খানে।"

পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্বে ছত্রে ছত্রে হোসেন শাহের গুণগানু কীর্তিত হয়েছে।

হোসেন শাহের দরবার থেকে মগী-দমনের জন্য স্বয়ং শাহ্‌জাদা ভাবী সম্রাট নুসরত শাহ্ এবং সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে প্রেরিত হন। পরাগল খাঁ ছিলেন হোসেন শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ফেণী নদীর তীরে চট্টগ্রাম জোরতারগঞ্জ থানার অধীনে পরাগলপুর এখনো বর্তমান। সুবৃহৎ পরাগল দীঘির পানি আজও ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদ আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। মগী-সৈন্য বিজয়ী মহাবীর পরাগলের কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু পোকায় খাওয়া একখানা তুলোট কাগজের পুঁথি সেই লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করে। পুঁথিখানা হচ্ছে—পরাগলী ভারত বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত। পরে পরমেশ্বর দাসের নির্ভরযোগ্য পুরোণো পুঁথি কয়েকখানাই পাওয়া গেছে। পুঁথিটির ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

'নৃপতি হুসেন শাহ্ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন শাহ্ গৌড়ের ঈশ্বর।
ভান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ কসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিস্তর পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র-পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥"

www.pathagar.com

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ, পুত্রের নাম ছুটি খাঁ। এই পুঁথিটিতে তাঁদেরও উল্লেখ আছে। স্বীয় পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের গুণকীর্তন কবীন্দ্র প্রতি পাতায় পাতায় করেছেন; ভাবাতিশয্যপূর্ণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবির কৃতজ্ঞতা-রসের অভিব্যক্তি ঘটেছে ঃ

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ
পুণ্য কীর্তি, গুণাস্বাদী পরাগল খান।"—কিংবা
"শ্রীযুক্ত পরাগল পদ্মিনী ভাস্কর।"
"লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান
অষ্টাদশ ভারতে যাহার অবদান
দানে কল্পতরু সে যে মহাগুণশালী
কুতুহলে করাইল ভারত-পাঞ্চালী।"

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০ শ্লোকে রচিত। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কবি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করেছেন। সেকালে এ ধরনের অনুবাদ কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই অনুবাদে চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থানে স্থানে খুবই জটিল হয়ে পড়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। অপেক্ষাকৃত সহজ অংশ থেকেও কবীন্দ্রের কবিত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা

সত্য কহ আহ্মাতে কপট পরিহরি
কি নাম তোমার কহ কাহার বর নারী
দুই উরু গুরু তোর অতি সুললিত
নাভি গভীর তোমার বাক্য সুললিত
দশন ডালিম্ব বিজুলি নয়ন
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ।
* * * *
নারী সব তোহ্মা দেখি পাশরিতে নারে
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য রাখিবারে
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন?

www.pathagar.com

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কোমল লোচন॥
মেঘের বিদ্যুত তুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিয়ে চূড়া মালতি মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যায়॥

ক্রোধের বর্ণনায়ও কবি সিদ্ধহস্ত। ভীষ্ম পর্বে, যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ-

দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্ভাষণ।
হস্তেতে লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য সমান জ্যোতি সহস্র বজ্র সম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। কবীন্দ্র তাঁর গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥"

হোসেন শাহের পুত্র নস্‌রত শাহ্ একখানি মহাভারত সংকলণ করিয়েছিলেন। পরাগলী মহাভারতে তার উল্লেখ আছে ঃ

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নস্‌রত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান॥"

www.pathagar.com

(ঘ) শ্রীকরণ নন্দী

ছুটি খানও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি কবি শ্রীকরণ নন্দীকে জৈমিনি-সংহিতার অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করতে আদেশ করেন। কবির কল্পনা সুদূরপ্রসারী; প্রভুর মন তুষ্ট করবার রীতিনীতিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ছুটি খানের প্রশংসা, গুণ-কীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনে তিনি একেবারে শতমুখ; তাতে ইতিহাস তলিয়ে গেছে। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ কবির ভাষায় ঃ

"পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি
একদিক বসিলেক বান্ধব সংহতি
শুনন্ত ভারত তবে অতি পূণ্যকথা
মহামুনি জৈমিনি কহিচে সংহিতা
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রশান্ত হৃদয়
সভামধ্যে আদেশিল খান মহাশয়
দেশীভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার
তাহান আদেশ মালা মস্তকে ধরিয়া
শ্রীকরণ নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া।"

কবির পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁ তনয় ছুটি খানের বর্ণনায় কবি একেবারে উচ্ছ্বসিত ঃ

"লস্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি
দাতা বলি, কর্ণ সম অপার মহিমা
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, নাহিক উপমা।
* * * *
ত্রিপুরা স্থপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।"

www.pathagar.com

শ্রীকরণ নন্দী ছুটি খানের আদেশে অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। জৈমিনি ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্বই পাওয়া গেছে। কারো কারো ধারণা জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্বেরই অনুবাদ করেন। এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। শ্রীকরণ নন্দী জৈমিনী ভারতেরই তর্জমা করেন। যৌবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ-জ্বলা, চণ্ডিকা, সুধন্বা, সুরথ, হংসধ্বজ, প্রমীলা-অর্জুন-বভ্রুবাহন, তাম্রধ্বজ ও চন্দ্রহাস,—এঁদের উপাখ্যানই শ্রীকরণ নন্দীর কাব্যের প্রধান বিষয়। কবির রচনার ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর আরেকটা গুণ তাঁর ব্যঙ্গরসিকতা। ভীম ও কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যুবনাশ্বের পুরী থেকে ঘোড়া আনয়নের জন্য ভীম মনোনীত হন; কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তা অনুমোদনযোগ্য নয়; অনেকগুলো যুক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ

"বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর।"

উত্তরে ভীম বললেন ঃ—

"মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন
সংসার উপালন্ত সব খাইলা তুহ্মি
তাহা হৈতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আহ্মি
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী
তুমি নারীজিৎ মা হও আহ্মি নারীজিৎ
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত।"

* পটীয়ার অন্তর্গত জঙ্গল-খাইন গ্রামে নন্দী বংশে শ্রীকরণ নন্দীর জন্ম।

(ঙ) দৌলত উজীর বাহরাম খান

(১৫৪৫-১৫৭৬ খৃঃ)

কবির কাব্য 'লায়লী মজনু'তে কবির যে আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ। কবির প্রথম রচনা অবশ্য জংগনামা বা কারবালা কাহিনী। উক্ত কাব্যের

www.pathagar.com

চারখানি খণ্ডিত লিপি কুমিল্লার অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের সংগ্রহে রয়েছে। এগুলির একটির ভণিতায় 'বার-আউলিয়া, 'চাটিআগ্রাম, জাফরাবাদ (ফতেয়াবাদ) ও নৃপতি নিজাম শাহার' উল্লেখ আছে। কবি নিজেকে নিজাম শাহার অধীন সেবক বলে উল্লেখ করেছেন। 'লায়লী মজনু'তে লিপিবদ্ধ আত্মবিবরণীতে জানা যায় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্ প্রধান উজীর হামিদ খাঁকে চট্টগ্রাম দখল করতে পাঠান। তিনি চাঁটগাঁ দখল করে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে গৌড়ের রাষ্ট্র বিপ্লবের অবসান হলে শূর বংশীয় নিজাম শাহা চট্টগ্রামের অধিপতি হন। পূর্বোক্ত হামিদ খানের অধস্তন পুরুষ মোবারক খান তখন জীবিত ঃ

"ঐ যে হামিদ খান আদ্যের উজীর জান
তাহান বংশেত উৎপতি
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদা ধর্মে কর্মে তান মতি
তান প্রতি মহীপাল খিতাব অধিক ভাল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর
সাধু সৎ লোক সঙ্গে জনম বঞ্চিলা রঙ্গে
ধর্মরূপে ত্যজিলা শরীর
তান সুত মূঢ় সম নাম মোর বাহ্‌রাম
মহারাজ গৌরব অন্তরে
পিতাহীন শিশু জানি দয়া ধর্ম অনুমানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।"

চট্টগ্রামের শাসনাধ্যক্ষ নিজাম শাহ্ এই মোবারক খাঁনকে দৌলত উজীর বা রাজস্ব মন্ত্রী উপাধি দান করেন। মোবারক খাঁনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অল্পবয়স্ক বাহ্‌রাম খানের প্রতি করুণাবশে নিজাম শাহ্ দৌলত উজীর উপাধিটি প্রদান করেন।

কবি প্রদত্ত এই বিবরণ ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত 'নিজামপুর পরগণার প্রতিষ্ঠাতা দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের কাব্যে উল্লিখিত নিজাম শাহ্ শূর ছাড়া আর কেউ নন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ্ শূরের নিকট থেকে বাহ্‌রাম খান 'দৌলত উজীর' উপাধি গ্রহণ করেন। তখন তিনি ১৫/১৬ বছরের তরুণ। যদি ধরে নেয়া যায়, ১৫ বছর বয়সেই কবি এ

www.pathagar.com

কাব্য রচনা করেছেন তাহলে রচনার কাল পড়ে ১৫৭৫ খৃঃ-এর দিকে। ডঃ হক এ অনুমানের ভিত্তিতে 'লাইলী মজনু' ১৫৬০ খৃঃ-১৫৭৫ খৃঃ এর মধ্যে রচিত হয়েছে বলে ধারণা করেন।

কবির পূর্ব পুরুষ হামিদ খান বসতি স্থাপন করেন চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ নামক স্থানে। কবির সময়ে চট্টগ্রাম শহর ফতেয়াবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো বলে মনে হয়। বিখ্যাত পারস্য কবি আব্দুর রহমান জামীর একটি জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে—'লায়লী মজুন'।—দৌলত উজীরের গ্রন্থ তারই সারানুবাদ। কিন্তু কবি ক্ষমতাবান, তাই অনুবাদও কাব্য হয়ে উঠেছে ঃ

"বিনি শ্রুতি সুনএ ছামিউ ধরে নাম
বিনি আঁখি দেখএ বসিআ অনুপাম
কর নাহি পদ নাহি নাহি কাএ ছায়া
কামক্রোধ নাহি তান নাহি মোহছায়া।"

আল্লাহ্‌র বন্দনায় ইসলামের আল্লাহ্‌র ধারণা যেমন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি ঃ

"গুণের ঈশ্বরী তুমি জননী বেদনী
তুমি বিনে নাহি আর দুঃখের দুঃখিনী
ঐ যে মজনুবর পরম দুঃখিত
মোহর পিরীতি ভাবে হইছে তাপিত
যখন শরীর তেজি আমি চলি যাই
বারতা জানিব মোর মজনুর ঠাঁই
যার লাগি যেই জনে যত দুঃখ পাএ
এক চিত্তে ভাবিলে সে অবশ্য তারে পায়॥

এ ছত্র ক'টিতে মজনুর জন্য লায়লীর যে আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, তাতেও চিরকালের প্রেমিকার ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মোট কথা ভাবে ভাষায়, আন্তরিকতা তথা কাব্যের আবেদনের দিক দিয়ে 'লায়লী মজনু' ষোড়শ শতকের বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি।

www.pathagar.com

(চ) হাজী মোহাম্মদ

'নূর জামাল' নামক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা হাজী মোহাম্মদ বাঙলাদেশের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। শেখ মুত্তালিব 'কেফায়তুল মুসল্লিন' রচনা করেন ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা হচ্ছেন—'নূরনামা' ও 'কায়দানী কেতাবে'র রচয়িতা শেখ পরাণ। শেখ পরাণ তাঁর পূর্ব সূরী হিসেবে দুই কবির নাম করেছেন। তাঁদের একজনের নাম হাজী মোহাম্মদ, অন্যজনের নাম সৈয়দ সুলতান। সুতরাং তিনি যে শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণেরও পূর্ববর্তী কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ যুক্তিতে বলা যায়—হাজী মোহাম্মদ ষোড়শ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন।

(ক) ছুরত নামার মধ্যে ইমার ছিফাত।
রচিহন্ত হাজী মোহাম্মদ ভালমত॥
(শেখ পরাণ, কায়দানী কিতাব)

(খ) ফাতিমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান।
নবী বংশ রছিচন্ত ছৈয়দ সুলতান॥
(নূরনামা, —শেখ পরাণ)

এখানে নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে হাজী মুহম্মদ 'ছুরত-নামা' নামক একটা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশিষ্ট কাব্যটির কোন পাণ্ডুলিপি আজো পাওয়া যায়নি।

নুরজামাল একটি অতিশয় দার্শনিকতাপূর্ণ কাব্য। সুগভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এতে অতি চমৎকার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার তওবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে তরীকতের কথা। নূর দু'প্রকারের—জালালী নূর ও জামালী নূর। জালালী নূরের উগ্রতা ও তীব্রতা সকলের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তাই জামালী নূরই কাম্য। জামালী নূর স্নিগ্ধ চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ ও মোলায়েম। নূর জামাল কাব্যের বক্তব্য হচ্ছে এই জামালী নূরের প্রাপ্তি-রহস্য ঃ

নূরজামালে কহে বাতিনে অনুক্ষণ।
আল্লা পরে আর কিছু না কর এ মন॥
দুনিয়ার সুখে ভোগে মন নহে ভোলা।
হামিশা গাহেব মনে কর ওলামেলা॥

www.pathagar.com

হক্কেত ডুবিআ মন থাকে অনুক্ষণ।
আপনারে আপনে হারাএ ততক্ষণ॥
এইরূপ হাল যদি হইল বান্দার।
মলকুত হাসিল তবে হইব বান্দার॥

কবি বলতে চান খোদা ও বান্দা অভিন্ন, তবু বান্দাকে খোদা বলা যায় না;—এই তত্ত্বটি অতি চমৎকার ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেন ঃ

"এক হন্তে হইল দুই, দুই হন্তে সকল।
বীজ হন্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হন্তে ফল॥
ফল, বৃক্ষ, বীজ এই তিন নাম হএ।
একে হএ তিন জানি, তিনে এক হএ॥
বীজ, বৃক্ষ, ফল হন্তে কেহ ভিন্ন নহে।
তথাপি ফলের বৃক্ষ কহন না যাএ॥
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কাএ।
তেন রূপে জানিও সে বন্দা আর খোদাএ॥
খোদা আর বন্দা জান কিছু ভিন্ন নহে।
তথাপি বন্দারে জান ন বোলে খোদাএ॥
দরিআর পানি যেন গৌরসে উথলে।
গৌররে দরিআ কেহ কভু নাহি বোলে॥"

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঢেউ উঠে, সে ঢেউ সমুদ্র থেকে উঠে আবার সমুদ্রেই লোপ পায়। দরিয়ার বাইরে ঢেউএর অস্তিত্ব নেই। তবু ঢেউকে যেমন কেউ দরিয়া বলে না, তেমনি মানুষের সত্ত্বা আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় নিহিত হলেও মানুষকে কেউ বলেনা খোদা।

বান্দা আর খোদা যদি অভিন্ন হয়, তাহলে তো বান্দার সংগে সংগে খোদারও মৃত্যু হওয়া উচিৎ। কিন্তু তা' হয়না কেন তার জবাব দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"সাগরের হন্তে সর্ব ঢেউ জনমএ।
ঢেউ মৈলে কবো (কভু) সাগর ন মরএ॥

www.pathagar.com

ঢেউ সাগর জেন কিছু ভিন্ন নহে।
তেন মতো জানিও বান্দা আর খোদাএ।"

* * * *

"ফল মৈলে কভু জান গাছ ন মরএ।
তেন রূপে জানিও বন্দা আর খোদাএ॥"

* * * *

"বন্দার আচারে কভু খোদা ন পীড়এ।
বন্দার মরণে কভু খোদা ন মরএ॥"
আছিল, আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ।
জন্ম মৃত্যু নাহি তার আওনা গমন।"

পুঁথিটিতে কবির জন্মস্থানের কোনো উল্লেখ নেই। তবু সাহিত্য বিশারদ সাহেব অনুমান করেছেন যে কবি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।

(ছ) মুহম্মদ কবীর

মুহম্মদ কবীর বাঙ্‌লা দেশের প্রাচীন কবিদের অন্যতম। আজ পর্যন্ত তাঁর একটি মাত্র পুঁথির দু'টি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিটি অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাঙ্‌লা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। পুঁথিটির নাম 'মধুমালতী'। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, এ কাহিনী নিয়ে ছ'জন কবি কাব্য রচনা করেছেন—মুহম্মদ কবীর, শাকির মোহাম্মদ, সৈয়দ হামজা, গোপীনাথ দাস, মুহম্মদ চুহর ও জোবেদ আলী। 'চুহরে'র কাব্যটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। চুহরের 'আজর শাহ্ ছমন রোখ' নামক কাব্যে তাঁর 'মধুমালতী'র উল্লেখ রয়েছে। মুহম্মদ কবীরই এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম।

কবি এ কাব্যটি যে ফারসী থেকে তর্জমা করেছিলেন তার প্রমাণ কবির ভণিতা ঃ

"মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পাঁচালি॥"

* * * *

"মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালি।।"

www.pathagar.com

কবি মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে 'মনোহর মধুমালতী'র উল্লেখ থেকে বোঝা যায় কাব্যের কাহিনীটি বেশ প্রাচীন এবং এটি একটি ভারতীয় কাহিনী। কাব্যের নায়কনায়িকার নামও এই মতের পরিপোষক। "সরস্বতী বন্দনা, বাঙলা ভাষা অর্থে 'হিন্দুয়ালি' শব্দের প্রয়োগ, ভাষার প্রাচীনতা জ্ঞাপক শব্দাবলীর ব্যবহার, কাজী দৌলতের 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যে কাহিনীটির উল্লেখ এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অসমাক্ষর প্রয়োগ"—ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে মুহম্মদ কবীরকে প্রাচীন বাংলা কবিদের অন্যতম মনে করা হয়ে থাকে। কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি পাণ্ডুলিপিতে দু'রকম লেখা হয়েছে ঃ

(১) "অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তার পাছ
পাঞ্চালি ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ॥"

(২) "অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছে।
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ॥"

ডঃ হক শেষোক্ত তারিখের পাঠশুদ্ধি করেছেন নিম্নরূপ ঃ

"অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরির পাঁচ॥"

এ দুটি পাঠ থেকে যেসব তারিখ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় কাব্যটি ১৪৮৫ খৃঃ এর মধ্যে কোনো সময়ে রচিত হয়ে থাকবে। ডঃ হক যে পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন, তার অনুলিখনের তারিখ হচ্ছে—১১০১ মঘী বা ১৭৩৯ খৃঃ অঃ। কাজেই, মুহম্মদ কবীর উনিশ শতকের কবি, ডঃ সুকুমার সেনের এই মত টেকে না।

পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে কবির বাসস্থান সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অন্য কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে ; কারণ,—সম্পাদিত পুঁথিটি এবং দুটি পাণ্ডুলিপিই চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। 'মধুমালতী' কাব্যে চট্টগ্রামে প্রচলিত 'বহু বিভক্তি, প্রত্যয় ও শব্দে'র ব্যবহার এই অনুমানকেই জোরদার করে।

www.pathagar.com

'মধুমালতী'র কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ

মনোহর কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রাণী কমালাসুন্দরীর একমাত্র সন্তান। মনোহর বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর রাজা রাণী তার উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। একদিন মনোহরকে বাগানে নিদ্রিত অবস্থায় পরীরা দেখতে পায়; তার রূপ দেখে তারা আচ্ছন্ন হয়ে প্রলাপ বক্‌তে শুরু করে। এমন সুন্দর কুমারের যোগ্য নারী কোথায় আছে? তাদের তখন মনে পড়লো মহারস রাজ্যের রাজা বিক্রম অভিরাম ও তৎপত্নী রূপমঞ্জরীর কন্যা মধুমালতীর কাথা ঃ

"নৌআলি যৌবনি বালি সাজিছে নবরঙ্গে

সোনার পোত্‌লা যেন সুতিছে পালঙ্কে॥"

অপূর্ব সুন্দরী সেই কন্যা। তখন তারা মনোহরের পালঙ্কসুদ্ধ তুলে নিয়ে মধুমালতীর পালঙ্কের পাশে রেখে দিল। ঘুম ভাঙ্‌লে দুজনেই 'মনে চিন্তে প্রত্যক্ষ কিবা দেখি এ স্বপন।' মনোহর 'এক শশীমুখ দেখে পালংক উপর।' তার রূপের জ্বালা সইতে না পেরে মনোহর বেহুঁশ হয়ে পড়লো, মধুমালতী অভিভূতের মত তার মাথা নিজ কোলে নিয়ে বসে থাকে। হুঁশ ফিরে এলে মনোহর বল্‌লো,—

"শুন আএ শশীমুখী কমল নয়ান
তোমার অঙ্গের ছন্দে বান্ধিলা পরাণ।"

মনোহর অতঃপর নিজের পরিচয় দিলে মধুমালতীও নিজের পরিচয় দিয়ে বলে ঃ

"রাজার নন্দিনী আহ্মি সর্বলোকে জানে।

পরাণে বধিলা মোরে তুয়া অঙ্গ বাণে॥
দরশনে পরাণ মোর ধাএ কিবা রএ।
না জানম পরশিলে আর কিবা হএ॥'

এরপর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে তারা অঙ্গুরী বিনিময় করে, রঙ্গরসের পর নিদ্রা গেলে পরীরা আবার মনোহরকে পালংসুদ্ধ তুলে এনে তার নিজ বাগানে রেখে দেয়। তাদের ঘুম ভাঙ্গার পর দু'জনেই অবাক হয়ে ভাবতে থাকে ঃ একি স্বপ্ন-না বাস্তব? মনোহর প্রায় দীওয়ানা হয়ে গেলো। পিতা সূর্যভান তখন তাকে লোক লস্করসহ মধুমালতীর খোঁজে পাঠান। পথে লোকলস্কর সব মারা যায় এবং

www.pathagar.com

মনোহর গিয়ে পৌছায় এক বনে। সেখানে এক দৈত্য কর্তৃক বন্দিনী, জটবহর-রাজ ছত্র সেনের কন্যা পায়মার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। পরমাসুন্দরী পায়মাকে দেখে মনোহর ভাবে ঃ

'একরূপ লাগি মুঞি হৈলু দেশান্তরী।
আর রূপ চাহে মোর প্রাণ নিতে হরি॥'

উভয়ের আত্মপরিচয় দানের পর মনোহর জানতে পায় পায়মা মধুমালতীর সখী। পায়মার সাহায্যে দৈত্যকে বধ করে মনোহর পায়মার পিতৃরাজ্য জটবহরে আসে। এখানে মালতী ও মনোহরের মিলন স্বচক্ষে দেখে রূপমঞ্জরী সুন্দরী মালতীকে একটি শুক-পাখী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। সেই শুক 'মাণিক্য রস' রাজ্যের রাজা তারা চাঁদের হাতে ধরা পড়ে; মালতীর পিতা রাজা বিক্রম অভিরাম শুক-রূপিনী মালতীকে চিনতে পারেন এবং তারা চাঁদের মুখে মনোহরের সঙ্গে কন্যার প্রণয় কাহিনী জানতে পেরে তাকে আনিয়ে তার হাতে মালতীকে সঁপে দেন এবং তারাচাঁদের সাথে পায়মারও বিয়ে হয়ে গেলো। মনোহর প্রথম দর্শনের পর মালতীকে বলে ঃ

"তোহ্মা আহ্মা ললাটে লেখিছে পূর্বকালে
তে কারণে তুহ্মি আহ্মি হৈছি এক মেলে।
ন জানম কোন্ হেতু আইলু তুয়া পাশ
এক তিল তুহ্মি বিনে জীবন নৈরাশ।"

আর তার জবাবে মধুমালতী বলে ঃ

'তুহ্মি আহ্মি দুই তনু প্রাণি এক জান
সদা এ হউক প্রেম হউক কল্যাণ।
এ রূপ যৌবন তোহ্মা পদের নিছন॥
তুহ্মি তরু, আহ্মি লতা সর্বাঙ্গে জড়ন॥

দু'য়ের পরিণয়ে সেই ললাটের লিখন হলো সার্থক। পুঁথিটির ঘটেছে একটি মিলনান্ত পরিণাম।

ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি, বর্ণনা ভঙ্গী ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যে মুহম্মদ কবীর একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পরিমিতি বোধ ও সংযম, উপমা

www.pathagar.com

অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ঘটনা বিন্যাস, আবেগ অনুভূতির স্থান-কালোপযোগী চিত্রণ—ইত্যাদির বিচারে তিনি সত্যিকার সৃজনী-প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বর্ননা চিত্রধর্মী, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ব্যাপক অনুকরণ সুস্পষ্ট।

চর্যাপদ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত (আঃ ৮ম শতক থেকে ১৮০০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত) যত কাব্য কবিতা হিন্দু কবিরা সৃষ্টি করেছেন, তাতে মানুষের কাহিনী গৌণ বা আনুষঙ্গিক মাত্র, দেবতা বা অবতারই কাব্যের নায়ক। মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানেরাই বৈচিত্র দান করেন; সব রকমের বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁরা কাব্যরচনা করেন, ধর্মের শাসনমুক্ত নেহায়েত মানব জীবনের চিত্র পরিবেশনের জন্যও মুসলমান কবিরাই দায়ী। মুসলিম কবিদের উৎকৃষ্ট কাহিনী কাব্যগুলো এই সময়েই রচিত। মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' এগুলির অন্যতম।

(জ) শ্রীধর

একখানি অতি প্রাচীন 'বিদ্যা সুন্দরে'র রচয়িতার নাম শ্রীধর। তার উপাধি কবিরাজ। তার দু'খানি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু, তাঁর কাল নির্ণয়ে তেমন কোন অসুবিধা নেই। তাঁর রচনার মধ্যে গৌড়ের সুলতান হোসায়ন শাহের পৌত্র এবং নসরত শাহরে পুত্র ফিরোয শাহের উল্লেখ আছে। পদকার সৈয়দ আফজলও তাঁর কাব্যে এই ফিরোজ শাহ'র উল্লেখ করেছিলেন। ১৫৩২-৩৩ খৃঃ-এ মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি তখ্‌তে বসেন। ফিরোয শাহ্ কোথাও রাজা, কোথাও বা যুবরাজ বলে এ কাব্যে উল্লিখিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ ফিরোয যখন যুবরাজ তখনই শ্রীধর তার কাব্য রচনা শুরু করেন এবং তার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালেই কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হয়। এই যুক্তিতে বলা যায়, ১৫৩৩ খৃঃ-এর মধ্যেই কাব্যখানির রচনা শেষ হয়ে থাকবে।

কবির খণ্ডিত পুঁথি দুটিতে কোনো কোনো ভণিতায় তিনি নিজেকে 'দ্বিজ' বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় হতে পারেন। আর কোনো পরিচয় কাব্যটিতে নেই। তার পুঁথি দুটিই "চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ঃ অতএব অনুমান করা যেতে পারে, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।" —(আশুতোষ ভট্টাচার্য)

www.pathagar.com

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী রচনায় শ্রীধর অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। শ্রীধরের কাব্যে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার, মাতার নাম কলাবতী। সুন্দরের পিতৃরাজ্যের নাম বিজয়নগরী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতার নাম বীর সিংহ, মাতার নাম শীলা দেবী, রাজধানীর নাম কাঞ্চী। শ্রীধরের রচনায় পাণ্ডিত্য আছে, কবিত্ব নেই। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যার রূপ বর্ননা, বিদ্যাসুন্দরের কবিদের মধ্যে একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো অনেক আগে থেকেই। শ্রীধর এই প্রথারই অনুসরণ করেছেন ঃ

'নবীন ঘনের পুঞ্জ যেন কেশভার।
ধরণী বিলোটায় সে লম্বিত অপার॥
বিদ্যার বদনশশী যেন অববাঙ্গা।
খঞ্জন জিনিয়া দুই নয়নের ছন্দা॥
উহার ললাট যেন আধশশী খন্ড।
অধর বান্ধুলি যেন মুখ রসভান্ড॥
দশন মুকুতাপাঁতি বাক্য মধুপান।
ভুরুভঙ্গে কামদেব ধনুর সমান॥
গ্রীবাখন্ড দেখি শংখ জলধি প্রবেশ।
মদনমোহন বিদ্যা যৌবন বিশেষ॥'

(ঝ) সৈয়দ সুলতান

(১৫৫০-১৬৪৮)

সৈয়দ সুলতানের জন্ম ও কর্মস্থান নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। বাঙলার প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম এই কবিকে কেউ কেউ চট্টগ্রামের আবার কেউ কেউ সিলেটের বলে দাবি করেন। কবির 'শব-ই-মেরাজ' নামক গ্রন্থে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাতে কবি লিখেছেন ঃ

"লস্করের পুরখানি আলিম বসতি
মুঞি মূর্খ আছি এক আলিম সন্ততি।"

www.pathagar.com

কেউ কেউ দাবী করেন এই লস্করেরপুর হচ্ছে সিলেট জেলার হবিগঞ্জের লস্করপুর। 'তারিখ-ই-ইসলামে বর্মা ও আরাকান' নামক উর্দু ঐতিহাসিক গ্রন্থে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ছৈয়দ সুলতানকে ক্বাইমের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। ক্বাইম আরাকানের লামেউ নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ডঃ এনামুল হক মনে করেন—এই লস্করেরপুর হচ্ছে লস্কর পরাগল খাঁর পরাগলপুর। পরাগলপুর তখন উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। পীর মুরিদি উপলক্ষে ছৈয়দ সুলতান সাময়িকভাবে পরাগলপুরে বাস করতেন। সেখানে থাকাকালেই তিনি 'শব-ই-মে'রাজ' রচনা করেন। ডঃ হক এবং মরহুম সাহিত্য বিশারদ মনে করেন সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। 'গুলে-বকাওলী'র কাব্যকার মুকিম তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীরজাদা ধাম
সৈয়দ সুলতান বংশ শাহাদুল্লা নাম"

* * * *

"সবে প্রণমিব আমি পূর্ব কবিজান
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।"

মুকিমের এই উক্তিতে ধারনা হয় যে কবি চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। 'মুক্তল হুসেন' (১৬৪৮) নামক কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের সাগরেদ ছিলেন। এ কাব্যের এজিদের উত্তর নামক অংশটি 'মুজফফর' নামক আর এক কবির রচনা। এতে মুজফফর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"ছোলতান দৌহিত্র চক্রশালা ঘর
কহে হীন মুজাফফর এজিদ উত্তর।"

কবি মুকিম ও কবি মুজফফরের এই সব উক্তি থেকে ডঃ হক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সৈয়দ সুলতান পটিয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালারই বাসিন্দা ছিলেন। পীরী মুরীদি উপলক্ষে মাঝে মাঝে তিনি পরাগলপুর অবস্থান করতেন। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক আসদ্দর আলী, অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ও ডঃ মযহারুল ইসলাম প্রমাণ করেছেন—কবির জন্মস্থান সিলেটের তরফ পরগনার লস্করপুর।

www.pathagar.com

কবি সৈয়দ সুলতানের 'শব-ই-মে'রাজ' নামক কাব্যটি ৯৯৪ হিজরীতে রচিত হয় বলে ডঃ শহীদুল্লাহ ও ডঃ হকের ধারণা। এর মানে কাব্যটি রচিত হয় ইংরেজি ১৫৮৬ সালে। কবির সাগরেদ মুহম্মদ খান গুরুর আদেশে 'কিয়ামত নামা' কাব্য রচনা করেন ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে। মুহম্মদ খানের প্রথম কাব্য 'সত্য কলি-বিবাদ সংবাদ'-এর রচনাকাল ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। প্রথম কাব্য রচনাকালে কবির বয়স ৩৫ বছর ধরে ডঃ হক কবি মুহম্মদ খানের জন্ম ১৬০০ খৃঃ বলে অনুমান করেছেন, তখন সৈয়দ সুলতানের বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। অর্থাৎ এই হিসাব অনুসারে সৈয়দ সুলতানের জন্ম ১৫০০ খৃঃ এবং 'কিয়ামত নামা' রচিত হবার আনুমানিক দু'বছর পরে, ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ধরা যেতে পারে। এতো দীর্ঘ পরমায়ু প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারো কারো মতে সৈয়দ সুলতান আরো পরবর্তীকালের কবি হওয়া বিচিত্র নয়। সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থসংখ্যা সম্পর্কে আজো নিশ্চিতরূপে কিছু বলবার উপায় নেই। এখন পর্যন্ত তাঁর নিম্নলিখিত রচনাগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

(১) 'নবী বংশ' (২) 'শব-ই-মে'রাজ' (৩) 'রসুল বিজয়' (৪) 'ওফাত-ই-রসুল' (৫) 'জয়কুম রাজার লড়াই' (৬) 'ইবলিস-নামা' (৭) 'জ্ঞান চৌতিশা' (৮) 'জ্ঞান প্রদীপ' (৯) 'মারফতী গান' (১০) 'পদাবলী'। জনাব আহমদ শরীফের মতে সৈয়দ সুলতানের মোট রচনা হচ্ছে তিনটি (১) নবী বংশ, (২) জ্ঞান প্রদীপ ও (৩) অধ্যাত্ম সঙ্গীত। সৈয়দ সুলতানের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হচ্ছে নবী বংশ। কাব্যটি ১৫৮৪-৮৬ খৃঃ-এ রচিত হয়। বিষয় মাহাত্ম্যে ও পরিকল্পনার বিরাটত্বে এ কাব্যটিকে একটি মহাকাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। হজরত আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম ধারার একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করবেন এ ছিলো কবির পরিকল্পনা।

কিন্তু বার্ধক্য বশত 'ওফাতই-রসুল' রচনা করার পর কবিকে ক্ষান্ত দিতে হয়। কবির সাগরেদ মুহম্মদ খান মুক্তল হোসেন রচনা করে মুর্শিদের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করেন। কবি এ কাব্যে আরবী নবী শব্দের তর্জমা করেছেন সংস্কৃত 'অবতার' শব্দদ্বারা। কবি ইসলামের তৌহীদবাদ বা নিরাকার আল্লাহর নিরংকুশ একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই অবতার শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর নবী বংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবতার বা নবীরূপে চিত্রিত হয়ে, সাম, যজু, ঋক এবং অথর্ব এই চারিটি আসমানী কেতাব লাভ করেছেন—যা বেদ তাই শ্রুতি, তাই আসমানী কেতাব বটে (ডঃ হক)। আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে ধর্ম প্রবর্তক পাঠানো হয়নি ও প্রত্যেক সমাজেই সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে এবং হজরত

www.pathagar.com

মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগে আল্লাহ প্রেরিত যেসব নবী ও পয়গম্বর ধরাধামে এসেছেন তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মমত যে ইসলাম, এ শিক্ষা কোরআনেরই। নতুনত্ব এখানে যে পূর্ববর্তী কেতাবগুলো বিকৃত হয়ে পড়ায় নতুন করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদকে আল কোরআনসহ পাঠানোর দরকার হয়েছে। মনে হয় কবি যেন এই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়েই শ্রুতি ও বেদকে আসমানী কেতাব বলে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। সকল বেদেই যে রসুলের কথা আছে এ সম্বন্ধে কবির উক্তি নিম্নরূপ—

'এই চারিবেদে সাক্ষী দিছে করতার
অবশেষে মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।'

হাল আমলের বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ডঃ আবদুল হক বিদ্যার্থী 'Mohammad in the world Scriptures' নামক একটি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

ইসলামের আদর্শ ও মাহাত্ম্য প্রচারই যে কবির উদ্দেশ্য ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর আফসোস যে—

[illegible]
কবীন্দ্র [illegible] কহিল বিচারি
হিন্দু মুসলমান [illegible] ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা [illegible] না [illegible]

খোদা রসুলের কথা প্রচারই [illegible] নবী বংশ রচনা সম্বন্ধে কবি বলছেন ঃ

[illegible]
এই মত নবী বংশ [illegible] দিয়া
আছিল আরবী [illegible] হিন্দুয়ানী [illegible]
বঙ্গদেশি বুঝে মত [illegible]
নবুঝি আরবি শাস্ত্র [illegible]
হিন্দুয়ানি [illegible]

www.pathagar.com

বোঝা যাচ্ছে কবি কোনো আরবী গ্রন্থাবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেছেন। মূল আরবী থেকে হুবহু অনুবাদ যে এ কাব্য নয়—তার প্রমাণ এতে বহু অমুসলিম উপকথা ও কাহিনীর সমাবেশ। কিন্তু কবির লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই—বাঙলা ভাষায় বাঙালী পাঠকদের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য। জগৎ সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনীতে কাব্যটির সূত্রপাত এবং রসুলের আবির্ভাবে তার সমাপ্তি। নবী বংশের পরিকল্পনা সম্পর্কে কবির নিজের উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"যে রূপে সৃজন হৈল এতিন ভুবন
যে রূপে সৃজন হৈল সুরাসুর গণ
যে রূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল
যে রূপে যতেক পয়গম্বর উপজিল
বংগেত এসব কথা কেহ ন জানিল
নবী বংশ পাঁচালীতে সকলি শুনিল।'

— 'শব-ই-মে'রাজ'

নবী বংশের বিষয়বস্তুতে কল্পনার অবাধ লীলার অবকাশ নেই। তথাপি ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দ সুষমার দিক দিয়ে কাব্যখানি মধ্যযুগের সাহিত্যে এক অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদম হাওয়ার বিচ্ছেদ বর্ণনায় কবি যে ভাষা, উপমা, অলংকার ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

"জ্যৈষ্ঠ মাসেতে ভেল তাপিত [illegible]
কস্তুরী অঙ্গে লাগে হুতাশন
দক্ষিণ সমীর ঘোর শমন [illegible]
অনল হৈয়া নিতি [illegible] ইত্যাদি—

নবী বংশের তৃতীয় পর্ব—আকারে [illegible] মে'রাজ' পর্বটি ১৫৮৫-৮৬ খৃঃ এ রচিত হয়। হজরতের মে'রাজের বর্ণনা [illegible] উদ্দেশ্য, তবে কবি হজরতের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মে'রাজ পর্যন্ত [illegible] অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফলে, কাব্যটি বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে [illegible] দোযখ দর্শন, বিভিন্ন আসমানের [illegible] ফে[illegible] হালের মোলাকাত, হুরী বা বিদ্যাধরীগণের দর্শন [illegible]

www.pathagar.com

নবী বংশের দ্বিতীয় পর্ব ঃ 'রসুলবিজয়' নামক এই সুবৃহৎ কাব্যটিতে হজরতের ইসলাম প্রচার ও যুদ্ধ বিগ্রহাদির মাধ্যমে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারই হচ্ছে কবির উদ্দেশ্য। জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' নামক কাব্যের সঙ্গে এ কাব্য তুলনীয়। দুটি একই জাতীয় কাব্য।

নবী বংশের চতুর্থ পর্ব হচ্ছে—'ওফাত-ই-রসুল'। এই সংক্ষিপ্ত কাব্যটিতে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর রসুলের তিরোভাব এবং 'খোলাফায়ে-রাশেদা'র চার খলিফার আমলের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সৈয়দ সুলতান ইসলাম ধর্মের বিবরণ ও বিজয় বার্তা প্রচারের জন্য তাঁর কবি কর্মের যে পরিকল্পনা করেছিলেন 'নবী বংশ' 'শব-ই-মে'রাজ' ও 'রসুল বিজয়' প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে। 'ওফাত-ই-রসুল' পাঠে জানা যায়, চার আছহাবের কাহিনী, মহররমের ঘটনা এবং কেয়ামত এই তিন বিষয়ে আরো তিনটি বিশদ কাব্য রচনা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিলো, কিন্তু বার্ধক্য বশত কবির সে স্বপ্ন সফল হয়নি। 'ওফাত-ই-রসুল' পর্যন্ত লিখেই কবি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর কবি জীবন শেষ হয়েছে, তাঁর দৃষ্টি ক্ষমতা নিঃশেষিত। তাই কবি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সমাধার জন্য তাঁর প্রিয় সাগরেদ মুহম্মদ খানকে নির্দেশ দান করেন। 'ওফাত-ই-রসুলে' পূর্বের কাব্যগুণ না থাকলেও বিষয় মাহাত্ম্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

'জয়কুম রাজার লড়াই' নামক পূর্বাংশটি জয়কুম নামক কোন বিধর্মী নৃপতির সঙ্গে হজরত মুহম্মদ মোস্তাফা ও হজরত আলীর লড়াই বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব আছে। 'ইবলিস-নামা' নামক ক্ষুদ্র পর্বাংশটি আদ্যন্ত পয়ার ছন্দে রচিত। নবী বংশ রচনা করে কবি নবীর মহিমা প্রচার করেছেন, সত্য, পুণ্য ও মঙ্গলের জয় গান করেছেন। আর ইবলিস-নামা রচনা করে শয়তানের 'অযশ' ঘোষণা করেছেন ঃ

"পয়গাম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুং
পাপমতি ইবলিসের অযশ ঘোষিলুং।"

এছাড়া কাব্যটিতে একটি নীতি কথাও আছে। গুরুর মর্যাদা সকলের উপরে, পীর বা গুরুর আচরণ নিন্দনীয় হলেও তিনি শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র—আর অহঙ্কার হচ্ছে পতনের মূল—ইবলিস-নামায় কবি এ নীতি কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কবির অতি অল্প বয়সের রচনা 'জ্ঞান-চৈতিশা' যোগ কলন্ধর শ্রেণীর রচনা—এ রচনা অতিশয় অপরিণত। 'জ্ঞান-প্রদীপ'ও একই শ্রেণীর গ্রন্থ, তবে এ গ্রন্থ তাঁর পরিণত বয়সের রচনা—এতে সুফীবাদ ও যোগের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে, যে নিজেকে চিনে সেই আল্লাকে চিনে, মুকীদের এই উক্তি 'জ্ঞান প্রদীপে'র ভিত্তি।

www.pathagar.com

এসব ছাড়াও দরবেশ কবি সৈয়দ সুলতান রচিত বহু মারেফতী গান এবং খণ্ড কবিতাও রয়েছে। কিছু কিছু খণ্ড কবিতা রাগমালা বা গান সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। সৈয়দ সুলতান ছিলেন একাধারে কবি, দরবেশ, তত্ত্বজ্ঞানী, সঙ্গীতবিদ এবং ইসলামের সচেতন প্রচারক। কবির কাব্যে হিন্দু উপাদান দেখে সমকালীন গোড়াপন্থীরা তাঁকে মোনাফেক মনে করলেও কবি তাঁর লক্ষ্যে অবিচলিত ছিলেন। এদিক দিয়ে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি নজরুলের সঙ্গে তার মিল লক্ষ্যণীয়।

(এঃ) শেখ পরাণ

শেখ পরাণের দু'খানা ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া গিয়েছে। কবির স্থান ও কাল সম্পর্কে তার নিজ কাব্যে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। কাব্য দুটির একটির নাম 'কায়দানি কেতাব' আরেকটির নাম 'নূরনামা'। কবির কাব্যে তার কাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকলেও তাঁর পুত্রের কাল থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। কবির পুত্রের নাম শেখ মুত্তালিব, তিনিও কবি ছিলেন। শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' নামক কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যের ভণিতা এইরূপ ঃ

"কিফায়তুল মুছল্লিন শুন দিআ মন
বঙ্গ ভাষে কহে শেখ পরাণ নন্দন।"

শেখ পরাণের পুত্র কবিবর শেখ মুত্তালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' রচনা করেন ১০৪৯ হিজরীতে, ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে। কবির কাব্য পাঠে জানা যায় শেখ মুত্তালিব অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতাকে হারান এবং মৌলভী রহমতুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক লালিত পালিত হন। ১৬০০ খৃঃ-এ শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ জীবিত ছিলেন, তা বিনা দ্বিধায় অনুমান করা যেতে পারে।

শেখ মুত্তালিবের উক্তি থেকে জানা যায়, কবির বাসস্থান ছিলো চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড গ্রামে।

"সীতাকুন্ড গ্রাম শেখ পরাণ সুজন
তাহার নন্দনহীন মোত্তালিব জান।"

—'কিফায়াতুল মুসল্লিন'

www.pathagar.com

'কায়দানি কেতাবে' মুসলমানদের নিত্য আচরণীয় ১৩০ ফরজের বর্ণনা আছে। রসুলের চারি কুর্সি, চারি মজহাব এবং সপ্ত ঈমানও আলোচিত হয়েছে। কবির কাব্যে এক জায়গায় পূর্ববর্তী কবি হাজী মুহম্মদ ও তাঁর 'সুরত নামা'র উল্লেখ আছে।

"ছুরতনামার মধ্যে ইমার ছিফত
কহিছন্ত হাজী মোহাম্মদ ভালমত।"

শেখ পরাণ এ কাব্য রচনা করেছিলেন ফারসী কেতাব দেখে। 'নূর নামা' কাব্যটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। বিষয় সৃষ্টি পত্তন; কবির নিজের উক্তি ঃ

"কী উপাএ করিমু নবী কহত আমার
হেতু বুদ্ধি কহ পঞ্চ কর্ম্ম করিবার
আলির এতেক কথা রসুল সুনিয়া
একে একে কহে নবী সমাজে বসিয়া
রসুলে বুলিল আলি সুন তত্ত্ব সার
বিছয়াল কুতুবা পঞ্চ কর্ম করিবার
ছুরত ফাতেহা যদি পড় তিনবার
জেহেন করিলা দান একাদশ নর।"

নুরই-মুহাম্মদীর সৃষ্টি এবং তা থেকে অন্য সকল বিষয়ের সৃষ্টিকথা কবিত্বহীন ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম আমলের কবি ও কাব্য পরিচয় (৩)

সপ্তদশ শতক

(ক) মোহাম্মদ নসরুল্লাহ্ (খাঁ)

এই কবির চারখানা গ্রন্থের খবর পাওয়া গেছে। কাব্যগুলির নাম (১) জংগ নামা (২) মুসার সওয়াল (৩) শরীয়ৎ নামা ও (৪) হিদায়িতুল ইসলাম।

কবি নসরুল্লাহ্ প্রাচীন বাঙালী মুসলিম কবিদের অন্যতম। জংগ-নামা ও শরীয়ৎ নামা উভয় কাব্যেই কবির সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী রয়েছে। শরীয়ৎনামায় লিপিবদ্ধ আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষ হামিদুদ্দীন খান গৌড় দরবারের অমাত্য ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পুত্র বুরহান উদ্দিন রাজরোষে পতিত হন এবং "অষ্ট মিত্র সংগে করে" চট্টগ্রামে আরাকান অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আধুনিক দক্ষিণ চট্টগ্রামের 'বাহার ছড়াহ' নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেন।

'তখন রোসাংগ দেশে কিবা আদ্য কিবা শেষে
অশ্ব আসোয়ার না আছিল'

বুরহান উদ্দীন প্রথমে লস্কর উজীর নিযুক্ত হন। তিনি রোসাংগে সর্বপ্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজে ও তার অধস্তনঃ কয়েক পুরুষ অশ্বারোহী সৈন্যদলে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকেন। কবি নসরুল্লাহ্ ছিলেন নিঃসন্তান, কিন্তু তাঁর পিতৃব্যের বংশধরেরা আজো বাঁশখালি থানার জলদি গ্রামে বাস করছেন। তাঁর কাব্যে সন্দ্বীপ বিজয়ী ফতেহ খানের (১৬০৯ খৃঃএ জীবিত) উল্লেখ আছে, বংশতালিকা দৃষ্টে এবং এই উল্লেখে মনে হয়, কবি ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। ডঃ হকের মতে কবির বাসস্থান ছিলো রামু অঞ্চলে।

www.pathagar.com

'মুসার সওয়াল'-এ কূহ্-ই-তূরে হযরত মুসার সংগে আল্লাহ্‌র কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভাষার নমুনা নিম্নে দেয়া হচ্ছে ঃ

"প্রথমে প্রণাম করি প্রাণের ঈশ্বর
ঘটে প্রাণ রাখি ভক্ষ্য জোগাএ নিরন্তর
আপনা সখার রূপ সৃজি নিজ গায়
চক্ষে নিজ জ্যোতি দি মুখেত দিলা রায়
জিহ্বা দিলা নাড়ি নিতি লৈতে তান নাম
কর্ণ দিলা শুনিবারে তাঁহার কালাম।"

কাব্যখানি ঐ নামীয় কোনো ফারসী কাব্যের তর্জমা।

জংগনামা কাব্যটি কবির প্রথম জীবনের কাব্য বলে মনে হয়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হযরত আলীর বিজয় কাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক যুদ্ধেই বিধর্মী রাজাদের পরাজয় ও তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রদর্শিত হয়েছে। ভাষা কবিত্ব বর্জিত, তাছাড়া বহু অলৌকিক কাহিনীতে পুঁথিটি পরিপূর্ণ। ইসলামে 'আমর ও নেহী' পালনীয় ও বর্জনীয় কী কী তারই বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কবির 'শরীয়ৎ নামায়'। কবির এই পরিণত বয়সের রচনাটিতে একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলিমের চরিত্র ফুটে উঠেছে ঃ

"মুসলমান মুসলমানী কর্ম না করিলে
মুসলমান নহে হেন শাস্ত্র মাঝে বলে
আমর আর নিহী যত আছে শরীয়তে
সার সব কহি আমি শুন রংগ চিতে
আমার হুকুমে যত আমর বোলয়
মানাম্বেরে নিহী বলে আরবী ভাষায়।"

'হিদায়িতুল ইসলাম'ও একই জাতীয় বস্তু। মুসলমানকে অমুসলিম ও শরীয়ৎ বিরোধী আচার অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়াই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। লিপিকরের দোষে কাব্যখানি অনেক স্থলেই অপাঠ্য এবং অবোধ্য। সেকালে মুসলমানদের বিয়েতে পাশা খেলা হতো 'মারোয়া' তৈরি করে সেখানে দুল্‌হা দুল্‌হীনকে গোসল করানো হতো। এসব কাজই এ কাব্যে অনৈসলামিক ও অপকর্ম বলে নিন্দিত হয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) মুহম্মদ খান

ছৈয়দ সুলতানের কাব্যালোচনা প্রসংগে তাঁর সাগরেদ মুহম্মদ খানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নবী বংশের 'ওফাৎই রসুল' পর্যন্ত লিখে ছৈয়দ সুলতান বার্ধক্যবশত লেখার ক্ষান্ত দেন এবং তাঁর শিশ্য মুহম্মদ খানকে কাব্যের বাকী পর্বগুলো লিখতে তাগিদ দেন। কবি মুহম্মদ খান তাঁর 'মুক্তল হোসেন' কাব্যে সুদীর্ঘ আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। তা'ছাড়া 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ও 'মুক্তল হোসেন'-এও কবির কাব্য রচনার তারিখ পাওয়া যায়। 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ও 'মুক্তল হোসেন' ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তাই কবির কাল সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। মুহম্মদ খান সপ্তদশ শতকের কবি এবং তিনি চট্টগ্রামের অধিপতি রাস্তিখানের বংশধর; তাঁর জন্মস্থান খুব সম্ভব হাটহাজারী থানার জোব্‌রা গ্রাম। জোব্‌রা গ্রামে রাস্তি খানের মসজিদে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় রাস্তি খান গৌড়ের সুলতান রকনউদ্দিন ওরফে শাহের (১৪৫৯-৭৬) পদস্থ কর্মচারী বা তাঁর চট্টগ্রাম অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন। কবির আদি পুরুষ হচ্ছেন শাহী আসোয়ার (আনুঃ ১৩৩৯-৪৫ খৃঃ)। তিনি আরবের সিদ্দিক বংশজাত। পীর হাজী খলীলের সংগে তিনিও চট্টগ্রামে আসেন। রাস্তি খান মাহী আসোয়ারের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ এবং মুহম্মদ খান রাস্তি খানের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। সম্ভবত রাস্তি খানের পরাগল খান ছাড়াও মিনাখান নামে আরেক পুত্র ছিলেন, মুহম্মদ খান হয়তো এই মিনা খানেরই বংশধর।

মুহম্মদ খানের প্রথম দুটি কাব্য, 'সত্যকলি বিবাদ বিসংবাদ' ও 'হানিফার লড়াই'- কবির অপরিণত বয়সের রচনা এবং সৈয়দ সুলতানের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। এ দুটি কাব্যের ভণিতায় পীরের কোনো উল্লেখ নেই। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুক্তল হোসেন'। কিয়ামত নামা' মুক্তল হোসেনরই একাদশ পর্ব। 'দজ্জাল নামা' কিয়ামত নামার অংশ; কিন্তু পৃথক গ্রন্থরূপে প্রচারিত। 'কাসেমের লড়াই' মুক্তল হোসেনের অংশ কিন্তু পৃথক গ্রন্থরূপে প্রচারিত। 'আসহাব নামা' মুক্তল হোসেনের অংশ কিন্তু কোন পৃথক গ্রন্থ নয়।

ছৈয়দ সুলতান বার্ধক্যের দরুন নিজের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার ভার প্রতিভাবান শিষ্য মুহম্মদ খানকে দিয়েছিলেন—এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্যঃ

"নবী বংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান

www.pathagar.com

রসুলের ওফাতে রচিয়া ন রহিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি
চারি আছাব্বার কথা কৈলু পদাবলি
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া
প্রলয়ের কথা সব দিনু প্রচারিয়া
অন্তে পুন বিরচিনু প্রভু দরশন
ইহা হন্তে ঠিক কথা নাকি কদাচন
দুই পাঞ্চালিকা যদি একত্র করয়
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধি তবে হয়।"

(কিয়ামত নামা)

শাহা সুলতান পীর কৃপার সাগর
সেবক বৎসল প্রভু গুনে রত্ননকর
তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিআ
মুহম্মদ খানে করে পাঞ্চালী রচিয়া।"

(মুক্তল হোসেন)

'ওফাত-ই-রসুল' এবং 'মুক্তল হোসেন' এ দুটি কাব্য একত্র করলেই কবির মতে পূর্বাপর একটি সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মুক্তল হোসেন' বা হোসেন বধ। নামের মধ্যেই বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। মূলত কারবালার হৃদয়-বিদারক কাহিনী বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য কিন্তু কার্যতঃ এতে রসুলের চারি আস্‌হাব থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কবির সুদীর্ঘ আত্মপরিচয় আছে। গ্রন্থটির পর্ববিন্যাস সম্পর্কে লেখকের নিজের পরিকল্পনা নিম্নরূপ ঃ

"আদি পর্বে ফাতিমার বিবাহ কহিব
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব
কহিব দুত্তিঅ পর্বে শুন দিআ মন
চারি আছাব্বার কথা শাস্ত্রের নিধান।

www.pathagar.com

কহিব তৃতীয় পর্বে হাছনের বাণী
জনবকে বিবাহ করলি মনে গুণি
চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন
কহিব পঞ্চম পর্বে জুদ্ধ অবসেস
ষষ্টমে হোচন পর্ব কহিব সে পাছে
সপ্তমেত স্ত্রীপট কহিবাম পুনি
অষ্টমেত দূত পর্ব শুন দিয়া মন
নবমে অলিদ পর্ব শুন গুণিগণ
দশমে এজিদ পট কহিবাম আগে
একাদশ পর্ব তবে পশ্চাতে কহিব
প্রলয় হইতে যেন আনন্দ হইব।"

(মুক্তল হোসেন)

'মুক্তল হোসেন' কাব্যটির রচনার তারিখ গ্রন্থ মধ্যেই আছে। এ কাব্যটি ১৬৪৫ খৃঃ রচিত 'জংগনামা' নামে এই পুঁথিটিই বটতলায় ছাপা হয়ে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনে একটা শোকাবহ করুণ রস বিস্তার করে রেখেছে। কাব্যটি আকারে বৃহৎ এবং মুহম্মদ খানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাও বটে। এই বই গ্রামাঞ্চলে আজো ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে অপরিচিত সাধারণ শ্রোতা ও পাঠক সমাজ মুসলিম জাতীয় জীবনের একটা অতিশয় শোকাবহ বিয়োগান্ত কাহিনীর সঙ্গে এই পুঁথির মাধ্যমে আজো যোগাযোগ রক্ষা করছে।

বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক হলেও কবি ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেননি, কল্পিত ঘটনা ও দৃশ্যের আমদানী করে কাহিনীতে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দান করেছেন। করুণ রসের এমন কাব্য পুঁথি সাহিত্যে আর নেই। মেঘনাদ কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দুঃখ করেছিলেন—কারণ মহররমের মতো কোনো কাহিনী হিন্দুদের নেই, মধুসূদনের মতে মহররমের ঘটনাটি একটি প্রকৃত মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্তু। একে অবলম্বন করে যদি একটা সত্যিকার মহাকাব্য রচিত হয় তা সমগ্র জাতির চিত্তকে আলোড়িত করতে পারে অনায়াসেই। মাইকেলের জন্মের কয়েক শো বছর আগে সেই মহাকাব্যই রচনা করেছিলেন মুহম্মদ খান এবং কাব্যের নামটাও লক্ষণীয়—মকতুল হোসেন, হোসেন বধ।

www.pathagar.com

একাদশ পর্বে বিভক্ত এই বিরাট কাব্যটি পরিকল্পনার দিক দিয়ে মহাভারতের অনুরূপ হলেও বিষয়বস্তু, চরিত্র, ঐতিহাসিকতা, আবেগ, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে ইহা একটা পুরোপুরি মুসলমানী কাব্য। কবির কালে হিন্দু রচিত কাব্য, বিশেষ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারত মুসলমানেরাও পড়তো, তা ছৈয়দ সুলতানের 'শব-ই-মেরাজের' সূচনাতেই জানা যায়। অথচ 'খোদা রাসুলের কথা কেহ নসোহরে।' মুসলমানদের কেচ্ছা কাহিনী ও ধর্মকথা আরবী ফারসীতে রচিত তা 'আলিমানে বুঝে নবুঝে মূর্খসূত।' বাঙলাদেশে, বাঙালী মুসলমান এই অজ্ঞতার দরুন 'পরস্তাব পাইয়া সব ভূলিয়া রহিল।' নিজের ধর্মের কথা কিছুই জানেনা; এ জন্য ছৈয়দ সুলতান সেকালে মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলম ধরেছিলেন এবং তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খানকেও অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সচেতন ঐতিহ্য সৃষ্টি প্রয়াস আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'মকতুল হোসেন' রচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ খান তাঁর মুর্শিদের মতো বলেছেন ঃ

"হিন্দুস্থানে লোক সবে নবুলে কিতাব
নবুলি নশুনি নিতি করে মহাপাপ
তে কাজে সংক্ষেপ করি পাঞ্চালী রচিলুং
ভাল মন্দ পাপ পূন্য কিছু নজানিলুং"

'মকতুল হোসেন' থেকে কবির ভাষার কিছুটা নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কবি বলেছেন ঃ

"নব জ্যোতি দেখি চাঁদ হই গেল খিন
সুগন্ধি মাজা দেখি সিংহ বনে প্রবেশিল
খিন মাজা দেখি গজ গুহাতে নামিল।"

কাজির নন্দন 'মোহাম্মদ ও 'ইবরাহীমকে কতল করার পর ঃ

দুই শির কাটি পাপী শরীর দোহার
খেপিলেক ফোরাতের কূলের মাঝার
আব্দুল্লাএ বোলে বাসুন কি ঢাকি আনিছ
হারিছে বোলেন্ত তুমি যে আজ্ঞা করিছ।
পাখালি সুবর্ণের থালে শির থুইল
রূপ দেখি আব্দুল্লা মোহশ্চিত হইল।

www.pathagar.com

মুহম্মদ খানের 'আসহাবনামার' কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। আসলে 'আসহাবনামা' কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, 'মুক্তল হোসেনের'ই দ্বিতীয় পর্বমাত্র।

কহিব দুতিআ পর্বে সুন দিয়া মন
চারি আছাব্বার কথা শাস্ত্রের নিধান।

(মুক্তল হোসেন)

'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'কে ডঃ এনামুল হক মকতুল হোসেনের অংশ মনে করেন না। তাঁর মতে এটি একটি স্বতন্ত্র কাব্য। কিন্তু সাহিত্য বিশারদের মতে এটিও মকতুল হোসেনরই একটি অংশ। 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'-এর একটি পাণ্ডুলিপির (ক্রমিক নং পুঁথি ৩৬৭-৬১৯ পুঁথি পরিচিতি) সমাপ্তিতে কবি বলেছেন ঃ

মকতুল হোসেন কথা অমৃতের ধার
যে পড়ে, যে শুনে হএ পাপ তু উদ্ধার।

(হানিফার লড়াই)

কাজেই হানিফার লড়াইও মকতুল হোসেনের একটি অংশ, এ মত অধিকতরো প্রামাণ্য বলে মনে হয়। পুস্তকের বিষয়বস্তু নূতনত্ব বর্জিত। হানিফা রোকাম শহরে গিয়ে কয়রা পরীকে বিয়ে করেন। এ গ্রন্থে সাবিরিদ খানের 'হানিফা ও কয়রা পরী'র প্রভাব স্পষ্ট।

'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ' মুহম্মদ খান রচিত প্রথম কাব্য। কবির অপরিণত বয়সের এই রচনাটি মৌলিকতার দিক দিয়ে মধ্য যুগের কাব্যে অতুলনীয়। 'নল দময়ন্তী' 'বিদ্যাসুন্দর' 'গোরক্ষ বিজয়' 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যে কাহিনী ভাগই প্রধান, রূপক পরোক্ষ। কিন্তু এ কাব্যে কবির লক্ষ্য ও বক্তব্য সুস্পষ্ট, কবি বলেন ঃ

"উপদেশ পঞ্চালিকা কবির রচন
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ।"

কাব্যটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। একটি সরল কাহিনীর মাধ্যমে, সত্য ও কলির রূপকে সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায় ও পাপ পূণ্যের দ্বন্দ্ব সংঘটিত ও পরিণাম দেখানো হয়েছে। সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়, বা পূণ্যের বিস্তার এবং পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির এ রূপক কাব্যটির তাৎপর্য—তবু কাব্যটি যাতে নেহাত তত্ত্বকথা হয়ে না ওঠে সে জন্য

www.pathagar.com

কবি সজাগ। এ জন্য মূল কাহিনী ছাড়াও বেতাল পঞ্চ বিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী উপাখ্যান নামক একটি কাহিনী এবং সূর্য-বীর্য-চন্দ্ররেখা নামক রূপকথা ও কিম্বিক রাজার আখ্যানের অবতারণা করেছেন এবং চরিত্রগুলিকে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ করে তুলেছেন, যদিও তারা প্রত্যেকেই এক একটি গুণের বা দোষের প্রতীক। সত্য পরিণামে জয়ী হলেও সত্যের পথ যে দুর্গম এ কথা কবি সব সময় স্মরণ রেখেছেন।

কাব্যের পাত্রপাত্রীর নামগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ এবং রূপকাত্মক—যেমন কলীন্দ্র, দুঃশীলা, পাপ সেন, ভীত সেন, কপটকেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুজাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের পতাকা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। "সূর্য অগ্নিময়, সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমণীয়, পাপ আপাতমধুর (আঃ শরীফ)।"

মুক্তল হোসেনের মতো সত্যকলি উচ্চ কবিত্ব গুণমণ্ডিত না হলেও মধ্যযুগের কাব্যে এ কাব্যের একটা বিশেষ মূল্য ও স্থান আছে। সত্যকলির দ্বন্দ্ব আসলে সত্য ও মিথ্যার, পাপ ও পূণ্যের চিরন্তন প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বেরই প্রতীক এবং এ হিসাবে কাব্যটির আবেদন বিশেষ কোনো যুগে সীমাবদ্ধ নয়।

শেখ মুত্তালিব

চট্টগ্রামের অন্যতম কবি শেখ পরাণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ মুত্তালিবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি শেখ পরাণের পুত্রের নামই শেখ মুত্তালিব। কবির কাব্য 'কিফায়াতুল মুসল্লীন'-এ কবি নিজেই তাঁর পিতৃ পরিচয় দিয়েছেন ঃ

"কিফায়তুল মুসল্লীন শুন দিয়া মন
বঙ্গ ভাসে (ভাষে) কহে শেখ পরাণ নন্দন"

কিংবা

"ওয়াজীব কথা কহি শুন জেই হএ
হীন মুত্তালিব শেখ পরাণ তনএ।"

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কবির এই কাব্যখানি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। বাঙলা এবং আরবী উভয় হরফেই এ পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। রোজা, নামাজ, হজ্ব, জাকাত প্রভৃতি মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ইসলামী হুকুম-আহকামের বিবরণই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যটির দুটি পাণ্ডুলিপিতে যে দুটি সাংকেতিক তারিখ পাওয়া গেছে তা হিসাব করে প্রমাণিত হয়েছে এবং রচনাকাল ১০৪৮ হিজরী বা খৃষ্টীয় ১৬৩৮-৩৯ সন। কবির কাব্য থেকে জানা যায়, কবি শেখ মুতালিব অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে মৌলবী রহমতুল্লাহ নামক একজন জ্ঞানী, দয়াবান ও ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক লালিত পালিত হন এবং পরে তাঁর আদেশেই মুসলমানদের এই অতি প্রয়োজনীয় কাব্যটি রচনা করেন। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ

"মূলবি রহমতুল্যা তপে দানে হাবিব আল্লা
চতুর্দশ এলেম অবধান
হাজি হোরমাইন ততি আর করি কেরামতি
ততোধিক হাফেজ কোরআন।"

হাজি হোরমায়েনের পুত্র. দাতা ও মহাজ্ঞানী রহমতুল্লাহ কবিকে বললেন ঃ

"মোহর বচন ধর দলীল বাঙ্গালা কর
শঙ্কা না করহ কদাচন।" কারণ
"আরবীর ভাষে তাকে নবুজএ সর্বলোকে
বুঝিবেক হইলে পত্র আর।"

এই আরবী অনভিজ্ঞ মুসলিম পাঠকের জন্য কবি তাঁর কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন ঃ

তাহান আদেশ পাই কৈলুম অঙ্গীকার
মোছলমানি শাস্ত্র কথা কহিতে পয়ার
মহাশয়ে মুলবির বচন ধরিআ
চলিলুম বিকট পন্ধে আল্লাকে স্মরিআ
মুলুবি কিতাব চাহি কহন্ত মহত
পয়ার করিতে লাগিলুম রোসাইত।

www.pathagar.com

রহমতুল্লাহ আরবী থেকে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে মুখে মুখে ইসলামের হুকুম-আহকাম বলতেন আর কবি শেখ মুতালিব তাকে বাঙলা কাব্যে রূপ দিতেন। কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে কবির নিজের উক্তি ঃ

"সীতাকুণ্ড গ্রামে সেখ পরাণ সুজন
তাহার নন্দন হীন মোতালিব জান।"

এই উক্তির ফলে কবির জন্ম ও বাসস্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডেই কবি শেখ পরাণ ও তাঁর পুত্র শেখ মুতালিবের বাসস্থান ছিল। কবির পরিণত বয়সের রচনা 'কিফায়তুল মুসল্লীন'-এর রচনার কাল থেকে অনুমান করা যায়, কবি ষোড়শ শতকের সমাপ্তির দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কবি বাঙলা ভাষায় এই কাব্যখানা রচনা করেন। বিশেষ করে ইবাদত বন্দেগীর সাথে যেসব অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন রয়েছে সে সব তখন পর্যন্ত আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমানদের পক্ষে নিষ্ঠার সঙ্গে তা অনুসরণ করার সুযোগ ছিলো অতি অল্প। কবি এ কাব্য রচনা করে সে অসুবিধা দূর করতে চেয়েছিলেন।

এ শ্রেণীর কাব্যে কল্পনার বিস্তারের সুযোগ নেই। তখনকার দিনে ধর্ম দর্শন, ইতিহাস, কিস্‌সা-কাহিনীমূলক সব কিছুই পদ্যে লিখিত হতো। বর্তমান ক্ষেত্রেও ফিকাহ্ শাস্ত্রের কতকগুলি বিষয়কে ছন্দোবদ্ধ রূপ দেয়া হয়েছে। তবু কবি শক্তিশালী, তাই তাঁর ভাষা বহু ক্ষেত্রেই কাব্যগুণ মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যেমন এক আল্লাহ্ সম্পর্কে কবির উক্তি ঃ

"অনন্ত অলেখা রূপ জুড়ি ত্রিভুবন
অলখা লখনরূপ আলক আপন
এক হস্তে আলক যতেক সৃজিয়াছে
তাহান ছিফত যত কিতাবে কহিছে
ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত গুণ এক আল্লাহ্ সার
যুক্তির দোসর তান কেউ নাহি আর।"

www.pathagar.com

কবির ভাষায় রিজিকের তারতম্য সম্পর্কে ইসলামের নীতি ঃ

"যার যেই মত ভক্ষ্য দিছে বরাবর
বেশ কম নাহি তাতে মুমিন কাফর
কিন্তু মাত্র বাড়া টুটা রিজিক করিছে
সকলের রিজিক সমান নাহি দিছে।"

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষায় আরবী শব্দের দেদার ব্যবহারের নমুনা ঃ

'সপ্তদশ হযজত(তে) এক জবেত(ক) কুরবান
ফিতারা, শোকরানা তিন ছবর করণ
তওবা শোকর জান তকবির শরীফ
তিন বিংশ আর নব সকল নিরিখ।"

'কায়দানী কিতাব' নামে আরেকখানি কাব্যও কবি মুতালিব রহমতুল্লাহর নিকট শুনে শুনে রচনা করেছিলেন।

(গ) নওয়াজিশ খাঁ

সতেরো শতকে চট্টগ্রামে যেসব কবির আবির্ভাব হয় নওয়াজিশ খাঁ তাঁদের একজন। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার সুখছড়ি গ্রামে কবির নিবাস ছিলো। এখনো কবির বংশধরেরা ঐ গ্রামেই বসবাস করছেন। তাঁরই বংশধর আতাউল্লা পণ্ডিতের কাছে রক্ষিত বংশতালিকা দৃষ্টে জানা যায় কবি হাজার মঘী সনে অর্থাৎ ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি ১৭৬৫ খৃ-এ দেহত্যাগ করেন। এই দীর্ঘজীবী কবি আলাওলের সমসাময়িক হলেও আলাওলের তিরোধানের পরেও বেঁচে ছিলেন।

বিখ্যাত পারস্য উপাখ্যান অবলম্বনে কবি নওয়াজিশ খাঁ গুল-ই-বকাউলি কাব্যটি রচনা করেন। বাণীগ্রামের জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের অনুরোধে পুস্তকখানি রচিত হয়। পুঁথিটিতে কবির একটা সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী দেওয়া হয়েছে, সে বিবরণ শুধু নিজের আত্মপরিচয় নয়, তখনকার দিনের সাতকানিয়া ও বাঁশখালী থানার গ্রামগুলি কল্পনা গুণে হয়ে উঠেছে এক একটা শহর এবং জমিদারেরা হয়ে উঠেছেন এক একজন নৃপতি।

www.pathagar.com

'ছিলিমপুর' গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা গৌড় থেকে আগত ছিলিম খাঁ মড়ল হচ্ছেন কবির পূর্ব পুরুষ।

কবির ভাষায় ঃ

"প্রপিতামোহোর পিতা গৌড় হন্তে আসি
গোত্র সনে চাটিগ্রামে করিল নিবাসি।"

*　　*　　*

ছিলিম মড়ল নামে সবে পাএ চিন
তানসূত শরীফ মড়ল গুণধর।।
শরীফ মল্লের গৃহে হৈল পঞ্চসূত
একে একে বলবন্ত অতি অদ্ভুত।
বিরহিম নামে হীরাগাজি গজমত
গাড়ুর ঠাকুর আর নামে মহাবত
বিরহিম ঔরসে বিনানু (গাজীমল্লের কন্যা) স্থিতি
মোহাম্মদ এয়ার নাম হইল সন্ততি
তাহান প্রথম সূত নামে দৌলত
শাস্ত্র শিক্ষা পিতা হন্তে লৈল খেলাফত
তাহান কনিষ্ঠ মুই নওয়াজিশ নাম
অল্প শাস্ত্র, অল্প বুদ্ধি, অল্প যত কাম

*　　*　　*

মোহের কনিষ্ঠ ভাই, ছিলো বলবন্ত
আব্দুল মজিদ নামে হাফিজ মোহোন্ত।

এই বিবরণ থেকে কবির বংশতালিকাটি এরূপ দাঁড়ায় ঃ

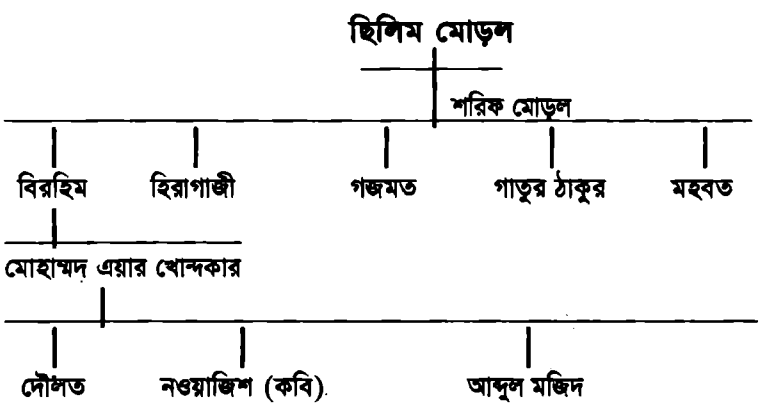

www.pathagar.com

গুল-ই-বকাউলী একটি কাহিনী কাব্য। একে রূপকথা হিসেবে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত। শর্কীস্তানের রাজার এক পুত্র সন্তান জন্মেছে। একই সংগে রাজার কি সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য! পুত্রকে দেখার পরই রাজা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। পুত্রের নাম তাজুল মুলুক। রাজার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবার একটি মাত্র উপায়ই আছে। পরী রাজা বকাউলির ফুল-বাগিচায় যে ফুল নিত্য ফোটে সেখান থেকে ফুল চুরি করে এনে রাজার চোখে ব্যবহার করলেই তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। পিতৃভক্ত তাজুল মুলুক সকল রকম বিপদ উপেক্ষা করে পরী রাজ্যে যাত্রা করে। সে ফুল সংগ্রহ করলো, উপরন্তু ঘুমন্ত বকাউলির সাথে চুপি চুপি আপন হার এবং আংটিও বদল করলো এবং দেশে ফিরে এলো। বকাউলি দিওয়ানা হলো তাজুল মুলুকের জন্য। বহু অনুসন্ধানের পর সে তার সাক্ষাৎ পেলো। তারপর দুজনের বিয়ে হলো।

কবি নওয়াজিশ খুব উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন না, তবু তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে রচনার লালিত্য উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি গতানুগতিক রীতির অনুসারী ঃ

"সে কন্যার রূপের সাগর পরিমাণ
অল্পমতি এক মুখে কি কহি বাখান।
শির স্বর্গ, মর্ত্য নাভি, পদ সে পাতাল
ত্রিভুবনে কন্যা রূপে মোহে সর্বকাল।।
*　　*　　*　　*
শিরের উপরের কেশ অতি শ্যাম ভার
জলধে রেবি লাজেএ গর্জিয়া অপার
অলি পিক চামরিকা গেল বনে বনে
মহীতলে বাসা কৈল বাসুকী আপনে!
সৌরভ যা হএ সম আবির কস্তুরী
অরণ্যে প্রবেশ কৈল মনে কৃপা করি।।
শিষেতে সিন্দুর যেন প্রভাতের সূর,
উদিত অরণ্য আরে (আড়ে) দেখিতে প্রচুর।।
ভুরু জুগ হেরি কামের কোদণ্ড গেল দূর
কুশল্যা নন্দন ধন বাল ইন্দ্রপুর।।
অক্ষিযুগ হেরি পদ্ম লাজে গেল জলে
খঞ্জন গঞ্জন করে সুচালনি পেলে। ইত্যাদি।"

www.pathagar.com

কবির আর দু'খানি গ্রন্থের নাম 'পাঠান প্রশংসা' এবং 'জোরওয়ার সিং কীর্তি।' পাঠান প্রশংসার মাত্র দুটি পাতা পাওয়া গেছে, এতে চট্টগ্রামের দোহাজারীর পাঠান বংশের কোনো পাঠানের কীর্তি প্রশংসিত হয়েছে। আধুখাঁর বংশ নামে এই বংশ আজো সুপরিচিত। মরহুম ফজর আলী খাঁর পূর্ব পুরুষ হচ্ছেন এ পাঠান সর্দার। কাব্যের তুলনায় রাজ্যপাট ও ধনদৌলত যে অতি তুচ্ছ কবি তা এই কাব্যে চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অমরতা কাব্যেই, ধনে জনে রাজ্যে নয়, এই হচ্ছে কবির বক্তব্য।

"মহাজনে নাম হেতু করে প্রাণ পণ
কি করিব রাজ্যপাট কি করিব ধন॥
সংসার পূর্ণিত যার সুনাম কীরিতি
ধন্য নরদেব কূলে ঈশ্বর পীরিতি॥
সুজনে করিব নিত্য পর উপকার
না রহিব ধনজন অনিত্য সংসার॥
না রহে ভাণ্ডার ধন রত্ন লক্ষাবধি
কবির কবিত্ব রহে প্রলয় অবধি॥
কবি গণে রচি যদি কহে মিথ্যা কথা
সর্বলোকে সত্য হেন জানএ সর্বতা॥
এই লাগি মোহাজনে কবি সন্তোষএ
কবি হোন্তে আপনা প্রশংসা নাম রহে॥
কে জানিত বহরম গোর কোথা রহে
সপ্তনারী, সপ্তকার সু-প্রসঙ্গে কহে॥
আর কত সুপ্রসঙ্গ বহুলে রচিল
প্রলএ অবধি সব পুস্তকে রহিল॥
লক্ষাবধি নরপতি হইছে সংসারে
প্রশংসা রচনা বিনু করি আছে কারে॥'

'জোরওয়ার সিং কীর্তি'তে চট্টগ্রামের পটীয়া থানার শঙ্খ নদীর তীরস্থ দোহাজারীর হাজারী বংশের কীর্তি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হাজারী মনসবদার লছমন সিংহের (১৬৬৬) পুত্রের নামই জোরওয়ার সিংহ।

এছাড়াও নওয়াজিশ খাঁ 'বায়ানাত বা ধাব' 'উপক্ষি বা বয়ান' নামক একখানি কাব্য এবং বৈষ্ণব কবিতার ঢঙে বহুগীতি কবিতাও রচনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

(ঘ) কমর আলী (পণ্ডিত)

কমর আলীর জন্মস্থান হচ্ছে চট্টগ্রামের 'করলডেংগা'। এই গ্রামটি খিতাবচর ও সতর পটুয়ার পাশেই অবস্থিত। করলডেংগায় কবির বংশধরেরা এখনো বসবাস করছেন। তাঁরা কমর আলী পণ্ডিতের নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কমর আলী পণ্ডিতের বাড়ীর নামে তাঁর বাড়ীর পরিচয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংগীতের ওস্তাদ ছিলেন। শূদ্র শ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষ করে হাড়ি সম্প্রদায় তাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা করতো। সংগীত রচনায় তিনি যেমন ওস্তাদ ছিলেন তেমনি তর্জমায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

কমর আলী ফারসী ভাষা থেকে একটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং ঐ গ্রন্থের নাম করেন 'সরসালের' নীতি, ইহা ছয় রিসালা কিনা কে জানে। মুনাইর মুনশি নামক কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির আদেশে তিনি ফারসী ভাষা থেকে বইখানি তর্জমা করেন।

"এই যে নোচকা জান ফারছি আছিল
সবে বুঝিবারে হীনে পাঞ্চালী রচিল॥
নোচকা বলয়ে যারে ফারছি ভাষায়
তার্তিব কিতাব বলি বঙ্গভাষে কহে॥"

এটি একটি উপদেশমূলক পুস্তক। মুসলমানেরা দৈনন্দিন জীবনে কি কি নিয়ম মেনে চলবে তাই এই কাব্যের বক্তব্য। গ্রন্থরচনার তারিখ হচ্ছে ১০৮৬ হিজরী বা ১৬৭৫ খৃঃ অঃ।

রাধার সংবাদ ঃ 'ঋতুর বার মাস' একটি ক্ষুদ্র কাব্য। বারো মাস ছয় ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহ-বিধুরা রাধিকার যে সুগভীর বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাতে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতার স্পর্শ বর্তমান ঃ

'কৈয় কৈয় প্রাণরীত রাধার সাক্ষাৎ
নিমায়া নিঠুর হে আগো প্রাণনাথ॥
বারমাসে ছয় ঋতু জানিএ নিশ্চয়
এক রাগ ঋতু দুই মাস পাই আছএ॥
পউষ মাসেতে ঋতু পড়এ শিশির
কিষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হৈল চৌচির
হেমন্তের ঋতু বহে দীর্ঘল রজনী
কিষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী।।

www.pathagar.com

কমর আলীর কিছু কিছু খণ্ড কবিতা ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ছাপা হয়েছে। গীতিকবি হিসেবে কমর আলীর কৃতিত্ব সংশয়াতীত। বিরহের বর্ণনায় কবির রচনা আন্তরিকতার স্পর্শে মধুর হয়ে ওঠে—যেমনঃ

প্রাণনাথ ব্রজে না আইল
এইরূপ যৌবন বইল। ধুয়া
এই ভরা যৌবন কালে শ্যাম ব্রজে নাই
বিরহিনী একাকিনী কাঁদিয়া গোমাই॥
শ্যামের লাগি ভাবি ভাবি
সদাই তনু শেষ হৈল
শতদল কমল মোর হৈল বিকাশ
হেনহি সময়ের হরি নাহি মোর পাশ।
সোনার মন্দির শূন্য, আমার বৃথা জন্ম গেল।
যত ব্রজবাসী নারী পতি করি সংগ
যার যেই মনোবাঞ্ছা পুরে মনোরংগ।
মোর পিয়া নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রইল।

(ঙ) আব্দুল নবী

কবি আব্দুল নবীর একটি মাত্র কাব্যই পাওয়া গেছে—কাব্যটির নাম 'আমির হামজা'। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর চাচা আমীর হামজার খ্যাতি জগত বিদিত। বীরের বীরত্ব কাহিনী চিরকালই কবি কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে এবং তারি ফলে সৃষ্টি হয়েছে জগতের প্রত্যেকটি মহাকাব্য। আমীর হামজার কীর্তিকলাপ নিয়েও এমনি কাব্য ফারসী এবং বাঙলা ভাষায় রচিত হয়। কবি আব্দুল নবীর 'আমির হামজা' মৌলিক কাব্য নয়, ফারসী কাব্যের তর্জমা। এদেশের লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসী জানতো না বলেই কবিকে বাঙালী পাঠকদের জন্য এই মহাবীরের বীরত্ব কথাকে ফারসী ভাষা থেকে বাঙলায় তর্জমা করতে হয়।

তাই কবি বলেছেন ঃ

"আমীর হামজা জিন্না ফারসী কিতাব
ন বুঝিয়া লোকের মনেত পাই তাব (তাপ)।

www.pathagar.com

বংগেতে ফারসী ন জানএ সব লোকে।
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অংগীকার
মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙালী ভাষে কোপে কি গোঁসাই॥
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ
দরবারে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ।"

'আমির হামজা' মোট আশী পর্বে বিভক্ত বিরাট এক মহাকাব্য। কাব্যের এই বিরাট কলেবর নিঃসন্দেহে কাব্যটিকে এক অনন্যসাধারণ মহিমা দান করেছে। কবি নিজেই বলেছেন এতোবড় কাব্য আর কেউ লিখবে তা দূরের কথা, পড়তেই ভয় পাবে। "থাকুক লেখক কেহ পড়িতে লাগে ডর।" কাব্যটি ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ খৃঃ-এ রচিত হয়। কবির পিতার নাম মোহাম্মদ শরীফ।

"মোহাম্মদ শরীফসূত মুঞি হীন মানি
হীন আব্দুল নবী কহে এসব বাখানি।"

কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের 'ছিলিমপুর'।

"চাটিগ্রাম রাজ্য মাঝে ছিলপুর (ছিলিমপুর) স্থান
স্বর্গ অবতরি সব সুচারু-নির্মাণ॥
পূর্বে কর্ণেতিস গিরি পশ্চিমে সাগর
মৈদ্ধে যেন গড় যেন মক্কা সমসর॥
সেই স্থানে আছে মোর খুদ্র এ উআরি
বিরচিত পঞ্চালিকা তথ্য ধর্ম স্মরি॥

কবি আব্দুল নবী ছিলিমপুর গ্রামে সিদ্দিকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মুকীম আত্মবিবরণীতে পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের কবিদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে আব্দুল নবীরও নাম উল্লেখ করেছেন। এতে কবির প্রাচীনত্বেরই শুধু প্রমাণ মেলে না, কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠারও স্বীকৃতি মেলে। তিনি শক্তিমান এবং জনপ্রিয় কবি ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

মুহম্মদ নকী (১৬৭৫-১৭৬৫)

মুহম্মদ নকী কবিবর নওয়াজিশ খানের শিষ্য ছিলেন। কবির একটি মাত্র গ্রন্থ 'তুতি নামা'র দুটি লিপি পাওয়া গেছে। 'তুতি নামা'য় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"প্রণাম কমর এবে গুরুর চরণে
বিজ্ঞ নওয়াজিশ নাম প্রচার ভুবনে।।
প্রভু দিয়াছিল তাঁর কাব্য রত্নভাণ্ড
তেকারণে কবি শক্তি আছিল অখণ্ড।।
জ্ঞান বলে রচিলা পুস্তক বকাঅলি
কহিছন্ত নানা ভাষে মনেত আকলি।।

কবি ওয়াজিশের কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর বংশধরদের দ্বারা রক্ষিত বংশ তালিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে আমরা দেখেছি কবি ১৬৩৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭ বছর বয়সে ১৭৬৫ খৃঃ-এ দেহত্যাগ করেন। মোহাম্মদ নকী তাঁর শিষ্য, তাই সমসাময়িক। তাই, নকী ১৬৭৫ হতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন"—এ অনুমান করা চলে। খুব সম্ভব কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ায় 'জয়রাম নরপতির' প্রপৌত্র শম্ভুরাম।

রাজ রাজচক্রবর্তী ছিল শত্রুকুল বিনাশিল
দর্পে যেন শত্রু সমসর।
নিজ করে অস্ত্র ধরি হস্তি, গণ্ডা, ব্যাঘ্র মারি
বৈসাইল 'চরম্বানগর'।

এই 'চরম্বার' স্থাপয়িতা শম্ভুরামের পুত্র ত্রাহিরামের আদেশে কবি ফারসী 'তুতিনামা' কাব্য বাঙলায় তর্জমা করেন—ফারসী "তুতিনামা ত্রাহিরাম রোজ শুনতেন এবং উপভোগ করতেন। একদিন রসজ্ঞ ত্রাহিরাম

"বলিলা না বুঝে সবে ফারসী কিতাব
দেসি ভাসে রচি কহ এই পরস্তাব।।"

কাব্যটি উপদেশমূলক। কবি খুব উচ্চ কবিত্ব শক্তির অধিকারী নন; তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীর ঋজুতা পাঠককে চমৎকৃত করে—যেমন ঃ

www.pathagar.com

"সর্বভূতে স্ব ইচ্ছাতে যে কৈল সৃজন
সপুটে প্রমাণ করোঁ সেই নিরাঞ্জন।
সর্ব সৃষ্টি কর্তা হর্তা সেই সে ঈশ্বর
সন্তোসে সকল জীব নাহিক দোসর।।
হেন ধনী হেন দানী কোথা আছে আর
নিতি প্রতিদান করে না টুটে ভাণ্ডর।
সকলের শরীরেত দিয়াছ স্বভাব
ক্রোধ মূলে সর্বনাশ, ক্ষেমা মূলে লাভ।।
আর এক অপূর্ব দেখহ সর্বজনে
নৈরাশ্যের স্থানে আশা রাখে জীবগণে।।"

এরপর কবি আল্লাহর হাবিব হযরত মুহাম্মদ (দঃ--এর স্তুতি করছেন ঃ

"তোর (আল্লাহর) স্তুতি করি ওর না পাইলুঁ যবে
কৃপাকর তুআ মিত্র স্তুতি করোঁ এবে
যার প্রেম ভাবে প্রভু সৃজিলা জগৎ
সর্বশাস্ত্রে লিখে নাম নূর মোহাম্মদ।"

'যুবরাজ' 'শাহা সূত' ঘরে নেই। তাঁর অবর্তমানে তরুণী স্ত্রী কোনো এক 'নৃপসূতে'র জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে তুতির নিকট গিয়ে জানায় তাঁর মনোবাঞ্ছার কথা। তুতি অমন চমৎকার এক কাহিনী জুড়ে দিলো যে

"রসবাক্য শ্রুতিগত রাত্রি পোসাইল
নৃপ সূত্র দর্শিবারে কুমারী নারিল
কিন্তু 'কুমারী তাতে ক্ষান্ত হওয়ার নয়'—সে
আর নিশি বলে আসি অএ পক্ষীবর
আজ্ঞা দেখ দর্শি গিয়া নৃপতি কুঞ্জর—

কিন্তু তুতি বড় চালাক—

পুনিহ লাগিল তুতি প্রসংগ কহিতে
নিশি অবশেষ ভেল শুনিতে শুনিতে

www.pathagar.com

এমনি করে তিনশো ষাট দিন অতিবাহিত হলো—

দিনেক প্রসংগ তুতি শুনাএ নবীন
বুদ্ধি বলে কুমারীকে ভ্রমাই রাখিলা
অবশেষে যুবরাজ গৃহেতে ফিরিলা॥
শাহা সূত গৃহে যদি করিল প্রবেশ
নৃপ সূত চলি গেল আপনার দেশ॥"

(ছ) শমশের আলী

'রিজওয়ান শাহ' নামক একখানি মাত্র কাব্যের লিখক শমশের আলীর জন্মস্থান হচ্ছে চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রাম। কবির সময়ে এই এলাকাটা ছিলো হাটহাজারীর অন্তর্গত। এই গ্রামেই বিখ্যাত কবি দৌলতকাজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির কাব্য পাঠে জানা যায় ঃ

'জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটহাজারি থানা।
সে সাকিনে শমশের মহা কবিবর।।
*　　*　　*　　*
সুলতানপুর মৌজা বলে সর্বজনা
প্রথম প্রসঙ্গ কাব্য রিজওয়ান ঈশ্বর।।"

(রিজওয়ান শাহা)

শমশের আলী—"কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস" বাক্যটির কোনো হস্ত লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া যায়নি; বটতলায় ছাপা হয়েছে; এ কাব্যের বারো আনা অংশ রচনা করেই কবি শমশের আলী ইনতেকাল করেন এবং বাকী এক চতুর্থাংশ 'আছলম' নামক অন্য কবি রচনা করেন। দৌলত কাজির মতো শমশের আলীও নিজ ভাগ্যের অনুসন্ধানে আরাকানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। 'রোসাঙ্গে' অবস্থান কালেই তিনি 'রিজওয়ান শাহা' রচনা করেন।

'রিজওয়ান শাহা' একটি কাহিনীমূলক কাব্য। সুপণ্ডিত কবি শমশের আলীর কাব্যের পটভূমিকা খোরাসান পারস্য প্রভৃতি দেশ হলেও এতে বাঙ্গালী উপাদান যে নেহায়েৎ কম নেই হীরালাল সাধু, তথা বণিক, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

তার প্রমাণ মেলে। শমশের আলীর ভাষা সংস্কৃত প্রধান, রূপ বর্ণনা গতানুগতিক এবং অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। যেমন-

"হেমতরু উর্ধভাগে শ্যামকাল গিরি।
শ্যামময় তৃণানুর পূর্ণ গন্ধ ধরি।।
মৃগমদ গন্ধ সদা সৌরভ বিষ্টিত।
শুভ গন্ধ ঘ্রাণ হেতু সকলের বাঞ্ছিত।।
"সেই শ্যামাকুর হইতে শ্যাম নেত্রমণি
সেই কালে কালনাগ জর্ম্মে কালঙ্গিনী।"

রূপের ব্যাখ্যা বা বিবরণ কোনো বিশেষ রূপকে আমাদের চোখের সামনে রূপময় ও প্রত্যক্ষ করে তোলে না। শমশের নামক জনৈক কবি পদাবলীর ঢঙে যেসব খণ্ড কবিতা রচনা করেন সেগুলিও গতানুগতিক। দু'জন অভিন্ন ব্যক্তি কি-না তা বলা দুষ্কর।

(জ) মুজাফ্ফর

কবি মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' নামক বিখ্যাত কাব্যের একটি খণ্ডের নাম 'হানিফার পত্রপাঠ'। এই 'হানিফার পত্রপাঠ' খণ্ডে 'এযীদের উত্তর' নামে একটি অংশ সংযোজিত হয়েছে; এই অংশটি মুজাফ্ফর নামক এক কবির লিখিত। কবি মুজাফ্ফর তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"ছোলতান দৌহিত্র চক্রশালা ঘর
কহে হীন মুজফরে এজিদ-উত্তর।"

এই 'ছোলতানই মহাকবি পীর মীর ছৈয়দ সুলতান বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে কবি মুজাফ্ফর হচ্ছেন ছৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র এবং চক্রশালা হচ্ছে তাঁর নিবাসস্থল।

কবি মুজাফ্ফরের নামে 'ইউনান দেশের পুঁথি' নামক একটি গ্রন্থের তিনটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। 'এযীদের উত্তর'-এর রচয়িতা মুজাফ্ফর এবং 'ইউনান দেশের পুঁথির' গ্রন্থকার একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষের জ্ঞান ও শক্তি যে তুচ্ছ এবং আল্লাহই যে সর্বশক্তিমান, কবি এ পুঁথিতে তাই বলতে চেয়েছেন। কবি এ কাব্যে গ্রীক পণ্ডিতগণের জ্ঞানের অহংকার ও দাম্ভিকতার পরিণাম দেখিয়েছেন। কবির রচনা ক্ষমতা ও ব্যংগ-রস-রসিকতার নমুনা নিম্নের উদ্ধৃতিতে মিলবে ঃ

www.pathagar.com

"আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ
ইনান দেশের কথা শুন দিয়া মন॥
ইনান দেশের লোক বহুল পণ্ডিত
প্রভুর কুদরত তারা পারএ গণিত॥

একদিন চারিজন বসি একত্তর
আকাশে উপরে দিষ্টি করে নিরন্তর॥
সবে বলে এই আকাশ হইয়াছে পুরান
লামাই বদলি নিমু নবীন বএয়ান॥"

ইউনান দেশ, অর্থাৎ গ্রীসের লোকেরা মহাপণ্ডিত, তারা আল্লাহর কুদরত পর্যন্ত গুণতে পারে। চার পণ্ডিতে বসে পরামর্শ করে কিনা—এই আকাশ পুরোনো হয়ে গেছে, একে নামিয়ে এর জায়গায় তারা নতুন আরেকটা আকাশ স্থাপন করবে!—মনে হয় কবি, কথাগুলি লিখেছেন আর এইসব পণ্ডিতের মূর্খতায় মুখ টিপে টিপে হেসেছেন।

(ঝ) শরীফ শাহ

এই কবির একমাত্র কাব্য 'লালমতি সায়ফুল মুলুক।' রজ্জাক নন্দন আব্দুল হাকিমও এই নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা জানার উপায় নেই। এই পুঁথিতে লালমতি ও জুলকারনাইন সেকান্দারের পুত্র মুলুকের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। প্রেমমূলক কাব্য হলেও পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারই এ কাব্যের উদ্দেশ্য।

লালমতির ভণিতায় আছে ঃ

(ক) "খোয়াজ সহায় যার, কিবা চিন্তা মনে তার
কেনে দুক্ষ পাও মহাশয়
চরণে হামিদ পীর শরীফের শিরে ধীর
কি করিতে পারে দুষ্ট হয়।"

(খ) "শাহা সুলতানসুত সর্বগুণে অলংকৃত
তান পদে করিয়া ভকতি
কাজি মনসুর মানি তাহান তনয় জানি
শরীফ যাহার ভারতি।"

www.pathagar.com

কবির পীরের নাম হামিদ; 'শাহা সুলতানের পুত্র কাজি মনসুর'—কবি যদি কাজি মনসুরের তনয় হন তাহলে তিনি 'শাহা সুলতানের'ই অন্যতম পৌত্র। তাঁর নিবাস চট্টগ্রামের চক্রশালা হওয়াই স্বাভাবিক।

গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নের উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"সয়ফুল মুলুক কিস্‌সা পড়ে একজন
কেতাবের দরমিয়ান দেখি অপূর্ব কথন॥
সেই মহাশয় যদি কেতাব পড়িল
যত দোস্তগণ শুনি হরষিত হৈল॥
সর্বলোকে এইসব মধুরস বাণী শুনি
প্রচার করিতে যুক্ত এ সব কাহিনী॥
* * * *
কহেন্ত শরীফ হীনে মনেত ভাবিয়া
এ সকল কথা আমি দিমু প্রচারিয়া॥
মুরশিদ চরণ শিরে করিআ বন্দন
লালমতি কিস্‌সা লিখি করিয়া যতন॥"

কাব্যখানি একটি ফারসী উপাখ্যানের তর্জমা। কবির ভাষা প্রাঞ্জল; আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার নগণ্য। কোন্ মাসে নারী প্রথম ঋতুবতী হলে তার ফল কিরূপ হয়ে থাকে কবি নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন ঃ

"প্রথমেত নারী যদি হইল বিকশিত
কোন্ ভাল কোন্ মন্দ শুন তার ভিত॥
বৈশাখে জৈষ্ঠেতে যদি হএ বিকশিত
সোআমি সঙ্গে পীরিত বাড়এ বহুৎ॥
লতাতে তরু যেন থাকএ জড়িয়া
তেন মতে সোআমি সঙ্গে থাকএ মজিআ॥
আষাঢ়েতে রজস্বলা হৈলে নারীগণ
ধনে পুত্রে বাড়িবেক সম্পদ নিপুণ॥
শ্রাবণেতে রজস্বলা হইলে কামিনী
ব্যাধিএ পীড়িত হয় সে সব রমনী।।
ভাদ্র মাসে রজস্বলা হএ নারীগণ
শিশু প্রসবিতে নারী হইব নিধন।।"

www.pathagar.com

রতি দেব

সপ্তদশ শতকের হিন্দু কবি রচিত প্রায় সমস্ত কাব্যই হয় দেব দেবীর মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গল কাব্য, না হয়, রামায়ন-মহাভারতের অনুবাদমূলক কাব্য। হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান কালে শৈব ধর্মই মাথা তুলে দাঁড়ায় বলে দীনেশবাবুর ধারণা। শৈব ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্য কোনো বৃহৎ কাব্য রচিত না হলেও সপ্তদশ শতকে কয়েকটি ক্ষুদ্র রচনায় শুধু শিব চতুর্দশীর উপাখ্যানটি অবলম্বন করে শিবমঙ্গল বা 'শিবায়ন' কাব্য রচিত হতে থাকে। চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' নামক পুঁথিতে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে কবির নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী লোটাইয়া বন্দম জন্য গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শ্বাশুড়ি বন্দম মহেশ শ্বশুর
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥"

চট্টগ্রামের চক্রশালার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম সাহিত্য বিশারদ জনাব আব্দুল করিমেরও জন্মস্থান। এই গ্রামে রতিদেবের বংশধরেরা আজো বসবাস করেন কিনা, জানা যায়নি। রতিদেব তাঁর কাব্য রচনা করেন 'রস অংক বায়ু শশী শাকের সময়'। অর্থাৎ ১৫৯৬ শকাব্দে বা ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে 'মৃগলুব্ধ' রচিত হয়।

'শিবরাত্রি চতুর্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ।'

তার বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। শিব হচ্ছেনঃ

"সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥
* * *
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকরাল
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥"

www.pathagar.com

'মনসার ধূপাচার' নামক আরেকটি কবিতার ভণিতায় দেখা যায় ঃ

"ধূপাচার লৈয়া মা মাগম তুয়া পায়
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরি মায়।"

'মৃগলুব্ধে'র রচয়িতা এবং 'মনসার ধূপাচারে'র রচয়িতা অভিন্ন বলে মনে হয়।

(ট) দ্বিজ রামদেব

'অভয়া মঙ্গল' নামক কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ রামদেবের দুখানি মাত্র প্রতিলিপি কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পুঁথিটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে কবির কোনো আত্মবিবরণী নেই, ভণিতায় প্রায় সর্বত্র কবি নিজেকে 'বিধুসুত' বলে উল্লেখ করেছেন। 'কবি বিধু' কবিচন্দ্র হওয়া অসম্ভব নয়। কবির নিজের প্রদত্ত কাব্যরচনার কাল নিম্নরূপ ঃ

'ইন্দু বাণ ঋষি বাণ শক নিয়োজিত
রচিলেক রামদেব সারদা চরিত।'

মঙ্গল কাব্যের রচনার কাল নির্দেশক পদ থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা বাম দিক থেকে পড়তে হয়। একে বলে 'অংকস্য বামা গতি'। এই নিয়ম ভঙ্গ করে অংকগুলি রামদেবের উল্লেখিত পদে যেভাবে লিখিত হয়েছে, সেভাবেই পড়ে গেলে আমরা 'সারদা চরিত' বা 'অভয়া মঙ্গল' কাব্য রচনার কাল পাই—১৫৭৫ শকাব্দ বা ১৬৫৩ খৃঃ অঃ। গ্রন্থমধ্যে কালকেতুর নগর পত্তন উপলক্ষে মগ ফিরিঙ্গীদের আগমনের কথাও আছে; কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে তা নেই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেই মগ ফিরিঙ্গীদের মিলিত উৎপাত বাঙালী জীবনে চরম আকার ধারণ করে। "রামদেব তাঁর কাব্য মধ্যে নিজের কোনো পরিচয় দিয়ে যাননি। তবে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল রচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে দ্বিজ মাধবকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই লোক ছিলেন, তা অনুমান করা অসংগত হবে না।" —(আশুতোষ ভট্টাচার্য্য)।

রামদেব যেভাবে পদে পদে তাঁর পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের অনুকরণ করেছেন, কোনো কবিই সেভাবে প্রাক্তন অন্য কোনো কবির অনুকরণ করেন না। দ্বিজ মাধবের

www.pathagar.com

কাব্যের নাম 'সারদা চরিত'। দ্বিজ রামদেবও কোনো কোনো স্থলে তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন—'সারদা চরিত'। দ্বিজ মাধবের মতো তাঁরও কাব্যের আরম্ভ সূর্যবন্দনা দিয়ে। বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় তিনি শুধু দ্বিজ মাধবের ছন্দেরই অনুকরণ করেননি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। ফলে, তাঁর রচনার কোথাও মৌলিকতার প্রকাশ ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজ মাধব লিখেছেন ঃ

"ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী
তোহ্মার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী॥
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ॥"

সেখানে দ্বিজ রামদেব লিখেছেন ঃ

"ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনিহ কাহিনী
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা ভগিনী॥
এইমাত্র শুনে রাজা সাধুর বচন
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগণ॥

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

আরাকানের রাজদরবারে চট্টগ্রামের কবি

আরাকান রাজ্যের সীমা মুঘল আমল পর্যন্ত বার বার বদলেছে। কয়েকবার হাত ছাড়া হলেও সমগ্র চট্টগ্রাম বিশেষ করে উত্তরে কর্ণফুলী নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুঘল আমলের সমাপ্তি কাল পর্যন্ত আরাকান অধিকারেই ছিলো। আরাকানীরা ছিলো মগ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবু আরাকান রাজ নরমিখলার রাজত্বকাল থেকেই আরাকানে গৌড়ীয় মুসলিম প্রভাবের সূচনা হয়। আরবী মুসলিমদের সাথে আরাকানীদের পরিচয় ঘটে আরো আগে থেকেই। এই প্রভাব এতোটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো যে ১৪৩৪ খৃঃ থেকে ১৬৪৫ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরেরও অধিক কাল ধরে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা তাঁদের বৌদ্ধ নামের সাথে একটি করে মুসলিম নাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মুদ্রায় ইসলামের কলেমা মুদ্রিত করেছেন। মুঘল পাঠান রাজশক্তির সংগে তাঁদের সম্পর্ক হৃদ্যতামূলক না হলেও তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসন ব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁরা ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাবান। ইসলামের সাম্যবাদ, ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানব প্রেমের আদর্শ অতি সহজেই তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা-দীক্ষায়, রণ কৌশলে উন্নত মুসলমান পারিষদ ও মন্ত্রীবর্গ অল্প দিনের মধ্যেই আরাকান রাজসভা কার্যতঃ কুক্ষিগত করে ফেলেন। এমনকি, রাজাদের অভিষেক ক্রিয়াও মুসলিম প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হতো। তাঁদের প্রধানমন্ত্রী, (মহাপাত্র, মুখপাত্র, মহামাত্য) অমাত্য (পাত্র) সমর সচিব (লস্কর উজীর) কাজী (দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারক) প্রভৃতি উচ্চ পদগুলি মুসলমানদের দ্বারাই পূর্ণ হতো। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত আরাকান রাজদরবারে এই প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিলো এবং এই শতকেই আরাকান রাজসভা কার্যতঃ মুসলিম রাজসভা হয়ে ওঠে।

আরাকানে এই মুসলিম প্রভাব আসলে বাঙালী মুসলিমেরই প্রভাব। তার ফলে বাঙলাদেশের বাইরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এহেন প্রসার সম্ভব হয়েছিলো। আরাকান রাজ্যের মুসলমান সভাসদরা ছিলেন বাঙলা ভাষাভাষী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাই আরাকানের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির কারণ।

www.pathagar.com

আরাকান রাজ থিরি থুধম্মার (১৬২২-১৬৩৮) লস্কর উজীর বা সমর সচিব আশরাফ খানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। আশরাফ খান ছিলেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামে তাঁর দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ ও একটি দিঘী এবং রাউজান থানার কদলপুর গ্রামে লস্কর উজীরের দিঘী এখনো টিকে আছে। এই আশরাফ খানের আদেশেই কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না' নামক বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। থিরি থুধম্মার রাজত্বকালের আরেকজন চট্টগ্রামী কবির নাম হচ্ছে মরদন এবং তাঁর কাব্যের নাম 'নাসিয়া নামা'।

থিরি থুধম্মার পর সরপদ্যিগি (১৬৩৮—১৬৪৫ খৃঃ) এবং তারপর থদোমিন্তার আরাকানের সিংহাসনে বসেন। থদো মিন্তারের মুখ্যপাত্র কবি বহু ভাষাবিদ মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি আলাওল তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। থদোমিন্তারের পুত্র চন্দ্রসুধমার রাজত্বকালে (১৬৫২—১৬৮৪ খৃঃ) তাঁর সমর সচিব ছৈয়দ মুহাম্মদের আদেশে 'হপ্ত পয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সিকান্দর নামা' ও পাত্র (মন্ত্রী) ছৈয়দ মুসার আদেশে কবি 'সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল' রচনা করেন।

দৌলত কাজি

(আঃ ১৬০০-১৬৩৮)

দৌলত কাজির জন্ম চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে। অল্পবয়সে তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেশে তাঁর বিদ্যাবত্তা পাণ্ডিত্যের কদর না হওয়ায় তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সুদূর আরাকানে গিয়ে পৌছান। আরাকান রাজসভায় তখন বহু কবি, জ্ঞানী ও গুণীর ভীড়। দৌলত কাজী কি করে আরাকান রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁর কাব্য 'সতী ময়না' থেকে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানতে পারা যায় না। তবে তাঁর একটি উক্তি থেকে জানা যায়, রাজার প্রধান উজীর আশরাফ খান মজলিশ মুশায়েরা করে কাব্যালোচনা করতেন। এই ধরনের কোনো এক মজলিশে আশরাফ খান একদিন 'সাধন' নামক কোনো এক কবি কর্তৃক অবধি হিন্দী ভাষায় রচিত 'সতী ময়না'র কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করেন। তখন দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে ময়নার কাহিনী শুনিয়ে আশরাফ খানের ইচ্ছা পূরণ করেন। এতে করেই তিনি রোসাঙ্গ রাজ দরবারে কবিদের মধ্যে গৃহীত হন।

www.pathagar.com

কবি দৌলত কাজী সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থিরি থুধম্মার (১৬২২—১৬৩৮ খৃঃ) লস্কর উজীর আশরাফ খানের আদেশে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন তা জানা যায় তাঁর কাব্যের শুরুতেই থিরি থুধম্মা ও আশরাফ খানের অজস্র প্রশংসা কীর্তনে ঃ

"কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে যুদ্ধাচার
নাম শ্রী থুধম্মা রাজা ধর্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।
পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার জীবন।
নারকিহ স্বর্গপাত্র সাফল্য জীবন।।"

*　　*　　*

"মুখ্য পাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
হানাফী মোজাহাব ধরে চিস্তিয়া খান্দান।

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত আশরাফ খান লস্কর উজীর
যাহার প্রতাপ বজ্রে চূর্ণ অরি শির। (সতীময়না)

কবি অল্প বয়সেই মারা যান। 'সতীময়না' রচনা কালে তাঁর বয়স অনধিক চল্লিশ হতে পারে। ডঃ হকের অনুমান মতে ১৬০০ খৃঃ এ কবি জন্মগ্রহণ করেন এবং সে শতকের দ্বিতীয় পাদে পরলোক গমন করেন। কাব্যখানি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি; তাঁর মৃত্যুর প্রায় একুশ বছর পরে মহাকবি আলাওল তাঁর অসমাপ্ত কাব্যখানি সমাপ্ত করেন।

"বাঙলায় হিন্দী, ফারসী রোমান্টিক কাব্য ধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ দরবারের দুজন সভা কবি—দৌলত কাজী ও আলাওল" (সুকুমার সেন)। দৌলত কাজীর একমাত্র কাব্য 'সতীময়না' মোট তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কাব্যের নায়ক-নায়িকা এবং তাঁদের স্বভাবগত দোষগুণ গুলির সংগে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের নায়িকা ময়নাবতী বিরহের আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর বিরহের অবসান হলো এবং সে সংগে তাঁর স্বামী লোর ও সতীন চন্দ্রানীর

www.pathagar.com

মিলন হলো। দ্বিতীয় খণ্ডের বারোনাসী এগারো মাস পর্যন্ত লিখেই কবি ইন্তেকাল করেন এবং কবির ইংগিত মত কাব্যটিকে মিলনান্তক করে কবি আলাওল দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

এ কাব্যের কাহিনী অংশ সাধারণ। নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনের একটি মাত্র দিকই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এতে কোনো অবাস্তব ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নেই। দৌলত কাজী ময়নার সতীত্ব ও বারোমাসী বর্ণনার ব্যাপারে সাধনের 'মৈনাসত'কে অনুসরণ করলেও লোর চন্দ্রানীর রোমাঞ্চ ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ, মওলানা দাউদের 'চান্দাইন' (প্রথম হিন্দী অবধি রোমান্টিক কাব্য) কাব্য থেকেই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। 'চান্দাইন' কাব্যের ঘটনাগুলির সাথে 'চন্দ্রানী' কাব্যের প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলীর যথেষ্ট মিল আছে। দৌলত কাজীর কাব্যের প্রথম খণ্ডের ঘটনাগুলি দাউদের 'চান্দাইন' ছাড়া আর কোথাও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন কাব্য থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে দৌলত কাজী তাঁর কাব্যটিকে সমৃদ্ধতরো করেছেন ও ময়নার সতীত্বমূলক কাহিনীটি সাধনের 'মৈনাসত' থেকেই গৃহীত।

কবি মূল কাহিনীর ঘটনাকে সংক্ষেপ করে কাহিনীর সংহতির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন এবং বাঙলাদেশের প্রকৃতির সংগে খাপ খাওয়াতে গিয়ে দাউদের কাহিনীর অনেকগুলি অংশ বাদ দিয়েছেন।

লোরক চান্দার গীতিকা বা কাহিনী আসলে একটা লোক গীতিকা। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের আহীরদের মধ্যে এবং মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় এলাকায় প্রচলিত এই কাহিনীটির সংগে মওলানা দাউদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো। লৌকিক সংস্কৃতির সংগে দাউদের এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং লোক গীতিকার কাব্যিক রূপায়ন তাঁর গণচেতনারই দলিল। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবধি ভাষায় দাউদের রোমান্টিক কাব্য রচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমির খসরু "লায়লী মজনু" "শিরী ফরহাদ" জাতীয় প্রেম কাহিনীর মাধ্যমে রূপক কাব্যের যে ইরানীয় ধারা এদেশে প্রচলিত করেছিলেন ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও দাউদ সেই ধারার সংগে বিশেষ কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করে দেশী ভাষায় দেশী প্রণয় গাঁথাকে কাব্যিক রূপ দিলেন। এই ঘটনা সে যুগের মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। চান্দাইন ও মৈনাসতের উপর ভিত্তি করে কবি দৌলত কাজী যে কাব্য রচনা করেছেন তা যে শুধু সার্থক চরিত্র চিত্রণেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্য সাধারণ কাব্য তা নয়, বাঙলা কাব্যে সর্বপ্রথম ধর্ম ও তত্ত্বকথা বর্জিত

www.pathagar.com

কাব্যাদর্শেরও স্থাপিয়তা। এ কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ময়নাবতীর সতীত্ব, লোরের যৌবণচাঞ্চল্য ও কামনা, চন্দ্রানীর নটীপনা ও অসংযম, ছাতনের লাম্পট্য, রওনা মালিনীর ধূর্ততা ও চাতুর্য সবই মানবিক স্বাভাবিকতায় ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ্ ও রসুলের বন্দনাতে কাব্যটির শুরু। তারপর কবি রোসাংগ রাজের প্রশস্তি ও ফকির পৃষ্ঠপোষক ধর্ম-পাত্র লস্কর উজীর আশরাফ খানের গুণগান করে "লোরকরাজ ময়নার ভারতী" শুরু করেছেন। রাজকন্যা ময়নাবতী অপূর্ব সুন্দরী, তাঁর অংগের লীলায় অনঙ্গ বন্দী হয়ে আছে, তাঁর কাঞ্চন কমলের মতো মুখের কাছে পূর্ণশশী শরম পায়, চঞ্চল যুগল আঁখির কাছে নীলোৎপলও লজ্জিত—আর সে

"প্রিয়বাদী, পতিব্রতা সুলাস সুমতি
প্রত্যক্ষ শংকত সম সেবে নিজপতি
সর্বকলা যুতা সতী নূতন যৌবন
স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন।।"

তাদের প্রেম ভালবাসা এতোই গভীর যে, 'তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল।' কিন্তু অমন প্রেম বেশীদিন স্থায়ী হলো না। লোরের চরিত্রেই অন্তর্নিহিত ছিলো অসংযম ও ভোগের স্পৃহা। আসলে স্বভাবের দিক দিয়েই তো পুরুষ বহু ভোগী—একনারী নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সেই আদিম অতৃপ্তিতে লোর ময়নাবতীর প্রতি বিমুখ ঃ

"যুবান পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।"

লোর কিছু দিনের জন্য ময়নাবতীর হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে কুঞ্জ বিহারে চলে গেল। এই সময় পশ্চিমের গোহারী দেশের মোংরা নামক রাজার চন্দ্রানী নামক অপূর্ব সুন্দরী কন্যার খবর পায় লোর। বামন নামক এক বীর পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে গোহারীরাজ রাজ্যভার জামাতার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিয়েতে চন্দ্রানীর দুঃখের অবধি রইলো না। কারণ তার স্বামী মহাবীর হলে কি হবে, সে যে নপুংসক ঃ

"সর্বগুণ যৌবণে সম্পূর্ণ বীর্যবল
রতিসর হীন মাত্র কিংশুক কেবল।"
"মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ় মতি॥"

www.pathagar.com

নিরুপায় চন্দ্রানী নানা কাব্যরস আলোচনা করে সময় গোঁমাস্ত (কাটায়) কিন্তু দুরন্ত যৌবন বন্যায় যার সারা সত্বা বিক্ষুব্ধ কাব্য রসে তার সান্ত্বনা কোথায়?

"শীতল মন্দিরে কন্যা নাহি রহে স্থির
মদন বেদনা চিত্তে আঁখি ঝরে নীর
হিততত্ব উপদেশ না শুনে শ্রবনে
ক্ষণে আলাপএ ক্ষণে বিলাপে আপনে।"

কয়েকবার নপূসক স্বামীর প্রেম লাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে চন্দ্রানী প্রতিজ্ঞা করলো ঃ

"এমত না হয় যদি স্বামী ব্যবহার
সহজে করিব শঠে শঠ সাধ সমাচার।"

নপুংসক স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ করে চন্দ্রানী পিতার আদেশ মতো তাঁরি জন্য নির্মিত এক সুরম্য প্রাসাদে দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করতে গেলো—কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো, কারণ ঃ

"যৌবন কালেত কন্যা বড় চিন্তা পাএ
অনঙ্গ ভুজঙ্গ বিষ সর্বাঙ্গে বেড়াএ।"

যৌবনচঞ্চলা চন্দ্রানীর চিত্তে হাহাকার। একজন হৃদয়বল্লভের সন্ধানে তার চিত্ত উন্মুখ। বছরে দু'বার করে চন্দ্রানী নগর ভ্রমণে বেরোয়, তখন তাকে উৎসবে সমাগত নানা দেশের রাজ কুমারেরা দেখে। এমনি এক উৎসবে চন্দ্রানীকে এক যোগী দেখতে পায়। সে লোরের কাছে চন্দ্রানীর বার্তা নিয়ে যায়। সব কিছু বর্ণনা করে যোগী বললোঃ

"পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে সুরপতি
স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্রানী শচী কলাবতী
চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম
বিদ্যাসংগে সুন্দরের যেন সমাগম।"

চন্দ্রানীর বর্ণনায় বিচলিত-চিত্ত লোর যোগীকে সঙ্গে নিয়ে গোহারী দেশে গেলো। ছয় মাস কেটে গেলে চন্দ্রানী দর্শনার্থী রাজাদের যখন ডাক পড়লো তখন তাদের সঙ্গে লোরও সাজসজ্জা করে রাজসভায় গেলো। চন্দ্রানী প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে তাকে দেখে একদম মূর্চ্ছিত হলো। পরদিন আবার সভা আহুত হলে এবার মূর্ছিত হলো লোর।

www.pathagar.com

এরপর লোর যোগীর বেশে চন্দ্রানীর মন্দিরে গিয়ে চন্দ্রানীর সাথে মিলিত হল। মন্দিরে চন্দ্রানীর নিজের গলার মালা ছিড়ে লোরের গলায় পরিয়ে দিয়ে পিতামাতা ও নপুংসক স্বামীর অগোচরে লোরকে স্বামীত্ব বরণ করে নিলো। এরপর প্রতি রাত্রে রশি বেয়ে উঠে লোর চন্দ্রানীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করে চন্দ্রানীর সাথে মিলিত হতে লাগলো। কিছুদিন পর যখন শুনলো স্বামী মহাবীর বামন তার নিকট আসবে তখন লোর চন্দ্রানীতে মিলে পরামর্শ ঠিক হয়ে গেলোঃ

"সেই ভালো তুমি আমি যাই দেশান্তর
এড়াইনু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুষ্করঃ"

যেমন কথা তেমন কাজ। লোর ও চন্দ্রানী পালিয়ে গেলো। বামন রেগে মেগে অস্থির হয়ে বেরোলো চন্দ্রানীর খোঁজে—তারপর গভীর অরণ্যে একদিন লোরের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো—বামন তীব্র ভাষায়, "পরনারী অপহরণকারী, অধর্মী, মূঢ় অবোধ লোরকে আক্রমণ করলে লোর ব্যঙ্গ করে বললো—

'খর্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া
পুরুষ উত্তম স্থানে ত্যজে তার প্রিয়া,
পুরুষ ভমরা জান মধু যথা পাএ
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলাএ
* * * *
আমারে বলসি চোর না করি বিচার
ভার্য্যা না ইচ্ছএ স্বামী কপাল তোমার।"

কথা কাটাকাটির পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বামন নিহত হলো, বনে সর্পাঘাতে চন্দ্রানী হতচেতন হয়েও এক মুনির বনৌষধিতে বেঁচে ওঠে। বৃদ্ধ গোহারীরাজ এবার নিজেই কন্যা চন্দ্রানীকে তুলে দিলেন লোরের হাতে ঃ

"কুলের চন্দ্রিকা তুমি কুমারী চন্দ্রানী
সেই ভাল হৈল হৈছে তোমার রমনী।"

নব দম্পতিকে নিয়ে এসে গোহারীরাজ রাজ্যভার লোরের হাতে তুলে দিলেন। কাব্যের প্রথম খণ্ড এখানেই শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বামী-প্রেম ও বিরহবেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লোর যখন চন্দ্রানীকে নিয়ে সম্ভোগ সুখে নিমগ্ন, বিরহিনী ময়নাবতী তখন

www.pathagar.com

সতত দেব পূজা, পতির মঙ্গল চিন্তা ও প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধনে নিরতা। স্বামী ও সতীন সম্পর্কে সব কিছু শুনে তার চিত্ত বিকারশূন্যই রয়ে গেলো, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা একটু কমলো না। পতি-বিরহিনী ময়নাবতীর রূপ গুণের কথা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। নরেন্দ্র নামক কোনো এক নৃপতির পুত্র ছাতন ময়নাবতীকে পাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে রওনা নামক এক মালিনীকে ময়নাবতীর কাছে পাঠায়। ময়নাবতীর নিকট গিয়ে নিজেকে ময়নার 'দুগ্ধদাত্রী ধাইমা' রূপে সে পরিচয় দেয়। দয়াবতী ময়নাবতী তাকে তার দুগ্ধদাত্রীরূপে বিশ্বাস করে অনেক আদর যত্ন করে। রওনা ময়নাবতীর বেশভূষার দৈন্য ও তার চেহারার মলিনতার কথা তুলে বললো ঃ

"নয়নে অঞ্জন নাহি সীথেত সিন্দুর
ত্রিভঙ্গ খোপার লাস না দেখি তোহোর।"
*　　*　　*　　*
"কোন দুঃখে সুখ ভোগ ত্যজ ময়নাবতী
আজুহ জনক তোর আছে ছত্রপতি॥

কিন্তু তাতেও ময়নাবতীর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য এলো না। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সংগে সতী ময়না বললো ঃ

"এক এক করি মুঞি নিমু নিজ প্রাণ
জগতে দোসর নাম না লইনু জ্ঞান॥
ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুন।
এক ছাড়ি ভাবএ যে দোসরক পুন॥
মোহর ভ্রমরা স্বামী জগত পুর্জিত
গোঘরের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত॥"

ধনে, বচনে, কিছুতেই যখন লোরবণিতা ময়নাবতীর মন পাওয়া গেলো না, তখন ছাতনের সাথে তার মিলন ঘটিয়ে দেবার উপায় কি? অনেক ভেবে চিন্তে রওনা এবার তাঁর মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করলো, ময়না কি জানে না, সংসারে সবই মেলে, কিন্তু যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে পাবার উপায় নেই?

"জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে
নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে॥
যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন
সংসারে না রৌক যার বিফল জীবন॥

www.pathagar.com

দুর্লভ যৌবন জান লোকের কুশল
যদি গেল কুশল কোথাতে কুতুহল॥
ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পাএ
অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মাএ।
চন্দ্রসূর্য অস্ত গেলে পুন উগীযাএ
যৌবণ চলিয়া গেলে পলটি নপাএ॥
কৃপণের ধন যেন মুর্খের যৌবন
কালে না খাইলে শেষে শোকের ভাজন॥"

ময়নার মুখে কোনো কথা নেই। তার নীরবতায় রওনা ভাবলো ময়নাবতীর অন্তরে তার কথা কারি করেছে। উৎসাহিতা রওনা তাই বার মাসে বিরহিনীদের দুঃখ এক এক মাস করে বলতে শুরু করে। ময়নার নীরবতা "প্রলয় ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন"—

তারি প্রমাণ পাওয়া গেলো ময়নাবতীর বিস্ফোরণে। প্রত্যেক মাসের পর ময়নাবতী এক একবার নির্মম উত্তর দিতে থাকে। তার কপালে যদি দুঃখ থেকেই থাকে তার জবাব—"লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ, জো বিধি লিখিল ললাট?" আষাড় ও শ্রাবণ মাসে বিরহিনীদের দুঃখযাতনা যখন রওনা বর্ণনা করলো—ময়নাবতী বললো ঃ

"মোহোর সুনাগর গুণের সাগর
মধুর মুরতী বেস
সো মধু তেজিতে কৈছনে বিখ পানাও
ভাল ধাঞি কহ উপদেশ।"

কারণ ঃ

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ
কোথাএ গোঘর কীট কোথাএ মহুপ,
গরল সদৃশ পর-পুরুষ সংগা
ডংসিআ পলাএ হেন কাল ভুজংগা।"

রওনার সমস্ত ছলাকলাই নিস্ফল হলো। ময়নাবতীকে সে কিছুতেই বিচলিত করতে পারলো না। ইত্যবসরে ময়না রওনার স্বরূপ ধরতে পেরেছে—তার উপদেশে ময়নার সখীরা ঃ

www.pathagar.com

"কুটনীর বেশ ধরি বহুল তাড়িল
বিস্তর মারিখা হেটে ফেলাইল ঠেলি
মস্তক মুড়াই মুখে দিল চুন কালি
ভ্রমাইল নগরে গর্দ্দভ চড়াইআ
প্রাণে না মারিল ধাঞি বধ বিবেচিআ।"

কাহিনীটির দ্বিতীয় খণ্ডে এখানেই শেষ। এর পরে তৃতীয় খণ্ডটি রচনা করেন মহাকবি আলাওল। এই খণ্ডে তিনি যেসব অবান্তর গল্পের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে রওন মল্লিকা ও মদন মঞ্জরীর প্রসঙ্গ এবং আনন্দ বর্মার কাহিনীই মুখ্য। সতী নারী ধৈর্যশীলা হলে স্বামীর সংগে পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী—এ সত্য প্রচারের জন্য এ কাহিনীগুলির অবতারণা। আলাওল লোরের সাথে ময়নাবতীর মিলন ঘটিয়ে কাহিনীটির মিলনান্ত উপসংহার করেছেন।

দৌলত কাজীর একটি মাত্র কাব্যই পাওয়া গেছে, তাও অসমাপ্ত। তবু এই অসমাপ্ত কাব্যটিতেই কবি তাঁর প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা সে যুগের বিচারে বিস্ময়কর। আলাওল পাণ্ডিত্যে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ দৌলত কাজী থেকে কিন্তু রচনার লালিত্যে, ভাষার মাধুর্যে এবং অল্পকথায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় তিনি আলাওল থেকে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবজাত কবিত্ব শক্তির দিক দিয়ে দৌলত কাজী সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে অতুলনীয়।

(খ) মরদন

(আঃ ১৬০০-১৬৪৫)

দৌলত কাজীর সমসাময়িক কবি মরদনের জন্মস্থান চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রাম। এই গ্রামে দৌলত কাজীও জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দৌলত কাজীর কর্মক্ষেত্রের মতো মরদানেরও কর্মক্ষেত্র হয়েছিলো রোসাঙ্গ। মরদনের একমাত্র কাব্য 'নসিবা নামা বা নসিরা নামা' পাঠে জানা যায়, তিনিও আরাকানরাজ থুধম্মার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি তখন রোসাঙ্গের 'কাঞ্চী' নামক স্থানে বাস করতেন বলে ডঃ হক অনুমান করেছেন। রোসাঙ্গে কাঞ্চী নগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"সে রাজ্যেতে আছে এক কাঞ্চী নামে পুরী
মুমিন মুসলমান কত বৈসে সে নগরী॥
আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কোরান
কায়স্থ বয়সে শিখ সৈয়দ পাঠান॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বসয়ে পণ্ডিত
নানা কাব্য রস কহ এ পুরিত॥

কবি এই মৌলিক কাহিনী কাব্যটিতে অদৃষ্টের অমোঘতা গল্পের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কাহিনীর চরিত্রগুলো মুসলমান। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিজ্ঞা- ভাগ্যক্রমে এক বন্ধু প্রচুর মাল-মাত্তার অধিকারী হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, কিন্তু পরে আবার বিত্তহীন হয়ে প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য হয়। অদৃষ্টের লিখন যে খণ্ডানো যায় না তাই প্রতিপাদিত হয়েছে এই গল্পের মাধ্যমে। এ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীগুলি যে পূর্ব থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো তা কবির জবানী থেকেই জানা যায়। কবি এই সুপরিচিত কাহিনীগুলির সাহায্যেই মানব ভাগ্যের একটা দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। সম্পূর্ণ স্থানীয় উপাদানে কাব্যটি রচিত বলে সাহিত্যের ইতিহাসে এর একটা বিশিষ্ট মর্যাদা চিরকালই থাকবে।

(গ) কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬)

রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙালী কবিদের মধ্যে কবি মাগন অন্যতম। 'চন্দ্রাবতী' নামে মাগনের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে। চন্দ্রাবতীর 'মাগন' আর আলাওলের আশ্রায়দাতা 'মাগন' যে একই ব্যক্তি এ হচ্ছে ডঃ হক ও সাহিত্য বিশারদ সাহেবের অভিমত। এ জন্য তাঁরা চন্দ্রাবতীর বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণএবং আলাওলের বিভিন্ন কাব্যে মাগনের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে "আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগনের সহিত "চন্দ্রাবতীর" কবি মাগনের অনেক বিষয়ে হুবহু মিল রহিয়াছে। আকস্মিকভাবে দুই একটি বিষয়ের মিল হইতে পারে, এতগুলি বিষয়ের একত্র সমাবেশে স্বতঃই মনে হয় দুই ব্যক্তি এক; অন্তত কবির স্বরচিত আত্মকাহিনী আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অনুমান অসত্য হইবার কোনো কারণ দেখি না।"

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে ডঃ সুকুমার যেন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, "আলাওলের আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।" মাগন ঠাকুর ছিলেন আরাকানের রাজপুত্র, অতএব মগ। মগেরা হিন্দু না হউক, মুসলমান ছিলো না। ঠাকুর নাম মাগনের "অমুসলমানত্বের যথেষ্ট প্রমাণ বলে ডঃ সেনের ধারণা। অথচ 'সয়ফল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল' গ্রন্থে ও পদ্মাবতীতে আলাওল তাঁর আশ্রয়দাতা মাগনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"সিদ্দীক বংশেত জন্ম, শেখজাদাজাত
কুলে শীলে সৎকর্মে ভুবন বিখ্যাত।
এক মহা পুরুষ আছিল সেই দেশে
মহাসত্য মুসলমান সিদ্দীকের বংশে।" (পদ্মাবতী)

কাজেই মাগন যে মগ ছিলেন না, আরব বংশজাত অভিজাত মুসলমান ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি যে "কোরেশী শেখ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন, সাহিত্য বিশারদ ও ডঃ হকের এই বক্তব্য অনেকখানি যুক্তি নির্ভর। নিঃসন্তান মা-বাপ আল্লাহর কাছে বহু কান্নাকাটি করে মেগে পেয়েছিলেন তাঁকে, তাই তাঁরা পুত্রের নাম দিয়েছিলেন মাগন। রোসাংগরাজ থিরি থুধম্মার রাজত্বকালে মাগন এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রোসাঙ্গরাজ থদোমিন্তার (আলাওলের পৃষ্ঠপোষক সাদ্ উমেদা) যখন মারা যান (১৬৪৫—১৬৫২) তখন তাঁর পুত্র থিরি থুধম্মা একেবারেই শিশু। এহেন শিশুর পক্ষে রাজ্য চালানো সম্ভব নয়—থিরি থুধম্মার বিধবা জননীর এ ব্যাপারে কোনো সংশয় রইলো না। তাই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য তিনি নিজেই চালাতে থাকেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য মাগন ঠাকুরকে প্রধান উজীর পদে বহাল করেন। মাগনের পিতা বড় ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের সমরসচিব ছিলেন।

আরবী, ফারসী. বর্মী ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, সংগীত, নাট্য-কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, ভৈষজ্য, যাদু ও অন্যান্য বিদ্যায় পারঙ্গম কোরেশী মাগন ছিলেন উদার, দানশীল, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক ও পোষক। তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি, কবি ছিলেন রোসাঙ্গ প্রবাসী। তাঁর কাব্য চন্দ্রাবতীর ভাষা আলোচনা করে তাতে খাস চট্টগ্রামী চলতি বুলির এমন কতকগুলি ব্যবহার পাওয়া গেছে যা একমাত্র চট্টগ্রামী লোকের পক্ষেই সম্ভব। এই যুক্তিতে ডঃ হক ও সাহিত্য বিশারদ সাহেব অনুমান করেন—কবির বাড়ী চট্টগ্রামেরই কোথাও হওয়ার

www.pathagar.com

সম্ভাবনা। এই অনুমান খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। যাই হোক কবির কর্মস্থল রোসাঙ্গেই কবির মৃত্যু হয় ১৬৬৮ সালে।

চন্দ্রাবতী একটি মিলনান্তক কাহিনী কাব্য। 'বীরভান এবং চন্দ্রাবতীর মিলন দেখানোই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান শুধু নামে নয়, কাজেও বীর পুরুষ। চন্দ্রাবতী সিংহল বা সরদ্বীপের রাজা সুরপালের কন্যা। রূপে-গুণে অনন্যা কন্যা চন্দ্রাবতীর কথা শুনেই বীরভান যেমন দেওয়ানা হলো, চন্দ্রাবতীও তেমনি বীরভানের কথা শুনে তার প্রতি গভীর আসক্ত হয়ে পড়লো। 'জালিয়া' 'গোরাব' প্রভৃতি হাজার ডিংগা সাজিয়ে বীরভান সিংহলে যাত্রা করে, তার সঙ্গী হলো প্রধান মন্ত্রীপুত্র, তার প্রিয় বন্ধু 'সূত'। পথে অনেক ঝড়তুফানের সাথে সংগ্রাম করে বীরভান সরদ্বীপ পৌঁছে শুনতে পেলো চন্দ্রাবতীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেলো এবং বীরভানের সাথেই চন্দ্রাবতীর বিয়ে হলো।

কবির মাত্র একখানি কাব্য পাওয়া গেলেও এই কাব্যেই স্থানে স্থানে কবি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। সমগ্র "চন্দ্রাবতী" কাব্যটিকে একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলা চলে না, তবু স্থানে স্থানে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। সামুদ্রিক দৃশ্য এবং বর্ষার বর্ণনায় বাস্তব এবং অবাস্তবের পরিণয় সাধনে কবি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কল্পনার অবাধ বিহার এ দেশেরই একটি জনপ্রিয় রূপকথাকে রূপান্তরিত করে যে নতুন রূপ দিয়েছে তাতে রয়েছে কবির মৌলিকতার প্রমাণ।

কবির ভাষার নমুনা স্বরূপ বর্ষার বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।
বসন তিতিল নিত্য নয়নের ঝারা॥
বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ।
বান হানে তার স্বরে দেহা প্রাণ জিউ॥"

বীরভানের রূপ বর্ণনা ঃ

"সিংহল দ্বীপেতে যে কুমার বীরভান
নিশি অন্ধকারে যেন ভানু দীপ্তিমান।"
চন্দ্রাবতীর বীরভানের কথা শুনে ঃ
"প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা সুচরিতা,
কুমারের রূপ ধ্যান করে গুণযুতা॥'

www.pathagar.com

আলাওল

আরাকান রাজদরবারে বাঙালী কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন মহাকবি আলাওল। মধ্য যুগের হিন্দু-মুসলিম বাঙালী কবির মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, সৃষ্টির অজস্রতায়, পরামায়ুর দীর্ঘতায় নিঃসন্দেহে তিনি মধ্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি।

কিন্তু অতো বড়ো কবি হওয়া সত্ত্বেও আলাওলের জন্মস্থান ও সমাধিস্থান নিয়ে আজো বিতর্কের অবসান হলো না। মরহুম আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো এবং ডঃ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে দাবি করেছেন। সুদীর্ঘ তিনশো বছর ধরে চট্টগ্রামে আলাওলের কাব্যের যে ব্যাপক চর্চা হয়েছে এবং সারা চট্টগ্রামে তাঁর যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে, তাতে কবিকে চট্টগ্রামের কবি মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আলাওলের গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি প্রধানত চাটগাঁয়েই পাওয়া গেছে। এ যুক্তিও উপরোক্ত দাবীকেই জোরদার করে। ১৭৫৬ খৃঃ অঃ পর্যন্ত শংখ নদ থেকে রামু পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান রাজারা শাসন করতেন। রাজধানী রোহাং বা রোসাঙ্গের নামে এই এলাকাকেও রোহাং বা রোসাঙ্গ বলা হতো। রোসাঙ্গ রাজধানীর সাহিত্য এই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সে জনপ্রিয়তা উত্তরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আলাওলের জন্মভূমি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ এই কারণেই ঘটেছে যে; কবি তাঁর কর্মক্ষেত্র এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্মভূমি ও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে নীরব। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে 'পদ্মাবতী' কাব্যে বলেছেন ঃ

"মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান
*　　*　　*　　*
মজলিস কুতুব তথতি অধিপতি
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি।"

'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যেও একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাইঃ

"গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ
*　　*　　*　　*
মধ্য ভাগে বহে তার গঙ্গা ভাগিরথী।
মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর
তাহান অমাত্য সুত মুঞি সে পামর।"

www.pathagar.com

মহাকবি আলাওল কবি দৌলত কাজির অসমাপ্ত কাব্য "সতী ময়না লোর চন্দ্রানী'র অন্তিম খন্ডটি রচনা করেন। ঐখানেও কবির মুখে একই উক্তি ঃ

"গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ
* * * *
মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ
মজলিস কুতুব এথাতে অধিপতি
তাহান অমাত্যসুত মুই হীন মতি।"

অন্যতম কাব্য 'সেকান্দার নামায়'ও অনুরূপ উক্তি দেখতে পাই ঃ

"গৌড় মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ ভূম
* * * *
ভাগিরতী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়
মুই ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥"

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি কর্তৃক বার বার গৌড়, ফতেয়াবাদ, জালালপুর, মজলিস কুতুব এবং গঙ্গা (নদী অর্থে) ভাগিরথীর উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ডঃ এনামুল হক বলেন— "১৬০৭ খৃঃ-এর কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা নামক গ্রামে আলাওলের জন্ম হয়। .... এই গ্রামে আলাওলের দীঘির পাড়ে আলাওলের মসজিদ ও কবর এখনো তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ছিলেন। এই ফতেয়াবাদ ফরিদপুর জেলার 'সরকার ফতেয়াবাদ' নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। হালদা ও শংখ নদীর মিলন স্থলে অবস্থিত 'ফতেয়াবাদ'ই কবির উল্লেখিত 'ফতেয়াবাদ' বলে ডঃ হক মনে করেন। ডঃ হকের এই যুক্তি খুবই দুর্বল মনে হয়। জনাব আহমদ শরীফ বলেন— 'জালালপুর, মজলিস কুতুব ও ভাগীরথী বিশেষত শেষোক্ত নামটিই নিশ্চিত প্রমাণ যে, আলাওল ফরিদপুরস্থ 'ফতেয়াবাদ রাজ্য' ও রাজা মজলিস কুতুবকেই নির্দেশ করেছেন।' এই ফতেয়াবাদ (আধুনিক ফরিদপুর) ছিলো 'মজলিশ কুতুবের রাজ্য'। ঈসা খানের পুত্র ভুঁইয়া সর্দার মুসা খানের সঙ্গে মজলিস কুতুবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মজলিস কুতুব সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিস্তির ১৬০৮-১৩ খৃঃ) নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আকবরের আমলে ফরিদপুর,

www.pathagar.com

যশোহর বা বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালী— এ কয়টি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিলো ফতেয়াবাদ পরগণা। মজলিস কুতুবের আমলে এর আয়তন অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। এই ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুরেই আলাওলের পিতার কর্মভূমি ছিলো। কিন্তু এ তাঁর পিতার জন্মভূমি কিনা এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। হতে পারে জালালপুরেই কবির জন্ম হয়, কিংবা এও হতে পারে, পিতা কর্মব্যপদেশে যখন সপরিবারে জালালপুরে আসেন, তখন বালক আলাওলও মা-বাপের সাথে জালালপুর আগমন করেন। এ সবই অনুমান মাত্র। একবার কার্যহেতু কবি তাঁর পিতার সঙ্গে নৌকাযোগে বেরিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল তখন মগ দস্যু ও হার্মাদদের (পর্তুগীজ দস্যুদের) উপদ্রবে বিপর্যস্ত—কবিও এদের হাতে পড়লেন—

"দৈবগতি কার্যহেতু যাইতে নৌকা পন্থে
দরশন হইল হার্মাদ সহিতে
শহীদ হইল বাবা খুনি বহুতর
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইলু এসর
নিজ দুঃখ কথেক কহিমু বিরচিয়া
রাজ-আসেয়ার হেঁলু এথাত আসিয়া।"

আলাওল 'রাজ আসোয়ার' তথা রাজার দেহরক্ষী অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগদান করলেন। মহাকবির প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মেছেন, তিনি হলেন সৈনিক। কিন্তু কঠিন বর্মের আড়ালেও প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। আলাওলের কবি প্রতিভার কথাও জাহির হয়ে পড়ে। আরাকানের দু'জন নৃপতি সদস্য কেওদার (থদো মিন্তার, ১৬৪৫-১৬৫২ খৃঃ) এবং থিবিসাঙ্গ থুধম্মার (চন্দ্র সুধর্ম্মা, ১৬৫২-১৬৮৪ খৃঃ) রাজত্বকালে মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান ও নব রাজের আদেশে আলাওল 'পদ্মাবতী', 'রতন-কলিকা আনন্দ বর্মা উপাখ্যান', 'সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল', 'সপ্ত পয়কর', 'তোহফা', 'সেকান্দর-নামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ১৬৬০ খৃঃ শাহ্ সুজা যখন মগ রাজা কর্তৃক সবংশে নিহত হন তখন কবির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। মীর্জা নামক জনৈক মন্দ স্বভাব লোকের ষড়যন্ত্রে কবিকে কিছুকাল কারাবাস ভোগ করতে হয়। পিতৃতুল্য মাগনের তিরোধানের কয়েক বছর পর থেকে তাঁর আশ্রয়দাতার অভাব ঘটেনি কখনো। তথাপি কবি জীবনে সুখী ছিলেন না। এদের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর কাছে ভিক্ষাতুল্য মনে হয়েছে। দীর্ঘজীবী কবি রোসাঙ্গেই দেহত্যাগ করেন, জোবরা গ্রামে নয়,

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে জনাব মাহবুবুল আলম স্থিরনিশ্চিত। সেকালের রোহাং বা রোসাঙ্গশহর চট্টগ্রামবাসীদের নিকট 'পাথুরে কিল্লা' নামে পরিচিত। রোসাঙ্গ নগরীর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে এই এলাকা। 'কেল্লার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান, এখানে আলাওলের কবর আছে এবং এখানকার সাতটি মসজিদের একটি নাম 'আলাওলের মসজিদ'। চট্টগ্রামে আলাওলের জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে জনাব আহমদ শরীফ বলেন— "চিরকাল চাটগাঁবাসীরা যে আলাওলের পুঁথির পাঠক ও ধারক, তা তাঁর চাটগাঁয় বাড়ি বলে নয়, চাটগাঁ আরাকান সংলগ্ন ও আরাকান অধিকারে ছিল বলে। ১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান ও গোটা চট্টগ্রাম নিয়েই ছিল রোসাঙ্গ রাজ্য।" কলকাতার সাহিত্যকে যেমন বাঙলা দেশের সাহিত্য বলা যায় ঠিক তেমনি একই যুক্তিতে রোসাঙ্গের সাহিত্যকেও চাটগাঁর সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায়।

এ পর্যন্ত মহাকবি আলাওলের চারখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ও একটি আংশিক কাব্য পাওয়া গেছে। 'সতী ময়না লোর চন্দ্রানী'র সমাপ্তি খন্ড আলাওলের রচনা, একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কাব্যগুলির নাম 'পদ্মাবতী', 'হফত পয়কর', 'তোহফা', 'সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল' ও 'সিকান্দর নামা'।

আলাওলের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদমাবৎ' নামক রূপক কাব্য অনুসরণে এ কাব্যটি রচিত। থদোমিন্তারের রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরে সম্ভবত ১৬৪৭ খৃঃ-এ আলাওল বন্দী হিসেবে রোসাঙ্গে আনীত হন, তখন কবি ৪২/৪৩ বছরের প্রৌঢ়। তিনি যখন ১৬৫১ খৃঃ-এ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ৪৬/৪৭ বছর। মাগন ঠাকুরের আজ্ঞা পেয়ে তিনি 'পদ্মাবতী' পুস্তক রচনা করেন। কাব্যখানি যে মুহম্মদ জায়সীর কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ, সে সম্পর্কে আলাওলের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি
স্থানে স্থানে প্রকাশিলুং নিজ মন উক্তি।"

আসলে কবি জায়সীর কাহিনীকে ইচ্ছা মতো ভেঙ্গে গড়েছেন। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর পদ্মিনী হরণের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে জায়সীর রূপক কাব্যটি রচিত। এই কাহিনী ভিত্তিহীন জনশ্রুতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাব্যের উপসংহারে জায়সী 'পদ্মাবতী' কাহিনীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটুকু নিজেই খোলাসা করে দিয়েছেন— "চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হচ্ছে মানবদেহ, রাজা রত্নসেন

www.pathagar.com

মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথনির্দেশকারী গুরু, রত্নসেনের প্রথমা পত্নী নাগমতী দুনিয়া-ধান্ধা, রাঘব চেতন শয়তান, আলাউদ্দিন সুলতান মায়া।" আলাওলের হাতে এই অধ্যাত্ম তত্ত্বের রূপক কাব্যটি একটি খাঁটি রোমান্সে পরিণত হয়েছে। মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখে কাব্যানুবাদ খুবই কঠিন কাজ; মহাকবি আলাওল এ কঠিন কাজে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন; বহুক্ষেত্রে তাঁর রচনা আন্তরিকতা, প্রাঞ্জলতা ও বলিষ্ঠতার গুণে মূলের সৌন্দর্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে কবি যে সুপন্ডিত, নানা শাস্ত্রে, নানা ভাষায় তাঁর জ্ঞান যে সুগভীর, তাঁর কাব্য পাঠকালে এ সত্যটি কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না, এই তাঁর রচনার দুর্বলতার দিক। অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের ভারে কাব্যরস অনেক সময় চাপা পড়ে গেছে এবং চিত্রগুলি ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে।

আলাওল ১৬৬০ খৃঃ-এ আরাকানের রাজসচিব ছৈয়দ মুহম্মদ মুসার আদেশে পারস্যের মহাকবি নিজামী গঞ্জাবীর 'হপ্ত পয়কর' নামক কাব্যের অনুবাদ করেন। 'হপ্ত পয়কর' নিজামী গঞ্জাবীর 'খামস' বা পঞ্চরত্ন কাব্যের অন্যতম। তাঁর পাঁচটি কাব্য হচ্ছে 'মখজানুশ আসরার', 'খশরু ও শিরি', 'লায়লী ও মজনু', 'হপ্ত পয়কর', ও 'সিকান্দর নামা।' 'হপ্ত পয়কর' সাতটি গল্প বা কাহিনীর সমষ্টি। নিজামীর অপর কাব্য 'সিকান্দর নামা', 'নবরাজ' উপাধিকারী মজলিস নামক রাজ অমাত্যের নির্দেশানুযায়ী অনুদিত। এ কাব্যের রচনা শুরু হয় আরাকান রাজকর্তৃক রাজা নিহত হওয়ার ১০/১১ বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে।

মাগন ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে আলাওল 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যটি কোনো এক ফারসী গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা শুরু করেন। ১৬৫৯ খৃঃ-এ শূজা আরাকানে আশ্রয় নেবার পূর্বেই মাগন ঠাকুর লোকান্তরিত হলে কবির উৎসাহ ভঙ্গ হয়। শূজা হত্যার প্রায় নয় বছর পরে সৈয়দ মুসার আদেশে আলাওল এ কাব্য সমাপ্ত করেন। সৈয়দ মুসা সিলেট থেকে আরাকানে এসে আরাকান রাজ্যের বন্ধুত্ব অর্জন করেন। পরী ও মানুষের প্রেম কাহিনী নিয়ে 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' নামক কাব্যটি রচিত। কাব্যটি প্রায় রূপকথা ধরনের। তবু আলাওলের রচনার গুনে এ কাব্য বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। আলাওলের বর্ণনা খুবই সুন্দর। তবু 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে এ কাব্য থেকে উৎকৃষ্টতরো।

'রতন-কলিকা আনন্দ বর্মা উপাখ্যান' কাজী দৌলতের (১৬২২-৩৮) অসমাপ্ত 'সতী ময়না লোর চন্দ্রানী' গ্রন্থের সমাপ্তি খন্ড। শ্রীমন্ত সোলায়মানের আদেশে মহাকবি আলাওল এ খণ্ডটি রচনা করেন। মূল কাব্যের সঙ্গে এ কাব্যটি রচনা ও পরিকল্পনার দিক

www.pathagar.com

দিয়ে ঠিক খাপ খায়নি, এর কারণ দু'জনের কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। সহজ কবিত্ব শক্তির বিচারে কাজি দৌলত আলাওল হতেও শ্রেষ্ঠ।

আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, ইসলামী ও হিন্দু শাস্ত্রে এবং সঙ্গীত ও যুদ্ধ বিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পারদর্শী, মহাকবি আলাওলের সমগ্র রচনায় যেমন বৈদগ্ধ্যের ছাপ অংকিত হয়েছে, তেমনি রাগ-তাল-সঙ্গীতের অধ্যাপনা ও খণ্ড কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও আলাওলের প্রতিভা ছিলো সৃজনধর্মী।

হপ্ত পয়করের পরেই আলাওল ফারসী কবি সুফী সাধক গদা শেখ দেহলভীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহফাতুল নেসায়েহ' বাংলায় তর্জমা করেন 'তোহফা' নামে। শেখ ইউসুফ তাঁর পুত্র আবুল ফতেহ্-এর শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে আরবী কেতাব অবলম্বনে ফারসী কাব্যটি রচনা করেন। আলাওল আবার এই ফারসী কাব্য বাঙলায় ভাষান্তরিত করেন। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী 'ফরজ, সুন্নত ও শিষ্টাচার' সম্বন্ধে আলোচনাই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বাঙলা ভাষায় মুসলিম ধর্মীয় কাব্যের ইতিহাসে এ কাব্যের ঐতিহাসিক ও আদর্শিক মূল্য সংশয়াতীত। চট্টগ্রামের কবি শেখ মুতালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৬৫১ খৃঃ-এ রচিত) এ দিক দিয়ে পথিকৃৎ এবং শ্রেষ্ঠতরো গ্রন্থও বটে। তোহ্ফা মধ্য যুগের বাঙলা কাব্যে আমাদের ধর্ম বিষয়ক দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

(ঙ) সপ্তদশ শতকের আরও কতিপয় কবি ঃ

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামে আরো কতিপয় কবির আবির্ভাব ঘটে, এঁদের মধ্যে মুহম্মদ ফসিহ্, মীর মুহম্মদ শফী, আশরাফ, পরাগল, আবদুল আলিম ও ছৈয়দ আইনুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের জন্ম ও নিবাসস্থান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না; তবে এরা যে চট্টগ্রামের কবি এ সম্পর্কে বোধহয় সন্দেহের তেমন অবকাশ নেই। এঁদের সব পুঁথি চট্টগ্রামেই পাওয়া গেছে।

মুহম্মদ 'ফসিহ'-র 'মুনাযাৎ' নামক একটি মাত্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুঁথিই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যটি বাংলা চৌতিশা জাতীয় রচনা। আসলে এটি আরবী ত্রিশ হরফের মুনাযাৎ।

"আরবীর এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার
মুনাযাৎ করিলাম গোচরে আল্লার॥
একেক অক্ষরে প্রতি চতুষ্পদ বন্ধে
মোহাম্মদ ফসীহে কহে পয়ার জে ছন্দে॥"

www.pathagar.com

প্রতি চারিটি চরণে আলিফ থেকে শুরু করে একেকটি আরবী হরফের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। প্রতি চারি চরণের আদিতে একেকটি আরবী হরফের বাঙলা প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে। 'হামদ' ও 'নাত' লিখিত হয়েছে 'মুনাযাতে'র শেষে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলছেন ঃ

"কোরানের মাঝে আছে তিরিশ হরফ
দেশী ভাষে করিলুং পঞ্চালী স্বরূপ।
এসব অক্ষর দেখি কোরান মাঝার
মোল্লা সবে করিলেক কিতাব সঞ্চার।
ফারছির মধ্যে দেখি পণ্ডিতেরগণ
বাঙ্গলার ভাষে তবে করিল রচন।
যার যেবা ইচ্ছামতে নানান প্রকারে
হিতবাক্য বুঝিবারে কহিছি পয়ারে॥"

একভাষা থেকে আরেক ভাষায় অক্ষর বা ধ্বনির প্রতিবর্ণায়ন আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আওতায় পড়ে। মুহাম্মদ ফসীহ-ই সর্বপ্রথম 'সজ্ঞানে আরবী হরফের বাঙলা প্রতিবর্ণায়নের রীতি অবলম্বন করেন।' এদিক দিয়ে কাব্যটির একটি বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। কবির জীবনকাল ১৬১০ খৃঃ হতে ১৬৮০ খৃঃ পর্যন্ত বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। অবশ্যি সাহিত্য বিশারদ তাঁকে আরো কিছুটা পরবর্তীকালের কবি বলে মনে করেন। তাঁর মতে 'মুনাযাতে'র রচনাকাল হচ্ছে ১৬৯৫ খৃঃ।

'মুনাযাৎ'টিতে একটি নিবেদিত-আত্মা মু'মিনের আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। আন্তরিকতার দিক দিয়ে মর্মস্পর্শী এই 'মুনাযাৎ'টি আজো পাঠকচিত্তে একটি ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। নমুনাস্বরূপ 'আলিফ' ও 'হামজা'কে আদ্যক্ষর করে রচিত চরণগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

আলিফ ঃ

'আলিফে আল্লার নাম মনে করি সার
আউয়ালে আখেরে প্রভু তুমি সে নিস্তার॥
অনাদি নিদান প্রভু নির্বলীর বল
অনাথের নাথ তুমি এ মহিমণ্ডল।"

www.pathagar.com

হাম্‌জা ঃ

'হা হা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান
হারাইলে তোমা নাম করাইবা স্মরণ।
হিন হই না রহিনু যেন পদতল
হইয়া মানবকূলে জনম বিফল।"

কবি মীর মুহম্মদ শফীর 'নূরনামা', 'নুরকন্দীল' ও 'সায়াৎনামা' নামক তিনখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। 'নূরনামা' ও 'নুরকন্দিল' একই পুঁথি বলে মনে হয়। কারণ দু'য়েরই ভাষা ও বিষয়বস্তু প্রায় এক। পুঁথিটির আসল নাম হচ্ছে নূরনামা। 'কান্দিল কথ জন'কে 'কান্দিল কথন' পাঠের ফলেই নাকি এই নাম বিভ্রাট ঘটেছে। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"পিতা মোর শাজাহান শহীদ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেশ॥
কহে মোহাম্মদ ছফি দিলে মনে তানে জপি
যার কর্মে দিষ্টি উত্তপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ শিরে বান্ধি তান পদ
পাইতে আছে নূরের দিদার॥"

কবির পীর 'হাজি মোহাম্মদ' আর 'নূরজামাল' কাব্য রচয়িতা হাজী মোহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০) একই ব্যক্তি হতে পারেন। কবির পিতা শাজাহান দরবেশ ছিলেন বলে জানা যায়। কাব্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবির উক্তি ঃ

আদি চন্দ কোথা হোতে হৈল উৎপন
নিজ চন্দ কোন্ স্থানে হৈল সৃজন॥
উনমত্ত চন্দ কেন হৈল কোথা হোন্তে
গরল চন্দ বোল জন্মিল কোথা হতে॥

(নূর-কন্দীল)

মুহম্মদী নূর কি করে সৃষ্টি হলো এবং তা' থেকে কি করে বিশ্বজগৎ, বেহেশ্‌ত-দোজখ পয়দা হলো, নূরনামায় তাই আলোচিত হয়েছে। প্রভুর সঙ্গে দর্শন কি করে

www.pathagar.com

পাওয়া যায়, সে প্রশ্নের জবাবে কবি সুফী পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ প্রভুর 'প্রেমভাবে মগ্ন মন'ই 'প্রেমের সমুদ্রে ডুবে' আল্লাহর দিদার লাভ করে ঃ

নবমে সমুদ্রে এশ্‌ক জানহ আপন।
এশ্‌ক অর্থ প্রভু প্রেম ভাবে মগ্ন মন॥
প্রেমের সমুদ্রে ডুবি করিলে বিচার।
অবশ্য প্রভুর সঙ্গে দর্শন তাহার॥

কাব্যটির স্থানে স্থানে নানা উপদেশও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'গুল-ই-বাকাউলি' রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম তার পূর্ববর্তী যে সব চট্টগ্রামী কবির নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'পরাগল' বলে এক কবিরও নাম আছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, কবি সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। পরাগলের একটিমাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে—তাও খণ্ডিত আকারে। মাত্র দুটি পৃষ্ঠা বিদ্যমান। পুঁথিটির নাম—'শাহ্ পরীর কেচ্ছা।' এটি মৌলিক রচনা নয়, নিজামীর ফারসী কাব্যের তর্জমা। একটি প্রেম কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত ঃ

"ফারসি কেতাবেত নিজামি রচিল
বএত ভাঙ্গি পরাগলে পয়ার করিল॥"

কবির ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল ঃ

"দেখিয়া কুমারের মুখ যেন রূপবান
জোড় হস্ত করি কৈন্যা আইল বিদ্যমান॥
*　　*　　*　　*
শাহা পরীর মুখ যদি কুমারে দেখিল
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে হাতে পাইল॥"

'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' নামক মহাভারতের এক অংশ বিশেষে তিনজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়—ষষ্ঠিবর, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগল খান। ভণিতায় যেখানে 'পরাগল খানে'র নাম আছে, সে অংশটি নিম্নরূপ ঃ

"অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥

www.pathagar.com

চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অন্যে অন্যে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥"

পরাগল খান সত্য সত্যই এ কাব্যের অংশবিশেষ রচনা করেছিলেন, না লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ এ নাম ভণিতায় ঢুকে পড়েছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। তা'ছাড়া পরাগল খান ও 'শাহ পরীর কেচ্ছার রচয়িতা' পরাগল একই ব্যক্তি কি-না, সে সম্পর্কেও শুধু অনুমানই করা চলে।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান কবি নিয়াজের তিনখানি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলির নাম—যোগ কলন্দর (?) বা নসিয়ত নামা, কায়দানি কিতাব, নূরজামাল। কবি নিয়াজের পুত্র আশরাফও ধর্ম উপদেশমূলক 'কিফায়তুল মুসল্লিন' ও 'মুহররমের নামাজ মাহাত্ম্য' নামক দু'টো কাব্য রচনা করেন। 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' নামক কাব্যের অন্যতম লেখক আবদুল আলিম (বা হালিম) সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। সাহিত্য—বিশারদের ধারণা তিনি সম্ভবতঃ কক্সবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের কতিপয় কবি

(ক) শেখ মনসুর

কবি শেখ মনসুরের দু'খানি কাব্যের প্রতিলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। 'সিরনামা' রচয়িতা সেখ মনসুর এবং 'আমীর-জঙ্গনামা'র কবি শেখ মনসুর অভিন্ন বলে মনে হয়। কবির পিতার নাম কাজী ঈশাখাঁ এবং পীরের নাম শাহ তাজদ্দিন। কবি নিজ পীরকে 'ছোলতান বংশের কান্তি' বলে বিশেষিত করেছেন, এতে কেউ কেউ অনুমান করেছেন তাজদ্দিন পীর মীর ছৈয়দ সুলতানের বংশধর হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর কাব্য 'সির নামার' রচনা কাল সম্পর্কে কবি বলেছেন ঃ

"যত হৈল মঘী সন লও পরিমানি
এক পরে শূন্য ছ'ও পাঁচ দিয়া গোনি।"

তাহলে 'সিরনামা' ১০৬৫ মঘীতে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি ছিলেন চট্টগ্রামেরই রাম্বু বা রামুর অধিবাসী— 'রোসাঙ্গে আছিল আসি রাম্বু কৈল বাদ।' 'সিরনামা' 'আসরারুল মসা' বা 'বীর্য রহস্য' নামক কোনো ফারসী গ্রন্থের বাংলা তর্জমা। আরবী ফারসী সাহিত্যের সেরা গ্রন্থগুলিকে বাঙলায় তর্জমা করে পাঠককে আমাদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সে যুগের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ব্যাপক ও গভীর উদ্যম দেখা যায় তা' থেকে এ যুগেও আমরা প্রেরণা পেতে পারি। 'সিরনামা' রচনার প্রারম্ভে কবি বলছেন ঃ

"বচন আরবী ভাষে সব শাস্ত্রমূল
বুঝিতে ফারসী ভাষে কিতাব বহুল
যত গুণিগণে সবে মনে প্রীতি ভাসি
আরবী ফারসী ভাষে দিলেক প্রকাশি

www.pathagar.com

বাঙ্গালে নবোঝে সব ফারসী কিতাব
নবোঝি কিতাব কথা মনে হয় তাব (তাপ)
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব
শুনিতে পার এ যদি যায় মনস্তাব॥
তেকাজে বাংলা ভাষে ফারসী জবান।
পদবন্ধি করি কৈলুং পুস্তক গ্রহণ॥"

কবি তাঁর তর্জমা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"আছারল মসা এক কিতাব উপাম
ছিরনামা রাখিলাম পুস্তকের নাম।"

আসলে কাব্যটি একটি 'দরবেশী পুঁথি।' বীর্য রহস্য এ কাব্যের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলেও এ কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি মা'রফতের গূঢ়তত্ত্বেরও আলোচনা করেছেন, তাতে কাব্যটি বীর্য রহস্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক সুগভীর তত্ত্বরসেরও আধার হয়ে উঠেছে। পুঁথিটি কয়েকটি ফসল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে 'দরবেশী কথন' দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'এবাদত'। তৃতীয় অধ্যায়ে 'তনের বিচার', চতুর্থ অধ্যায়ে 'রাবির বয়ান', পঞ্চম অধ্যায়ে 'দিলের বিচার' ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'রাবির কথন', সপ্তম অধ্যায়ে 'ঋতুর কথন', অষ্টম অধ্যায়ে 'আরোয়ার বাণী' এবং নবম অধ্যায়ে 'নিরঞ্জনের কথা' আছে।

অষ্টম অধ্যায়ে 'আরুহার' (আরোয়া) বাণী বিবৃত হয়েছে; "প্রাণেরে আরোয়া বোলে আরবী ভাষাএ।"

আরোয়ার চারিটি নামঃ

"(১) 'নাতকি' আরোয়া বৈসে মনুষ্য তনএ
বচন কন যত কহিলে বোজএ॥

(২) 'ছামি' নামে পশুপক্ষী আত্তমা (আত্মায়) বৈসএ
কহিতে না পারে ফিরি বচন নিশ্চয়॥

(৩) 'জিসিম' আরোয়া বৈসে যত বৃক্ষ তরু
তৃনলতা আদি আর সুগন্ধ সুচারু॥

(৪) ন্মাসি নামে আরোয়া বৈসএ পাথরএ
মণিমুক্ত আদি যত দানা কঙ্কর হএ॥"

www.pathagar.com

এইরূপে মনুষ্য শরীরে, পশুপক্ষীতে, বৃক্ষলতায় ও প্রস্তরদিতে বিভিন্নরূপে আরোয়া বা প্রাণ— .

"ব্যাপিত হই মিশিয়া আছএ,
পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমত নিশ্চয়।
গোঠের অন্তরে দুগ্ধ আছএ যেমত
তেন মতে প্রাণী আছে শরীরে গোপত॥
দুগ্ধ হন্তে দধি হএ দধি হন্তে লনি (ননী)
তেমত রহিয়া আছে শরীরেও প্রাণী॥

শুধু মনুষ্যদেহ এবং পশুপক্ষীতেই নয়, বৃক্ষলতা ও প্রস্তরাদিরও প্রাণ আছে এ উক্তি শুধু আত্মিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বৈজ্ঞানিক দিয়েও বিপ্লবাত্মক। কবির দুশো বছর পরে, বৈজ্ঞানিক জগদীশ বাবু প্রমাণ করেছেন বৃক্ষলতার প্রাণ আছে এবং অতি সম্প্রতি পদার্থ বিজ্ঞান বলছে—জড় পদার্থ বলে কিছু নেই। সব কিছুর মূলে আছে শক্তি বা এনার্জি। জড় পদার্থে বৃক্ষ লতায় প্রাণ সুপ্ত আছে—'পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমত নিশ্চয়'— একটি মাত্র প্রতীকের সাহায্যে কবি এখানে একটি দুরূহ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে যে অব্যর্থরূপ দিয়েছেন তা যথার্থ কবিত্ব শক্তির অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব।

নবম অধ্যায়ে 'নিরঞ্জনের' সির্ বা রহস্য আছে, কবি শুধু এর উল্লেখ করেই বিদায় নিয়েছেন; কারণ নিরঞ্জনের রহস্য ফাঁস করে দিলে, কাজীর দল ক্ষেপে উঠে, "প্রাণ করে নাশ।" তাই নিরঞ্জনের রহস্য "প্রচারিতে দোষ অতি গোপত কথন।"

"প্রচারিলে দুষিবেক যত গুণিগণ
ছোট হই বড় বাক্য কহে যেই জন॥
তেকারণে না কহিনু ছিরি নিরঞ্জন
সকলে বোলএ তারে গর্বিতা বচন॥
উত্তমে করিলে দোষ সবে মানি লএ
হীন কৈলে নিন্দা মনে সকলে দোষএ॥
তেকারণে প্রচার না কৈলুঁ হিন্দুআনি
মুর্শিদ ভজিয়া লও হই কানাকানি॥

নিরঞ্জনের রহস্য মুর্শিদের কাছ থেকেই জানতে হবে, এই হচ্ছে কবির শেষ কথা।

www.pathagar.com

কবির অপর গ্রন্থ "আমীর জঙ্গনামায়" ইমাম হাসান হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা "আমির মুহম্মদ হানিফার বিজয় কাহিনী' বর্ণিত হয়েছে। মদিনা ও দামেস্কে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে 'আমীর মোহাম্মদ হানিফা জয়ী হন এবং এজিদকে বধ করে ইমাম হাসান হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই প্রকান্ড পুঁথি খানির প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দামেস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির ভণিতায় আছেঃ

(ক) "শেখ মনসুরে কহে অর অবধান।
আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥ "

(খ) "কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার।
শুনি গুনিগণ মন হরিষ অপার॥"

কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ নিম্নরূপঃ

"প্রথমে প্রণাম করি এক করতার
দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুল আল্লার।
তৃতীয়ে প্রণাম করি আছবাব (আসহাব) গণ
চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ।
হাছন হোছেন দুই হৈল স্বর্গ গতি
মহম্মদ হানিফার জঙ্গের আরতি
মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুমার
দিমিস্কের যুদ্ধে যায় আলীর কুমার।"

এই পুঁথিটির বিষয় বস্তু হচ্ছে যুদ্ধ বর্ণনা। তবে অবান্তর কথা এবং অপ্রাসঙ্গিক উক্তি রয়েছে দেদার। অনেক আরবী-ফারসী শব্দের সুন্দর প্রয়োগ কাব্যটির সুষমা ও স্বকীয়তা বৃদ্ধি করেছে। ভাষায় কবির দখল লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টান্তরূপ নিম্নের উদ্ধৃতিটি বিবেচ্যঃ

"সংসার বসতি জান নিশির স্বপন
মায়াজাল বন্দী বাজী দেখহ আপন॥"
* * * *
"মৃত্তিকায় কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই যে পাগল॥

www.pathagar.com

দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার
ভাগ্য হৈলে রাখে নিয়া ভিহিস্ত মাঝার॥
মনুষ্যের আয়ু যেন শিশিরের পানি
যমরাজার কাছে জান জল ভান্ড খানি॥
শিশিরের জলশেষে যেহেন ভাস্করে
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে॥"

শিশিরের পানির মতো মানুষের পরমায়ু; সূর্যের খরতাপে যেমন শিশিরের পানি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি যম বা আজরাইলও মানুষের ভেতরে থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের পরমায়ু শুষে নিচ্ছে—মানুষের জীবনের এই পরিণতিকে কবি অতি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত করেছেন, উপরোক্ত ছত্র কয়টিতে। মৃত্যুর লক্ষণ বর্ণনায় কবির বর্ণনা আরো অব্যর্থঃ

"দুই চন্দ্র গননেত ন পাইব দেখা
সঙ্গে আছে দুই পক্ষী ভাঙ্গে তার পাখা॥
সহস্র কমলদল শুখাইব সকল
ভ্রমরা উড়িয়ে যাইব ছাড়িয়া কমল॥ "

(খ) মুহম্মদ মুকীম

'গুল-ই-বকাউলি' নামক সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ মুকীম অষ্টাদশ শতকের মুসলমান কবিদের অন্যতম। কবির পূর্বপুরুষেরা ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামে বাস করতেন। কবির কোনো পূর্বপুরুষ পরবর্তীকালে রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে বসতি-স্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি নিম্নরূপঃ

"মুকিম মোহোর নাম জ্ঞানহীন অতি
চাটিগ্রাম রাজ্যে জান আমার বসতি
জন্মভূমি নোয়াপাড়া গ্রাম মনোহর
কুলশীল নরগণ সাধু সদাগর।
নোয়াপাড়া নাম জান নবীন সদায়
নব সুখ, নব ভোগ, নব যুবরায়॥"

www.pathagar.com

কবি মুকিম নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন রাউজানের জমিদার হারিস মিঞা চৌধুরীর পিতা আলী আকবর চৌধুরীর গোমস্তা। কবি তাঁর কাব্যে যে বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে কবির পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বহু কবির নাম যেমন উল্লেখিত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর নিজ পূর্ব-পুরুষের বিস্তৃত বিবরণও রয়েছে। আদিতে কবির পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন নোয়াখালি জেলার ফেণীর বাসিন্দা, সেখান থেকে তাঁরা আসেন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামে; আজিমপুর থেকে রাউজান থানার 'নোয়াপাড়ায়।' কবি যখন আলী আকবর চৌধুরীর গোমস্তা হিসেবে কাজ করছিলেন, সেই সময়েই দেয়াঙ্গের শাহ্ আস্হাবুদ্দীনের সংগে তাঁর পরিচয়; তাঁরই নির্দেশে তিনি "নর-পরী প্রসঙ্গ এক ফারসি কিতাব" 'তাজল বকাউলি' বাংলায় তর্জমা করেন। মুকিমের পূর্বে, এই কাব্যের বাঙ্লা তর্জমা করেছিলেন চট্টগ্রামের কবি নওয়াজিশ খান এ কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

তাজুল মুল্লুকের সঙ্গে বকাউলির প্রেম এবং নানা রকমের দুর্লংঘ্য ও ভয়াবহ বাধা অতিক্রম করে বকাউলির সংগে মিলন কাহিনীই কাব্যের বিষয়বস্তু।

কবির এই কাব্য যেমন নানা ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ, তেমনি এ কাব্য কবির পান্ডিত্যেরও স্বাক্ষর। ভাবানুবাদের মধ্যে, কবির নিজের স্বাধীন রচনারও সহজেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ছন্দশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীত শাস্ত্র, এবং মুসলিম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কবির জ্ঞান যে প্রচুর ছিল তার প্রমাণ 'গুল-ই-বকাউলি' কাব্যে এ সবের দেদার প্রয়োগ। ডঃ হকের মতে পান্ডিত্যে একমাত্র আলাওলের সংগেই মুকিমের তুলনা চলে। কাব্যটির বন্দনা অংশে,— "হাম্‌দ, নাত্ আস্হাব, চারিপীর, বারো ঈমান, চৌদ্দ খান্দান, সপ্ত আকাশ, সপ্তভূমি, সাত সমুদ্র, সপ্তদীপ ও পর্বত ও সপ্তরাজ সিংহাসনে"র বর্ণনা আছে। রাজ সিংহাসনের বর্ণনায় আওরঙ্গযেবের সিংহাসন প্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যের এক জায়গায় চট্টগামের বর্ণনা প্রসংগে কবি বল্‌ছেনঃ

'চিরদিন ইংরাজ এথা মহীপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল॥ "

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এ কাব্যটি রচিত হয়ে থাকবে, তা' 'ফায়দুল মুক্‌তদী'র তারিখ থেকে অনুমান করা যায়। কবির অন্যতম গ্রন্থ 'ফায়দুল মুক্‌তদী'তে 'কালা-কাম, 'মৃগাবতী' ও 'আয়ুব-নবীর কিস্‌সা' নামক কবির আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে;—কিন্তু এ কাব্যগুলির কোনো পান্ডুলিপি আজো আবিষ্কৃত হয়নি। 'ফায়দুল মুক্‌তদী' ধর্মীয় কাব্য এ কাব্য রচনার তারিখ 'ঋতুবেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।—মঘী সন;— অর্থাৎ ১১৩৫ মঘী বা ১৭৭৩ খৃঃ এ কাব্যটি রচিত হয়।

www.pathagar.com

(গ) শেখ সেররাজ চৌধুরী

কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরীকে ডঃ এনামুল হক ত্রিপুরার কবি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পুঁথিগুলি ত্রিপুরা থেকে পাওয়া গেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মরহুম সাহিত্য বিশারদ তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে মনে করেন। তিনি ১৭শ শতকের শেষভাগে অথবা ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর পুঁথিগুলির প্রতিলিপি চট্টগ্রামেই পাওয়া গেছে।

কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরী তিনটি কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যগুলির নাম— 'ফক্করনামা' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল', 'কাসিমের লড়াই' ও 'ফাতিমার সুরত্‌নামা।'

"বদিয়ুদ্দিন জান পীরের জে নাম।
*　　*　　*　　*
আদ্যন্ত গুরু প্রণামিএ শরীফ হাছন।"

অর্থাৎ কবির মুর্শিদ হচ্ছেন বদিয়ুদ্দিন এবং ওস্তাদ শরীফ হাসান। সৈয়দ বায়েজিদের নির্দেশে, বংগ ভাষাভাষিদের সুবিধার জন্য তিনি ফারসি থেকে কাব্যটি বাংলায় তর্জমা করেনঃ

"ফক্কার নামা করি এক আছএ কিতাপ।
কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব॥
সকলে না বুজে দেখি ফারসি বচন।
কহিমু বাঙলা ভাসে বুজিতে কারণ॥"

শেখ শাদী নামক ত্রিপুরার এক কবিও 'গদা মল্লিকা' নামক এক কাব্য রচনা করেন। ডঃ হকের মতে এ কাব্য সেরবাজের 'ফক্করনামা'র অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

রুম রাজকন্যা মল্লিকা—

"বুজিতে ন পারে কেহো রহিছে কুমার।
চল্লিশ বৎসরে বিভা ন হইল বালার॥
কুল শীল হৈলে হএ পন্ডিত কুমার।
এ মত পুরুষ জান যোগ্য হএ তান॥"

www.pathagar.com

মল্লিকা ঘোষণা করেঃ যে তার হাজার সওয়ালের জবাব দিতে পারবে তাকেই সে স্বামীত্বে বরণ করে নেবে। তুরুক দেশ থেকে আব্দুল্লাহ্ ফক্কর নামে এক তরুণ আসে এবং হাজার সওয়ালের জওয়াব দেয়। অতঃপর তাদের দু'জনের বিয়ে হয়। প্রশ্নোত্তর গুলির বেশীর বাগই হেঁয়ালীপূর্ণ; যেন একেকটা ধাঁ ধাঁ। কিন্তু, প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যেই একেকটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা লুক্কায়িত আছে; কাব্যটি উদ্দেশ্য মূলক; গল্প বলার সুযোগে তত্ত্বপ্রচার-ই কাব্যের লক্ষ্য।

নিম্নে একটা সওয়াল ও তার জবাব উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

"লাগিলা পুছিতে পুনি আর যে সওয়াল
পুনি পুনি পুছিলা বালা আব্দুল্লাহ্‌র ঠাঁই।
কোন্ মোকামে তুহ্মি আছহ বেরাই॥
আব্দুল্লাএ বোলে ইচ্ছা যথাতে আহ্মার
লাহুত মোকামে জানি বেরানি আহ্মার॥"

আব্দুল্লাহ্ আরেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে নিম্নলিখিত ভাবেঃ

"আব্দুল্লাহ্ এ বোলে সুন রুম নৃপবর।
সংসারে ন আটে আল্লা অধিক ডাঙ্গর।
যদি সংসারে আল্লা কোথা ন আটএ।
মুণিগণ দিলে তাজ থাকএ নিশ্চএ॥"

'কাসেমের লড়াই'-তে কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীর একটা অংশ বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) রামজীবন বিদ্যাভূষণ

কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কবি ছিলেন বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রামের বাসিন্দা-সাহিত্য বিশারদ এই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর দুটি কাব্যের কোনোটিতেই তাঁর গ্রামের উল্লেখ নেই। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম আর খুল্লতাত হচ্ছেন নারায়ণ। তাঁর কাব্য দুটি হচ্ছে—"মনসা মঙ্গল" ও "আদিত্য চরিত" বা সূর্যমঙ্গল পাঁচালী।

www.pathagar.com

মনসা মঙ্গলের রচনাকাল কবির ভাষায়—

"সরকার ঋতু বিধু শক নিজোজিত
মনসামঙ্গল রাম জীবন চরিত।"

আর 'আদিত্য চরিত' বা 'সূর্যমঙ্গল পাঁচালীর' রচনা কাল 'ইন্দু রাম, ঋতু, বিধু, শকাব্দ।' অর্থাৎ , মনসামঙ্গল রচিত হয় ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩—৪ খৃঃ-এ। আর 'আদিত্য চরিত' রচিত হয় ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯-১০ খৃঃ-এ।

সুপন্ডিত রামজীবনের ভাষা সংস্কৃত বহুল ও প্রাঞ্জল। তিনি সু-রসিক এবং সংযমী লেখক। বহু প্রাচীন শব্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে রক্ষিত হয়েছে। তাঁর 'মনসা মঙ্গল' বিদ্যাভূষণী মনসা' নামে পরিচিত । কব্যিটি পরবর্তী 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যগুলির বৈশিষ্টহীন রীতিতে রচিত। মনসা-মঙ্গলে কবির আত্ম-পরিচয় নিম্নরূপঃ

"অল্পবয়স মোর দ্বিজকুলজাত।
পন্ডিত না হম মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেয়া দিছে উড়প লইয়া॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
করজোরে তান পদে করম বন্দন॥"

অধিকাংশ মৌলিক ব্রতকথা বা পাঁচালী কাব্যের মতোই 'আদিত্য চরিত' বা 'সূর্য পাঁচালী' কাহিনীও উপকথামূলক; রামজীবন বলেনঃ

"গুরুজন মুখে শুনে কথার শিকলি
সূর্যদেব অনুসারে রচিনু পাঁচালী॥
পূর্বেত আছিল এই ব্রতের যে কথা
পরম হরিষে কৈনু প্রকাশ কবিতা॥"

কাহিনীর নায়ক একজন দরিদ্র বিপত্নীক ব্রাহ্মণ; তার দু'কন্যা রুমুনা ও ঝুমুনা সূর্য পূজা করে পিতার সংসারে ধনৈশ্বর্য ও শ্রী নিয়ে আসে। ভাগ্যক্রমে সেই ব্রাহ্মণ এক

www.pathagar.com

রাজকন্যাকে বিয়ে করে। এই রাজকন্যা সূর্যদেবের ঘোর বিরোধী। তার-ই প্ররোচনায় রুমুনা ও ঝুমুনা ঘুমন্ত অবস্থায় বনে পরিত্যক্ত হয়।

এদের জীবনের নানা ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে, সূর্য-বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করে, সূর্যদেবের পূজা প্রতিষ্ঠাই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য॥

(ঙ) ভবানীশঙ্কর দাস

ভবানীশঙ্করের কাব্যটি 'জাগরণের কাব্য' ও 'চন্ডীমন্ডল গীত'—উভয় নামে পরিচিত। কবির কাব্য রচনার কালঃ

"ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে
ভবানী শংকর দাসে পঞ্চালিকা ভণে॥"

এ থেকে জানা যায়, কবি তাঁর পুঁথিটি ১৭১১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খৃঃ এ রচনা করেন। কবির আত্ম পরিচয় প্রসংগ থেকে জানা যায়, তিনি আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব।' কবির পূর্ব পুরুষ নরদাসের বংশধর কৃষ্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ চট্টগ্রামের দেবগ্রামের অন্তর্গত বটতলী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের মধুসূদনই হচ্ছে কবির পিতামহ। তিনি বটতলী থেকে চক্রশালার 'ছনহারা' গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। কবির পিতার নাম শ্রীমন্ত। কবির বংশধরেরা এখনো এই গ্রামে বাস করছেন।

ভবানী শঙ্করের কাব্যখানি আকারে বৃহৎ। তাঁর উপর ভারতচন্দ্রে কোনো প্রভাব দেখা যায় না। মনে হয় তিনি দ্বিজ মাধবের কাব্য থেকেই কাহিনীর মূল অংশ গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপন্ডিত কবি "কিছুমাত্র কান্ড-জ্ঞানের" পরিচয় দিতে পারেন নি। বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সংগে তৎসম শব্দের সন্ধি ভবানী শংকরের রচনাকে বিকট করেছে। যেমন—"শৃনুধ্বং সাধব সব কর অবধান', 'যা হোন্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুতধাতা,' 'বন্দমাম্বিকারাজ্ঞিতে লোটাই বিশেষ।' 'ধন দেখি আশু মূল্য দদস্ব আন্মারে।'—ইত্যাদি।" (সুকুঃ সেন)।

কাব্যের মধ্যে "ঘোষা" নামে অনেকগুলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ও ভক্তিমূলক পদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলিতেই তাঁর কিছু কিছু কবিত্ব-শক্তির প্রমাণ মেলে।

www.pathagar.com

(চ) মুহম্মদ রজা

কবি মুহম্মদ রজার দু'খানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যগুলির নাম—'তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিল্লাল' এবং 'মিসরী জমাল।' কবি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার বখ্‌তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামে আজো কবির বংশধরেরা বসবাস করছেন। এঁরা বংশপরম্পরায় যে 'বংশলতিকা রক্ষা করে আস্‌ছেন, তা' থেকে জানা যায় কবি জন্মগ্রহণ করেন ১৬৯১ খৃঃ-এ এবং ইন্তেকাল করেন ১৭৬৭ খৃঃ-এ।

'তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিল্লাল' একটি প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্য। এককালে বটতলার প্রকাশকদের কল্যাণে পুঁথিটি ছাপা হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। 'তমীম গোলাল ও চতুর্থ ছিল্লাল' একে অন্যকে স্বপ্নে দেখে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের আগেই পরস্পরের প্রতি আশিক হয়ে পড়ে। তমীম গোলাল হচ্ছে শিমালের বাদ্‌শাহ্‌ ইউসুফ জালালের পুত্র, এবং চতুর্থ ছিল্লাল' শিরাজের শা'জাদী। স্বপ্নে গন্ধর্ব মতে বিয়ে হয়ে গেলেও তাদের মিলনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলো না। পূর্ণযৌবনা কন্যার মতি-গতিতে পরিবর্তন দেখে শিরাজের বাদ্‌শাহ্‌ কন্যার বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। সেখানে 'তমীম গোলাল'ও হাজির হয় এবং পাঁচটি শর্ত পূরণ করে 'চতুর্থ ছিল্লাল'কে বিয়ে করতে সমর্থ হয়।

কবির ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গী সুন্দর ও সহক কবিত্বমন্ডিত। যেমনঃ

"শিরাজ নৃপতি পদে করে নিবেদন
দেশের মেলানি মাগে ইছুফ নন্দন
দেশত যাইতে বাপু দাও অনুমতি
দেও রথে আরোহিআ করিবাম গতি
নৃপতি বোলোএ মোর বুকে ছেল হানি
দেশে গিয়া দেখ তোমার দুর্লভ জননী।"

রূপ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্তঃ

"হেরিতে-কৈন্যার রূপ ছন্ন হৈল আঁখি।
পলক না মারে কেহ সেইরূপ দেখি।
"মৃগেন্দ্রনয়ানী বালা রস কুমুদিনী।
মুখেতে অমৃতবাণী সেই কমলিনী॥

www.pathagar.com

দশন মুকুতা পাঁতি জ্বলে যেন মণি।
হাসিতে ঝলকে মুতি কামেতে কামিনী॥"

'মিছিরী জামাল'ও একটি প্রণয়োপাখ্যান। 'কুর্বার শহরে'র শাহা আব্দুল করিম ও তাঁর 'বণিতা' সুন্দরী নাছিরার 'ভুবন মোহিনী অতিগুণমণি' নন্দিনী 'মিছিরি' জামালের প্রণয়কাহিনীই এ কাব্যের উপজীব্য।

(ছ) আলী রজা

সাধক কবি আলী রজার জনপ্রিয় নাম কানু ফকির। তিনিও চট্টগ্রামের কবি। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে কবি আলী রজা জন্মগ্রহণ করেন আনোয়ারা থানার অন্তর্গত 'ওস্‌খাইন' নামক গ্রামে। এই গ্রামে তাঁর যে বংশধরেরা আজো বসবাস করছেন। তাঁদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে কবি ১৭৮০ খৃঃএ প্রায় নব্বই বছর বয়সে ইন্‌তেকাল করেন। তিনি একাধারে সাধক, পীর ও কবি ছিলেন। তাঁর মুরশিদ ছিলেন কেয়ামউদ্দিন।

"শাহা কেয়ামউদ্দিন গুরু সর্বলক্ষ্য সার
হিন আলী রজা কহে আগম সবার।"

* * * *

"শাহা কেয়ামউদ্দিন গুরু হৃদয় কলিকা
আগমেত পূর্ণ করি নিগমে সাধিকা॥"

আলী রজার রচিত কাব্যগুলির নাম— আগম, জ্ঞানসাগর, ধ্যানমাশা, যোগকলন্দর, ষটচক্র ভেদ, ও সিরাজকুলুব। এ ছাড়া বহু গান এবং পদাবলী কবিতার রীতিতে বহু গীতি-কবিতাও তিনি রচনা করেন। তাঁর কাব্য মূখ্যতঃ তত্ত্বও অধ্যাত্মমূলক, সূফীবাদ ও যোগশাস্ত্রের সমন্বয়ে তিনি নিজস্ব এক অধ্যাত্মতত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন; সমকালীন বহু লোক তাঁর শিষত্ব গ্রহণ করে।

সাহিত্য বিশারদ জনাব আবদুল করিম আলী রজার 'জ্ঞানসাগর' নামক গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন; এ গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সুখ-দুঃখে অবিচলিত থাকার যে দর্শন এ কাব্যে প্রচারিত হয়েছে তা' জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলার খুবই সহায়ক।

www.pathagar.com

"দুক্ষ পাই সুখ না মাগিব প্রভুস্থানে
এক চিত্তে ঈশ্বর স্মরিব মনে মনে॥
দুখের সুখের দিকে মন না রাখিব
সনা (দা?) এ ঈশ্বর নাম স্মরণ করিব॥"

'জ্ঞান-সাগরে'র আলোচ্য বিষয়ের ইংগিত গ্রন্থের সূচনাতেই রয়েছেঃ

"জিজ্ঞাসিল শাহ্ আলী রসুলের পাশ।
কি কর্ম করিলে হৃদ্ হইব প্রকাশ॥
কি কর্ম করিলে হএ চিত্ত অন্ধকার।
এই কর্ম ভগ্ন করি কহ নবিবর॥"

'সিরাজ কুলুব'কে ইসলামী ধর্ম-বিজ্ঞান মূলক কাব্য বলা যেতে পারে। পৃথিবীর অবস্থান, বেহেশ্তের সংখ্যা, আল্লাহ্ কোনদিন পৃথিবী সৃষ্টি করেন, কেয়ামৎকালে এবং তার পরে কি হবে—এই সব বিষয় এ কাব্যের আলোচ্য বস্তু।

কবির প্রেমতত্ত্বমূলক একটি কবিতায় অতি চমৎকারভাবে সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী আল্লাহ্-প্রেমের অসীমতা বর্ণিত হয়েছেঃ

"দারুন অনলপ্রেমে ঠাকুরের তনু ঘামে
ত্রিভুবন পুড়ি করে ছার।
মহারত্ন প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্বজগত যাহে অধিকার।
যে রাখে পীরিতি সার ত্রিলোক নিছনি তার
কান্ত সোহাগী সে সফল।
যে জন পীরিতি ছাড়া সে জন জীয়ন্তে মরা
আদি অন্ত নাই তার ফল॥ "

(জ) মুহম্মদ আলী

'হয়রতুল-ফিক্হ' নামক ফেকা শাস্ত্রমূলক গ্রন্থের লেখক কবি মুহম্মদ আলী। তাঁর কাব্যের আত্ম-পরিচয় অংশে চট্টগ্রামের কবি মুকিমের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যে

www.pathagar.com

রচনার তারিখ উল্লেখিত না হলেও শুধু উপরোক্ত প্রমাণের বলেই তাঁকে অষ্টাদশ শতকের কবি বলে ধরা যায়— এ মত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন।

কবি তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

'চাটিগ্রাম শুদ্ধ স্থান
ইসলাম আবাদ বুলি কহে।
তাহার উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ
আজিম নগর নাম হএ।
আর এক আছে নাম ইদিলপুর অনুমান
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান।

সেই দেশে ঃ

বহুলোক জ্ঞানবন্ত পান্ডিত্যের নাহি অন্ত
মুকিম পন্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ।"

চট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদের আজমনগর চাকলাধীন ইদিলপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন কবি। এখানে বহু পন্ডিতের বাস ছিলো; কবির সমসাময়িক মুকিম পন্ডিত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত। কবি খুব সম্ভব লেলাঙ্গ বা রোসাঙ্গ গিয়েছিলেন, সেখানকার "শুদ্ধ পবিত্র কলেবর" ইউসুফ হাফেজ

'কৃপা করি কহিল বচন।
তুমিত পন্ডিত হও কিতাব বাঙ্গালা কহ
পদবন্ধ করিয়া রচন।'

এঁর আদেশেই কবি 'হয়রতুল ফেক্‌হ বা 'শাস্ত্র পন্ডিতের সংকট' নামক ফারসী কাব্যের বাংলা তর্জমা করেন। পুঁথিটি আরবী হরফে লেখা। এতে এমন সব সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে যা, শাস্ত্র পন্ডিতদের জন্য সত্যই ভীতিজনক। কাব্যটি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা উল্লেখ করা যেতে পারেঃ শত্রুরা এক মুসলমানকে বন্দী করে রেখে—

"অন্নজল ভক্ষ দ্রব্য না দেয় ভক্ষিবার।
দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহার॥

www.pathagar.com

রান্ধিয়া শূকর মাংস সম্মুখে আনিয়া।
খাইতে করে যে আজ্ঞা তাড়িয়া তাড়িয়া॥
পদুত্তর কহ কি ভক্ষিব না ভক্ষিব।
অনাহারে বন্দীতে কি রূপে রহিব॥"

সমাধান হোলোঃ

খাইতে খাইয়া প্রাণ রাখিব তাহার।
না খাইয়া মুক্ত নহে মৃত্যু হইবার॥

কবির আর দু'খানি কাব্য হচ্ছে—"শাহা পরী মল্লিকজাদা" এবং "হাসান বানু।" দুটিই প্রণয়োপাখ্যান মূলক কাব্য। শেষোক্ত কাব্যটির মাত্র দুটি পাতা পাওয়া গেছে। এটি 'হাতেম তাই' কাহিনীর অংশবিশেষ বলে মনে হয়।

(ঝ) ছৈয়দ নূরুদ্দিন

ছৈয়দ নূরুদ্দিন অষ্টাদশ শতকের একজন শক্তিশালী কবি ঃ পন্ডিত্য ও তাসাউফের জ্ঞানের দিক দিয়ে যে তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ— তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দকায়িকুল হকায়িক'-এর বহু প্রতিলিপি চাট্‌গাঁয় পাওয়া গেছে। আরবী এবং বাঙলা— উভয় হরফেই তাঁর গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। আরবী ফারসী ভাষায় নূরুদ্দিনের পান্ডিত্য ছিলো অগাধ; এই সব গ্রন্থ মন্থন করে তিনি এগুলিরই ভিত্তিতে তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলি প্রধানত. ধর্মীয় গ্রন্থ।

এ পর্যন্ত নূরুদ্দিনের 'দকায়িকুল হকায়িক,' 'কেয়ামত নামা' বা 'রাহাতুল কুলুব', 'মুসার সওয়াল' ও 'বুরহানুল আরেফিন' বা হিতোপদেশ নামক চারখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। 'দকায়িকুল হকায়িক' নামক গ্রন্থে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য আচরণীয় ধর্মীয় বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'কেয়ামতনামা' থেকে জানা যায়, কবি ১৭৯০ খৃঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

"সৈয়দ নূরুদ্দিনে কএ আজিজ নন্দন
বিরচি কহিএ আমি সুন গুণিগণ।
এগারশ সাতান্নব্বই সন হইল যবে
পুস্তক বাঙ্গালা কৈল সুন নর সবে।" (কেয়ামত নামা)

www.pathagar.com

বাঙ্গালা ১১৯৭ সন 'দকায়িকে'র রচনার তারিখ, না 'কেয়ামত নামা'র রচনার তারিখ—তা' বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর হিতোপদেশ রচনার তারিখ নিম্নে পাওয়া যাচ্ছেঃ

"বারশ' তিন সনে পুস্তক লেখা যায়
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জর্ম্মিব সভাএ
'বোরহানুল আরেফিন' কিতাব দেখিয়া
কহিলুম হিত উপ বাঙ্গালা রচিয়া"

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'বুরহানুল আরেফিন' দেখে যে কাব্য (হিতোপদেশ) তিনি রচনা করেন, তার তারিখ হচ্ছে বাঙ্‌লা ১২০৩ সন। কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে মনে করা হয়।

২২ টি বাব বা অধ্যায়ে বিভিক্ত বিরাট গ্রন্থ 'দকায়িক,' ইমাম হাফিজুদ্দীন নফ্‌সী রচিত 'কনৃজুদ্-দকায়িক' নামক আরবী ফিকাহ্ শাস্ত্রমূলক গ্রন্থের তর্জমা। 'দকায়িকে'র প্রথম 'বাব্'-এ মৃত্যুর বর্ণনা মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ করে তোলেঃ

"কহি প্রথম বাব্ সুন মন দিয়া।
যে রূপে রাখিলা প্রভু মওত সৃজিআ॥
ভিন্ন এক স্থানে নিয়া বান্ধিয়া রাখিলা।
মনুষ্য মওত মধ্যে ছানি দিয়া থুইল॥
দশলক্ষ প্রাচীর বান্ধিয়া একঘর।
মৃত্যুকে রাখিলা নিয়া সেঘর অন্তর॥"

হযরত মূসা কুহিতুরে আল্লাহর দিদার লাভ করেছিলেন। তখন মূসার সওয়ালের জবাবে আল্লাহ্‌তালা "জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বকথা" প্রকাশ করেন, 'মূসার সওয়াল' নামক ক্ষুদ্র কাব্যটিতে তাই বিবৃত হয়েছে।

'রাহাতুল কুলুব বা কেয়ামতনামা'ও ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এক বিরাট গ্রন্থ। এটিও ধর্মবিষয়ক পুঁথি। বহু আরবী ফারসী গ্রন্থ মন্থন করে কবি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থেরঃ

"প্রথম বাবেত জান কেয়ামতের বাণী।
দ্বিতীয় বাবেত কেয়ামতের ভয়-ভীতি কথা।

www.pathagar.com

তৃতীয় বাবেত দোজখের কথা।
চতুর্থ বাবেত কহি বিহিস্তের বাণী।
পঞ্চম বাবেত কহি মাতা-পিতার কথা।
ষষ্ঠ বাবেত জান রেবা-খোর কথা।
সপ্ত বাবেত কহি রোজা নামাজের কথা।
অষ্টম বাবেত সুরা মানা করিয়াছি।
নবম বাবেত জান ছবাব নমাজ।
কোরাণ পড়ন পুন্যকথা দশ বাবে।
একাদশ বাবে জান রোজ জন্মপুন্য;
স্ত্রী-পুরুষের দায় দোয়াদশ বাবে।
ত্রয়োদশ বাবে মিথ্যা কহিতে নিষেধ।
চতুর্দশ বাবে শুন চর্চার বয়ান।
পঞ্চদশ বাবে জানা হাছদের কথা।
ষষ্ঠদশ বাবে শুন নেকীর বাখান।
ক্ষেমা লক্ষ্য কথা কহি সপ্তদশ বাবে।
অষ্টাদশ বাবে শুন নছিহত কথা।
নবদশ বাবে শুন নানা পরস্তাব।"

মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সমগ্রটাই এ গ্রন্থের আওতায় পড়ে। নূরুদ্দিনের 'হিতোপদেশ' বা 'বুরহানুল আরেফিন' তাসাউফ-মূলক গ্রন্থ। এ কাব্যের রচনার তারিখ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

(ঞ) মুহম্মদ উজির আলী

কবি মুহম্মদ উজির আলীর একখানি মাত্র কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যটির নাম 'নসল-ই-উসমান ইসলামাবাদ' বা শাহ্‌নামা। কাব্যে কবির সুদীর্ঘ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে কবির জন্ম। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'শাহাজাদা নাজির আলী।' এই নাজির আলীই নাকি সুপ্রসিদ্ধ বাজার 'নাজির হাট এর প্রতিষ্ঠাতা। কবি তাঁর ভাই নাজির আলীর নির্দেশেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বংশধরগণের পরিচয়মূলক এ বিরাট কাব্যখানি রচনা করেন।

www.pathagar.com

"নবি বাদে খিলাফত সিদ্দিকে মিলিল।
তারপরে উমর যে খলিফা হইল।
তারপর উস্‌মান যে নূর আদিকার।
নবিজি দামাদ সেই কেতাবে প্রচার॥
আখেরে পাইল কে প্রথমে লেখিল।
উস্‌মান নসল হৈতে পুস্তুক রচিলা॥"

উজির আলীর এ গ্রন্থখানির ভিত্তিঃ

"তওয়ারিখ ওসমানী যেই আরবী জবান
গদ্য হস্তে পদ্য কৈল নসলি উসমান।"

গদ্যে লিখিত আরবী 'তওয়ারিখ-ই-উসমানী'কেই কবি বাঙ্‌লা পদ্যে ভাষান্তরিত করেন। পুস্তকটির রচনা শুরু হয় ১৭১১ খৃঃ এ। রচনা শেষ হয় ১৭১৮ খৃঃএ। কবি নিজেও উসমানের বংশধর বলে দাবী করেন'; ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামে উস্‌মানীদের আগমন, বসবাস ও সমৃদ্ধির বিবরণ দানই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির সূচীপত্র দেখলেই বোঝা যায় কবি ঐতিহাসিক , অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশে এক বিরাট কাব্য সৃষ্টি করেছেন।

কবি উজির আলীর "সায়াৎ নামা" নামক একখানা কাহিনী কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

"কষ্টতপ করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয়ে সমান॥
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়ন দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥ "

(ট) দ্বিজ রাধাকান্ত

দ্বিজ রাধাকান্তের ভণিতাযুক্ত একখানি 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে। এ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বা রচনার কালের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'কম্ব-

www.pathagar.com

মুনির পারণাভঙ্গ' নামে তাঁর একখানি পুঁথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে; এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে কবি চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর কাব্যে বিদ্যার পিতৃরাজ্য হচ্ছে বর্ধমান এবং পিতার নাম বীরসিংহ। চট্টগ্রামে বিদ্যাসুন্দর রচনার যে ধারা সৃষ্টি হয় তাতে দেখা যায়, এই নামগুলি আলাদা। ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের প্রভাবেই পরবর্তীকালে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ঘটনাস্থল বর্ধমান বলে উল্লিখিত হতে থাকে। এর থেকে বলা যেতে পারে, দ্বিজ রাধাকান্ত ভারত চন্দ্রের পরবর্তী কালের কবি। তাঁর ভাষাও আধুনিক। যেমনঃ

"তর্জন করিয়া তারে মারিবারে ধায়।
অসিধারী শ্যামা দেখিয়া পালায়॥
লোভ সম্বরিতে নারে আইসে পুনর্বার।
কি করিতে পারয়ে পার্বত সখা যার॥
পথেতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি।
নির্ণয় না হয় দিক হারাইল দিশি॥"

(ঠ) নিধিরাম আচার্য

"কালিকা মঙ্গলে"র লেখক নিধিরাম আচার্য তাঁর কাব্য রচনা করেনঃ

"শকাব্দা ষোড়শ শত জরনিধি বসু
দৈব বিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥"

অর্থাৎ "কালিকা মঙ্গল" কাব্যটি রচিত হয় ১৬৭৮ শতাব্দে; খৃষ্টীয় সন হচ্ছে ১৭৫৬-৫৭। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার চক্রশালা নামক গ্রামে কবির জন্ম বলে সাহিত্য-বিশারদ অনুমান করেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাগুলো থেকে কবির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

"আনন্দে নয়নের জলে পাখালিলো পাএ
দুর্লভ আচার্য্য সুত নিধিরামে গাত্র।
* * * *
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ।"

www.pathagar.com

কবির পিতার নাম দুর্লভ আচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মী এবং গুরুর নাম রামচন্দ্র। আরেকটি ভর্ণিতায় তাঁর মাতামহ গঙ্গারামের নাম পাওয়া যায়। এটি একটি নতুন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যা সুন্দর' কাব্য রচনার চার বছর পরে এ কাব্যটি রচিত হয়। নিধিরামের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের ঘটনাস্থান "উজ্জয়িনী"। সুন্দরের পিতার নাম গুণসার (গুণসার, গুর্ণিসার, বা গুণসাগর)। মাতার নাম কলাবতী, এবং রাজ্যের নাম রত্নাবতী। এ কাব্যে বিদ্যার পিতা হচ্ছে বিক্রম কেশরী এবং মাতা চন্দ্ররেখা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি রয়েছে এ কাব্য তা' থেকে অনেকখানি মুক্ত। কবির কবিত্ব শক্তি অতি সামান্য হলেও তা তাঁর নিজস্ব; অন্ধ পরানুকরণের নীতি তিনি অনুসরণ করেননি। তাঁর কাহিনীতে 'দেবতা একবারে অন্তরালবর্তী' নয়।

কবির ভাষা সহজ এবং বক্তব্য সুস্পষ্ট; যেমন বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাতের পর—

'দুইজনের চারি চক্ষু হইল মিলন।
আস্মাতে দেখিল যেন দ্বিতীয় মদন॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস।
কাহার ঘরের চোর আইল মোর পাশ॥'

এই ভাষার মধ্যে কোনো কারুকার্য বা অস্পষ্টতা নেই। বিদ্যার রূপ বর্ণনা অংশটি গতানুগতিকঃ

"সুন্দরীর মুখ পানে দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥"

(ড) মুক্তারাম সেন

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবির নাম মুক্তারাম সেন। অবশ্য তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম 'সারদা মঙ্গল।' সাধক কবি মুক্তারাম অষ্টাদশ শতকের চট্টগ্রামী কবিদের একজন। মুধ্যযুগের হিন্দু কবিদের প্রায় সকলেই হয় দেব-দেবীর প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠা মূলক কাব্য রচনা করেছেন না হয় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা করেছেন; দেব-দেবী বর্জিত নেহাৎ মানব-রস-সিঞ্চিত কাব্য রচনায় তাঁরা নিরুৎসুক। মুক্তারাম সেনও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি বিষয়-নিস্পৃহ ছিলেন। সাধুসংগ ও তীর্থ পর্যটনেই চিরকুমার মুক্তারাম তাঁর জীবন কাটান। মাধবাচার্য প্রভৃতির চণ্ডীকাব্যের মত মুক্তারামের কাব্যও একটি চণ্ডী কাব্য।

www.pathagar.com

কাব্যটির রচনাকাল—"গ্রহ ঋতু কাল শশী" (১৬৬৯) শকাব্দ—অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ খৃঃ। তখন চট্টগ্রামের শাসকর্তা ছিলেন হাসান বা হোসায়ন কুলি খাঁ (১৬৭৩-১৭৫১) এবং তাঁর নায়েব ছিলেন 'দেশ অধিকারী' মহাসিংহ

কবি তাঁর আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম
বন্দহ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম।"

এই দেবগ্রামই 'দেয়াং' নামে পরিচিত। কিছুকাল আগে কাগজপত্রে ঐ স্থান 'দেব গ্রাম' নামেই উল্লিখিত হতো; এখন এর নাম হয়েছে—"আনোয়ারা।" কবির পূর্ব পুরুষ "জাহ্নবী কূলে রায়া" হতে দেবগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। কবির প্রপিতামহের নাম যাদব রায় আর—

"পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্রে লৈয়া কৈল দেয়াঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ, ব্রজলাল, মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥"

মুক্তারামের কাব্যটি আকারে সংক্ষিপ্ত;—এর দুটি ভাগ; প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। কাব্যটির শুরু হয়েছে গণেশের বর্ণনায়ঃ

"এক দন্ত মহাকায় যোগাসন সদা এ
চারিভুজ গজেন্দ্র বদন।
সিন্দুর শোভিত অঙ্গ অতিশয় সর্ব্বরঙ্গ
কুসুম সুগন্ধিমালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে মত্ত হইয়া মধুস্বরে
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে
ঘটেতে আসিয়া বিঘ্ন সব বিনাশিয়া
কৃপাকর নায়কের প্রতি
মূষিকবাহনে যেবা মহিমা জানিবে কেবা
মুক্তারাম সেনের প্রণতি।"

www.pathagar.com

কবির রচনা বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল । নিম্নের ধুয়াটির ভাষা লক্ষ্যণীয়—

কুহু রাগ

"মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে
না জানি কপালে কিবা আছে
পাইলে যুবতী নব মধু হে
অলি হইয়া রহে কালা পাছে। ধুয়া
রাধার বধের ভাগী হইবে সেই নারী
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে
মরিমু পড়িমু শোকে জড়িহে
জল বিনে মীন যেন আছে।
ন জাইয় রাধার প্রাণ বন্ধুহে
হারাইলে ন পায় হেন দেখি॥"

(ঢ) বদীউদ্দিন (কাজী)

'কায়দানী কেতাব,' 'ফাতেমার সুরৎনামা,' সিফৎ-ই-ইমাম নামক তিনটি পুঁথি ও কিছু সংখ্যক পদাবলীর রচয়িতা, কাজি বদীউদ্দিন চট্টগ্রামের অষ্টাদশ শতকের কবিদের একজন। 'সিফৎ ই-ইমানে' কবি আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

"চক্রশালা পুরাণ বস্তি জানে সবগ্রাম।
তাতে এক মৌজা 'বাহুলী' আছে নাম॥
সেই স্থানে চিকণ কাজি করিছে বসতি।
উত্তম পুরুষ ছিল ভাগ্যবন্ত অতি॥
তানপুত্র আয়ুব শরীফ ছিল নাম।
তৃষামন্ত ছিল সেই দরবেশ উপাম॥
তান ঘরে এক পুত্র সৃজন হইল।
তামামুদ্দিন খোন্দকার নাম যে আছিল॥
তাহান ঔরসে জন্মি দেখি এ সংসার।"

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার বাহ্লী গ্রামে কবির জ্ঞাতি বংশধরেরা আজো বাস করছেন। কবির পূর্ব-পুরুষ ছিলেন চিকন কাজি,—তাঁর-ই নামে এ গাঁয়ের এক অংশের নাম হয়েছে "চিকন কাজি পাড়া।" রাগ তাল নামার কবি সংগীতবিদ চম্পাকাজী ছিলেন কবির বাঙালা শিক্ষক।

'কায়দানি কিতাবের' বিষয়বস্তু হচ্ছে শরা-শরিয়ৎ। এ ধরণের কাব্যে কবিত্ব শক্তি বিকাশের সুযোগ কম। 'সিফা-ই-ইমান' ও একই জাতীয় গ্রন্থ। হযরত আলী মুর্তজা একদিন তাঁর স্ত্রী, নবিনন্দিনী হযরত ফাতেমার অন্তর্নিহিত রূপ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন,—'ফাতেমার সুরত্নামার বিসয়বস্তু হচ্ছে এই। এই বাঙ্লা পুঁথিটি আরবী হরফে লিখিত। হযরত আলীঃ

'সুরত দেখিয়া আলী শান্ত হইল মন
সুবহান আল্লাহ্ বুলি বুলিলা জোবান।
*　　*　　*　　*
এই মতে শাহা আলী ফাতেমা দেখিল
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল
ফাতমার সুরতনামা সমাপ্ত হইল
পুস্তক দেখিয়া জান এসব লেখিল।'

কবির সর্বশেষ উক্তিটিতে মনে হয়, কবি হয় কোনো পুস্তক অবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেছিলেন; আর না হয় আরবী-ফারসী কোনো গ্রন্থ থেকে তা'তর্জমা করেছেন। লেখকের রচনা একেবারেই মামুলি। কোনো কবিত্ব-শক্তি নেই।।

(ণ) বালক ফকির

বালক ফকিরের দু'খানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে—'চৌতিশার পুঁথি' আর 'ফায়েদুল মুক্তাদি।' কবি ছিলেন আলী রজা ওরফে কানু ফকিরের শিষ্য। উভয় গ্রন্থেই তিনি বারবার তাঁর পীরের নাম শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেছেন। কবি আলী রজা অষ্টাদশ শতকের লোক; কবি বালক ফকির তাঁর সমসাময়িক; কাজেই, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের সূচনার দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন, এ অনুমান করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

চৌতিশার পুঁথিটি দেহতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। 'ফায়েদুল মুক্তাদি' একটি তর্জমা গ্রন্থ বলে মনে হয়; মূলগ্রন্থেঃ

"যতেক নিয়ম ধর্ম মুছলমানি কাজ
আদি অন্ত নিখিলেন্ত কিতাবের মাঝ।"

সেই কিতাব দেখেই তিনি বাঙ্গলা জবানে 'ফায়েদুল মুক্তাদি' রচনা করেন। প্রকৃত মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় সকল কাজই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি ফারসীতে লেখা।

"দিন শেষ হৈল এবে যত মুসলমান
অনাচার করে নিত্য হারাইয়া জ্ঞান।"—

এ সব মুসলমানকে সুপথে ফেরানোর জন্য কবি কাব্য রচনা করেছেন। কবির পীর "শাহা আলী রজা গুরু অমূল্য রতন।"

(ত) মুহম্মদ দানীশ

কবি দানীশ 'গুল-ই-বকাউলি'র কবি মুকিমের কাব্যগুরু স্থানীয় ছিলেন। কবি মুকিম অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে 'গুল্-ই-বকাউলি' কাব্য রচনা করেন; এই কাব্যে দানীশের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং, দানীশ আঠারো শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নিবাস ছিলো চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে 'সুলুকবহর' গ্রামে।

মুহম্মদ দানীশের একটি মাত্র পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে তা-ও খন্ডিত। পুঁথিটির নাম 'জ্ঞানবসন্ত বাণী'। কোনো এক রাজপুত্র এক রমণীর প্রেমে পড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে; তখন তার পাত্রমিত্রেরা সুন্দর সুন্দর গল্প ফেঁদে প্রমাণ করার চেষ্টা করে নারী প্রেমের কোনো মূল্য নেই। নারী স্বভাবতঃই 'কুটিল এবং বিশ্বাসঘাতিনী' রাজপুত্রের চৈতন্য সম্পাদনের জন্যই গল্পগুলির অবতারণা।

পুঁথিটি একটি তর্জমাগ্রন্থ। কবির পিতার নাম 'আরব'ঃ

'জ্ঞান বৃদ্ধি পুস্তকের বাণী সুধাময়
রচএ দানীশ হীন আরব-তনয়।'

কবির ভাষা সুন্দর। পদাবলী কবিতার রীতিতে রচিত তাঁর কিছু খন্ড কবিতাও আছে।

www.pathagar.com

(থ) শেখ তনু

শেখ তনুর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুস্তকটির নাম 'ফাতেমার সুরতনামা।' শেখ শেরবাজ ও কাজি বদিয়ুদ্দিনের 'ফাতেমার সুরতনামা' আর এ কাব্যের বিষয়বস্তু একই; ফাতেমার অন্তর্নিহিত রূপ বর্ণনাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। হযরত আলী বিবি ফাতেমার সেই মহা ঐশ্বর্য্যময়ী রূপ দেখেঃ—

'ছুরত দেখিয়া আলী সন্তোষ হইলো।
আল্লা নামে দুই রাকাত নামাজ পড়িলো॥"

শেখ তনু চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন॥

(দ) অষ্টাদশ শতকের আরো কতিপয় কবি ঃ

এই শতকে আভির্ভূত আরো কয়েকজন চট্টগ্রামী কবির খবর জানা যায়। কিন্তু এঁদের কেউই সত্যিকার কবিত্বের অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামে সাহিত্যের সোনালী ফসল ফলেছে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে। অষ্টাদশ শতক থেকে ভাটার সূচনা হয়। এই সময়ে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'সুলক বহর' নিবাসী কবি আবদুস সমদ ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলিস্তার' কাব্যানুবাদ করেন। এটি একটি স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কবি নিজের নিবাস সম্বন্ধে বলেছেনঃ

"করিম করম কর মোর প্রতি
লিখিবারে জন্ম ধাম
শুলুক বহর করি সর্বলোকে
ধরয় যে এই নাম।"

কবি অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তির দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।

www.pathagar.com

হোসেন ফকীর নামক অপর এক কবি 'রাশি গণনার পুঁথি' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই হোসেন ফকীর চট্টগ্রামের কবি বলে মনে হয়। তাঁর পুঁথিটির লিপিকর হচ্ছেন কবি আলী রজা ওরফে কালু ফকীরের পুত্র শরাফতুল্লাহ্। এতে মনে হয় কবি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের লেখক।

'সিফৎ নামা'র কবি নূরুল্লাহ্ এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 'সূফি সানাউল্লাহ্র সিফৎনামা' রচয়িতা কবি আজমত উল্লাহ্ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হন। এঁরা দু' ভাই। এঁদের নিবাসস্থলঃ—

"হীন (ম) তি নূরুল্লাহ ভুণে চাটিগ্রাম স্থল।
স্বর্গস্থল যেন হয় সুচারু নির্মল॥
দৌলতপুর রাজ্য মোর এ ক্ষুদ্র উহারি।
বিরচিত চিত্তকথা ধর্ম্মমনে স্মরি॥"

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দৌলতপুরে কবি ভাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের পূর্ব পুরুষের নাম 'গদাই মুনদার'; পিতামহের নাম 'নিয়াজ' এবং পিতার নাম 'মুহমিন' বা 'মুহায়মিন'। নূরুল্লাহ্ তাঁর কাব্যে আধুনিক ফেনী মহকুমার কতিপয় শরীফ পরিবারের তারিফ বর্ণনা করেছেন। আজমত উল্লাহ্র কাব্যও ব্যক্তি-প্রশস্তিমূলক কাব্য— 'সানাউল্লাহ্' নামক কোনো সুফী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের প্রশংসাই কবির লক্ষ্য। প্রসংগক্রমে কিছু হাদিস এবং আরব দেশের কিছু কিছু প্রথাও বর্ণিত হয়েছে। রচনায় কাব্যগুণ নেই।

কাইমুদ্দিন নামে চট্টগ্রামের এক কবি এই শতকে 'চমন বাহার'নামক একখানি কাব্য রচনা করেন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

গীতি কবিতা

(ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক)

মধ্যযুগের কবিরা যে শুধু কাহিনী কাব্য কিংবা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন তা' নয়। বহু কবি খন্ড ও গীতি কবিতা এবং সংগীতও রচনা করেছেন। এইসব খন্ড ও গীতি-কবিতা রচনা করতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত পদাবলীর রচনারীতি ও রূপ বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন। সুফী মতবাদের সাথে পরিচিত বৈষ্ণব কবিদের কাছে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যেরূপ শেষ পর্যন্ত জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকে পর্যবসিত হয়েছে, সুফীপন্থী মুসলিম কবিরাও বাঙলায় কাব্য রচনা করতে গিয়ে তেমনি বহুক্ষেত্রে আশিক-মাশুকের রূপক হিসাবে রাধাকৃষ্ণের প্রতীক ব্যবহার করেছেন। "রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে মুসলিম কবিরা যে সব কবিতা রচনা করেছেন, তা ' কোনো বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মমতের আঁওতায় রচিত নয়।" কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অন্ধ অনুকরণও হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খন্ড কবিতার এই কবিদেরকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' বলা অযৌক্তিক; কবি হিসেবে এঁরা মুসলমান, এঁদের কাব্য রচনার রীতি পদাবলীর রচনা রীতির অনুরূপ— এই হচ্ছে এঁদের বৈশিষ্ট্য।

চট্টগ্রামের বহু কবিই খন্ড কবিতা রচনা করেছেন। কারো কারো শুধু খন্ড বা গীতি কবিতাই পাওয়া গেছে। ফতে খান এবং সুন্দর ফকির নামক দুই গীতি কবিকে ষোড়শ শতকের চট্টগ্রামের কবি বলে অনুমান করা হয়; চট্টগ্রামের পীর দরবেশের উল্লেখ প্রসংগে কবি মুকিম 'গুল-ই-বকাউলি'তে বলেছেনঃ

"শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ্ পীর,
হাদি বাদশাহ্, আর শাহ সুন্দর ফকির।"

কাজেই কবি ষোল-সতের শতকের লোক—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সাধক ছিলেন তা-ও-মুকিমের উক্তি থেকে প্রমাণিত। তাঁর রচনার নমুনাঃ

www.pathagar.com

চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া।
একহাতে বাজুবন্দ আর হাতে বাঁশী
সোন্দর ফকীর কহে হামো পরবাসী।

ফতেখানের ভণিতায় প্রকাশ—তিনি ছিলেন 'পীর মীর ছৈয়দ সুলতান (শাহের) মুরীদ। কাজেই, তিনি ষোল কিংবা সতের শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন, একথা বলা যেতে পারে। পোতন, ফতন ও ফতেখান একই ব্যক্তি কি-না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তাঁর ভণিতাটি নিম্নরূপঃ

"ভব কল্পতরু জানহ আহ্মার
পীর মীর শাহ সুলতান।"

সপ্তদশ শতকে কমর আলী, নওয়াজিশ খান এবং শমসের আলী ছাড়াও ছৈয়দ আইনুদ্দিন, গেয়াস খান এবং আলি মিয়া নামক কবিরা খন্ড কবিতা রচনা করেন। ছৈয়দ আইনুদ্দিনকে চট্টগ্রামের কবি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। কবি মুকিম তাঁর পূর্ববর্তী চট্টগ্রামের যে সব বিখ্যাত কবির নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে গেয়াস খানের নাম আছে। গাএস, গায়াস, গেয়াস খান বা গএয়াস যে 'গিয়াস'এর বিকৃতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সতের শতকে বা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। কবি আলি মিয়ার নামও মুকিম উল্লেখ করেছেন। কাজেই আলী মিয়াও সতেরো শতকের শেষ দিক, না হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকের কবি। জনশ্রুতি এই যে কবির নিবাস রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রাম।

রূপ ও অভিসারের বর্ণনায় ছৈয়দ আইনুদ্দিন যেমন সিদ্ধ হস্ত, তেমনি জীবনের পরিণাম বর্ণনায় তাঁর কাব্যে শাশ্বত সত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল । তাঁর রূপ এবং অভিসার বর্ণনাও আসলে এক আধ্যাত্মিক সত্যেরই পরোক্ষ বর্ণনা মাত্রঃ

"খোশ না লাগে মোর গৃহের বে-ভারঃ
রাজপন্থে ননদিয়া দিছে আঁখি ঠার॥"

— কবি বলছেন গুপ্ত মন্দিরে গিয়ে 'নাগরকে' বরন করে নাও। "উঠানেত হাটু পানি সমুখে গড় খাই। সোনা হেন কায়াখানি রাখিমু কোন্ ঠাঁই।" কবি বলছেন, চিন্তার কারণ নেই— "এক চিত্তে প্রভু ভাব, মিলাইবা কান্ত।" মানুষ অমর নয়—তাকে একদিন

www.pathagar.com

এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবেই— সেদিন তার প্রতিটি অঙ্গের কাছে ভেট বা শুল্ক চাওয়া হবে। প্রতিটি অংগের সদ্ব্যবহার না করলে সেদিন কি জবাব দেবে মানুষ?

"তলব হইলে সাংগ কি লইয়া যাইবা।
চাহিবেক নৌকি ঘাটি কি উত্তর দিবা॥
উত্তম কি ভেট লইয়া ঠাকুর ভেটিবা।
প্রতিশ্বাসে কোন কর্ম করিছ বুলিবা॥"
শ্রবণে শুনিলা কিবা শব্দ সুললিত।
মুখে কোনো জাপ্ সার জপিলা স্মরিত॥
দুই হস্ত পদ যুগে কৈলা কোন্ কাম।
অঙ্গুলীতে জপমালা কি লইলা নাম॥
চিতান্তরে জিটমূলে কিরূপ দেখিলা।
হিয়ার মাঝে কেবা আছে তারে নি চিনিলা॥ "

কবি আলী মিয়ার রচনায় মৌলিকতা বা গভীরতা নেই। কবি গেয়াস খানের রচনার নজীর হিসাবে নিম্নের পদটি উল্লেখযোগ্যঃ

"তোমার সুখের খবর কোথায় গেলে পাইনু।

সেবিয়া তোমার পদ আর কিছু লৈমু॥
যেখানে করিলা বন্ধু এ রাঙা পীরিতি।
কি না দোসে দিয়া বন্ধু হইলা ভোর মতি॥
কাহাকে কহিমু দুঃখ কে জানে বেদনা।
সঙ্গের সঙ্গিয়া ভাই কেহ নহে আপনা॥"

আঠারো শতকে ঐ রীতির বিপুল সংখ্যক কবি আবির্ভূত হন। চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে আবাল ফকির, মুহম্মদ রজা, আলিরজা, আলাউদ্দিন, এরশাদুল্লাহ, চম্পাগাজী, চামারু, ফাজিল, নাসির মোহাম্মদ, ফকির ওহাব, ছৈয়দ নাসির, বকসা আলী, কাজী বদিউদ্দিন , মুহম্মদ আলী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

সাধক কবি আলী রজার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পদাবলীর রীতিতে তিনি যেসব গীতি কবিতা রচনা করেছেন তাতে সুফীদের অধ্যাত্মদৃষ্টিই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর 'বংশী' আমাদেরকে মওলানা রুমীর 'মস্‌নবী শরীফে'র বংশী বেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

www.pathagar.com

"অখন্ড মহিমা যার নাহিক তুলন
মারিয়া জিয়ায় বংশী না জানি কেমন।
না হয় বংশীর ধ্বনি পূর্ণ কামশর
আলাপ করিতে মাত্র প্রাণ তেজে ঘর।
যার নাম বেদ শাস্ত্র অক্ষরে না ধরে
পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃসরে।"

এ বংশী সাধারণ বংশী নয়; কারণ—

'বংশী হেন মূর্ত্তি ধরে তুন রাখি প্রাণ হরে
বংশীমূলে জগতের চিত্ত।'-

এ বংশীধ্বনি যার কানে এসে প্রবেশ করে সে বড় ভাগ্যবান। এ বাঁশী কে বাজাচ্ছে? তিনিই বাজাচ্ছেন—"জগতের কায়-মনে যার যন্ত্রগীত"।

কবি ফাজিল মুহম্মদ ও ফাজিল নাসির একই ব্যক্তি বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। নাসির মুহম্মদের খন্ড কবিতাগুলিও গতানুগতিক পদাবলী কবিতার রীতিতে রচিত। এতে প্রকাশের স্বকীয়তা বা আবেগের তীব্রতা নেই। তবে তাঁর একটি কবিতা বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। পৃথিবীতে প্রবাস জীবন কাটানোর পর মানব যাত্রীর কাছে 'স্বগৃহে ফেরার আহ্বান এসেছে; কিন্তু কবি কি করে শূন্য হস্তে এই দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বগৃহে ফিরবেন?—মানব হৃদয়ের এই শাশ্বত জিজ্ঞাসা অতি চমৎকার ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেনঃ

"দিনে দিনে আসেরে নাথ মোর বাড়ীর খবর
কি লৈয়া যাইমু দেশে শূন্য দুই কর।
ভরিলু সুবর্ণ ভরা না রাখিলুঁ ধারে
লহরে মারিল নৌকা পাইয়া বালুচরে।
ভরিলুঁ সুবর্ণের বণিজ না বুঝিনু ভাও
শুকাইল যমুনার জল চরে লাগিল নাও।
যত ছিল পাইক মাঝি সব দিল লুক।
না জানি নসিবে মোর কত আছে দুখ।
স্তর নাই, কূল নাই, রইবারে নাই ঠাঁই

www.pathagar.com

বলবুদ্ধি হারাই আমি ভাসিয়া বেড়াই।
কোন পন্থে যাইমু আমি না দেখি উপায়।
কি বুদ্ধি করিব নাথ ভাবিয়া না পাই।
কলি হৈল বলিরে ধর্ম নাই তার মনে
বল-বুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে।"

সাধক কবি আলী রাজার পুত্র কবি এরশাদুল্লাহ্‌র রচিত গীতি কবিতাগুলি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। তাঁর মতেঃ

'তত্ত্ব পন্থসার' বংশী বিনে আর
নাহি জানে সুদ্ধ জ্ঞানী।"

কবি তাঁর একটি কবিতায় মুমীনকে 'প্রভাতকালে' উঠে ভালো করে 'অজু' সমাধার পর, কলিমা 'শাহাদৎ পড়ে,' 'সুন্নত' করে, অজু শেষে তিনবার সুরা 'কদর' এবং 'পঞ্চ কলেমা' পাঠ করে 'একমন' হয়ে 'ফজরের নামাজ আদায় করতে বলেছেন।— তারপর 'তস্‌বী দরুদ' পড়ে মুনাজাত করেঃ—

"বসিয়া নির্জন থমে
মোকাম মঞ্জিলে কর গতি
আপনা বিনাশ করি গুরু উপলক্ষ ধরি
এ সপ্ত মোকামে হের জ্যোতি।
চক্রমূলে যুতি মনে শব্দ উঠে সে মোকামে
হের শুন তাতে বান্ধি মন
চিনিয়া আপনা তন ধ্যান কর সর্বক্ষণ
তবে সে চিনিবে নিরঞ্জন।"

'কায়দনী কিতাব,' 'ফাতেমার সুরৎনামা' 'সিফৎ-ই-ঈমান,' নামক গ্রন্থ তিনটির রচয়িতা কাজি বদিউদ্দিন ও 'হায়রাতুল ফিকাহ্‌,' 'শাহপরী মল্লিকজাদা ও হাস্‌নাবানু' নামক উপাখ্যান দুটি কবি মুহম্মদ আলীর কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এদের খন্ড কবিতাগুলো রচনা ও প্রকাশ ভংগীর বিচারে গতানুগতিকতার পর্যায়ে পড়ে।

www.pathagar.com

'রাগতালে'র পুঁথি রচয়িতা বকশাআলীর নিবাস ছিলো 'বেলমোড়ি' গাঁয়ে। তাঁর পিতার নাম আরব চৌধুরী এবং পীরের নাম দানীশ কাজি। তাঁর খন্ড কবিতাগুলি রচনা হিসাবে সাধারণ স্তরের।

ব্রজসুন্দর সান্যালের মতে ওহাব ফকির চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার হাওসার (খরন্দ্বীপ) বাসিন্দা। কবি চামারার বাড়ী ছিলো সুলতানপুর।

'চম্পাগাজী' চট্টগ্রামের 'সতর পটুয়া' গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই গ্রামে তাঁর বংশধরেরা আজো বসবাস করছেন। রাগনা'র একটি ভণিতায় দেখা যায় কবির পিতার নাম আব্দুল কাদিরঃ

'আব্দুল কাদির সুত চম্পাগাজী নামে।'

তিনি পন্ডিত ও হাড়িদের সংগতি শিক্ষক ছিলেন। চম্পাগাজী কাজি বদিউদ্দিনের সমসাময়িক।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইংরেজ আমল ও মুসলমান

(সাধারণ আলোচনা)

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খার পুত্র বুজর্গ উমিদ খান চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চট্টগ্রাম স্থায়ীভাবে বাঙলার অন্তর্ভূক্ত হয়। এই সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি নব্বই বছরের ইতিহাস। তথা কথিত পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই সময়টা চট্টগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুঘল যুগ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য—যুদ্ধের নামে এই প্রহসনে, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাফর, রায়বল্লভের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায়, কূচক্রী ক্লাইভ জয় লাভ করে এবং বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভের আদেশে জঘন্যভাবে নিহত হন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ইনাম স্বরূপ মীরজাফর ক্লাইভের তাঁবেদার নবাব রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাফরের জামাতা, স্বদেশপ্রেমিক মীরকাসিম ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙলার স্বাধীনতা কিছুকাল বজায় রাখেন। তাঁর পতনের পর স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কেউ রইলোনা। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বণিক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ আলমকে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা রাজস্বদানের শর্তে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। এখন থেকে কার্যতঃ এই কোম্পানী দেশের মালিক হয়ে বসলো, বাঙলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলো। ইংরেজ বণিকদের এই বিজয় শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকলোনা। এ দেশের সামাজিক কাঠামো, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মন-মননের ক্ষেত্রেও তা ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৭২-১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেশে কতিপয় গুরুতরো পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হলো, নবাব হলেন বৃত্তিভোগী। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলো এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অফিস আদালত থেকে রাজভাষা ফারসী উঠে গেলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ও ফারসী ভাষার বিতাড়ণ বাঙলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজের মেরুদন্ড একেবারে ভেঙে দেয়।

www.pathagar.com

এর কিছুকাল আগেই বাঙলাদেশে চার্লস গ্রান্টের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা চালুর প্রচেষ্টা চলে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর কলিকাতা আগমন, শ্রীরামপুর ইংরেজ মিশনে কেরীর যোগদান ও বাইবেলের বাংলা গদ্যানুবাদ, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এদেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে ওয়াকিবহাল করা ও দেশের ভাষা বাংলা শেখানোর জন্য কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন গঠিত হয়। দেশে ইংরেজি শিক্ষা এ ভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ফারসীর ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক হিন্দু পন্ডিত ইংরেজদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন। কমিটি অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসনের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। দেশের আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনকে হিন্দুরা প্রভু পরিবর্তন বলে স্বীকার করে নিয়ে, ইংরেজের প্রতি সহযোগিতার দরাজহস্ত প্রসারিত করে। হিন্দুরা মুসলিম রাজত্বে যেমন ফারসী শিখেছে তেমনি ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি শিখে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করলো। কিন্তু সদ্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত মুসলমানেরা ইংরেজের শাসন, তার ভাষা ও সাহিত্য কোনো কিছুই স্বীকার করে নিতে পারেনি। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজদের সংগে অসহযোগিতা করতে থাকে। শত বছরেরও অধিক কাল ধরে এই অসহযোগ চলতে থাকে।

ফলে রাজ্য, ভাষা ও সম্পদ হারিয়ে মুসলমানরা নতুনতরো বিপদের সম্মুখীন হয়; খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসেও প্রচন্ড আঘাত লাগে। কিন্তু মুসলমানেরা এসব নীরবে মুখ বুঁজে সহ্য করার পাত্র নয়। 'ওহাবী আন্দোলন' ও পূর্ব বংগের 'ফরাজী আন্দোলনে'র মাধ্যমে সেই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটে। ১৮৫৭ এর সিপাই-বিপ্লব আজাদির জন্য মুসলিমের অভূতপূর্ব আত্ম-ত্যাগেরই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। হিন্দুরা সিপাহী বিদ্রোহে ভয়ানক বিচলিত হয়; "কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালি প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিপাহীদের বিদ্রোহের নিন্দা করে এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।" (সঃ প্রভাকর ২৮শে মে, ১৮৫৭) সিপাহী বিপ্লব ছিলো মূলতঃ

www.pathagar.com

মুসলমানদের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আর সে সময়ের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ছিলেন এই সংগ্রামের ঘোর বিরোধী দালাল শ্রেণী। বিপ্লব ব্যর্থ হলো। মুসলমানদের উপর নেমে এলো নতুনতরো নির্যাতন। এই নির্যাতিত, নিপীড়িত, সকল ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের করুণ চিত্র ১৮৭১ খৃঃ এ রচিত হান্টারের 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' নামক গ্রন্থে অংকিত হয়েছে।

মুসলমানদের এই সর্বনাশের জন্য হান্টারের মতে, ইংরেজরাই ষোলো আনা দায়ী। ১৯০০ খৃঃঅ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আর তেমন কোনো আন্দোলন দেখা না গেলেও, ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর নব জাগরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা-সাহিত্যে হিন্দুর একাধিপত্য মুসলমানদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯০৫ খৃঃ- এ বাংলা ভাগ করে পূর্ব বংগ ও আসাম নামে এক পৃথক মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ গঠন করায় মুসলমানরা নিজের ভাগ্য গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের ফলে তাও বানচাল হয়ে যায়। ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হিন্দু সমাজ মুসলিম স্বার্থের প্রত্যেকটি ব্যাপারে ঘোর বিরোধিতা করতে থাকে। দীর্ঘদিন পরে মুসলমান আবার তার জাতীয় স্বাতন্ত্র ও স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, এবং স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিতে একদিন পাকিস্তানের দাবী তোলে। ১৯৪৭ ইংরেজির ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে হিন্দু সংখ্যাগুরু অঞ্চল নিয়ে হিন্দুস্থান ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে গোড়াতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয় এবং সেই সাহিত্যের অনুকরণে, বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়, পদ্যের স্থলে গদ্য সাহিত্যের প্রধান রীতি হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত পন্ডিতেরা যে গদ্য সৃষ্টি করলেন তাতে করে দেশে সাধারণ্যে-প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা এক সংস্কৃত-প্রধান গদ্যের উদ্ভব হয়। ১৮০০ খৃঃ- এ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এদিক দিয়ে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮২৫ খৃঃ- এ গদ্যে কতকগুলি বাঙলা পুস্তক প্রকাশিত হয়ে হিন্দুরচিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে এই সাহিত্য হিন্দু জাতীয়তার বাহন হয়ে উঠে।

অন্যদিকে, মুসলমানেরা ১৮২৫ খৃঃ পর্যন্ত কাব্যে প্রাচীন মুঘল ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেন। মুসলমানেরা যখন প্রাচীন কাব্য ধারার অনুবর্তন করছেন, (১৮০০-১৮৫৭ খৃঃ)

www.pathagar.com

তখন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সাধনা-রত। বংকিম মারফত পাশ্চাত্য প্রভাব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলো বাঙ্‌লা সাহিত্যে । ইত্যবসরে মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজের সাথে আপোষ-মীমাংসার মনোভার সৃষ্টি হয় এবং আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিমদের প্রবেশ ঘটে। মীর মুশাররফ হোসেন মুসলমানদের মধ্যে এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক।

১৮০০ খৃঃ-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে আধুনিক প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙ্‌লা কাব্যের সূত্রপাত হলেও, চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরো কিছুকাল পুরোনো ধারার অনুবর্তন চলতে থাকে এবং মুসলমানদের মতো বহু হিন্দু কবিও পুরোনো ধারারই অনুবর্তন করেন। প্রত্যন্তবর্তী এই জেলাটিতে ইংরেজ আমলে প্রাচীন ধারার এই অনুসরণের কারণ খুঁজতে হবে ইংরেজ আমলের সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা থেকে এর দূরত্ব, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট ও মুসলিম প্রাধান্যের মধ্যে।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইংরেজ আমলের কবি ও কাব্য পরিচিতি

এই আমলের গোড়ার দিকের কয়েকজন কবি— মুহম্মদ রজা, আলী রজা, মুহম্মদ ,মুকীম, মুহম্মদ কাসিম ও ছৈয়দ নুরুদ্দিনের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কালের দিক দিয়ে এঁরা ইংরেজ আমলের কবি, কিন্তু কাব্য-বস্তু, রচনা রীতি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এঁদের স্থান মুঘল যুগে। পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পরও দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে, অর্থাঃ ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত মুঘল ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। উল্লিখিত কবিদের কাব্য রচনাকাল মোটামুটি এই সময়ের মধ্যেই পড়ে।

উনিশ শতকে এই ধারার আরো কয়েকজন মুসলিম কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের অনেক হিন্দু কবিও উনিশ শতকে মঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের হিন্দু কবিদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় আধুনিক কাব্য রচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন কবিবর নবীন সেন।

(ক) কবি চুহর

উনিশ শতকের প্রথম দিকের চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে চুহরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্ব-পুরুষের নাম আজমত। আজমত গৌড় থেকে সগোত্র চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। আজমতের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন কবি চুহর। কবি চুহরের পিতার নাম ওয়াইজুদ্দিন, পীরের নাম মতিউল্লাহ। পীরের ইচ্ছানুযায়ী তিনি অপরিণত বয়সে 'মনোহর মধুমালতী' ও যৌবনে 'কমিলশাহ্ দিলারাম' নামক প্রেমমূলক কাব্যদ্বয় লিখেন ঃ

"বালক সমত্ব মধুমালতী রচিল
কতকাল শেষে দিলারাম প্রকটিল।"

www.pathagar.com

কবির পৃষ্ঠপোষক জাফর আলীর পূর্ব-পুরুষ ধনমল্লও গৌড় থেকে আগত। তিনি সিদ্দিক বংশের লোক। 'সত্যের সুমেরু জাফর আলী'র

.....'মুখে পাইয়া ভরসা
রচিতে উত্তম গ্রন্থ হীনে কৈল আশা।'

কিন্তু কবির বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে এবং তার ফলে 'কায় আলসিত মন আলসামী রীতি।' জাফর আলীর আদেশে কবি 'আজর শাহা সমনরুখ' ও 'সুজন চিত্রাবতী প্রসঙ্গ' রচনা করেন। এই দুটি কাব্যের বিষয়বস্তুও প্রেম।

কবির পৃষ্ঠপোষক জাফর আলী চৌধুরী দোহাজারীর বাসিন্দা। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উকিল ছিলেন। কবির কাব্য পাঠে জানা যায়— তিনি বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেনঃ

"আরবী ফারসী মষী আর হিন্দুয়ানী।
পঠিয়া কুমার হৈল শাস্ত্রে মহাগুণী॥
নানা শাস্ত্র অভ্যাসিলা সুবুদ্ধি কুঁঅর।
কৃতির শব্দ হৈল দিগ দিগন্তর॥
চাটিগ্রাম ঢাকা আদি ভ্রমি নানা ঠাম।
কৈলকাতা তাকশালে লিখাইল নাম॥
ভাগ্যগুনে কোম্পানীর উকীল হইয়া।
পুনরপি চাটিগ্রামে আইল পলটিয়া॥"

কলিকাতায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নূতন টাঁকশাল স্থাপিত হয় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এবং এই টাঁকশালে টাকা তৈরি হতে থাকে ১৮৩৫ খৃঃ থেকে। কাজেই কবি যে এই সময়ের লোক তাতে সন্দেহ নেই। কলিকাতা টাঁকশালে প্রথম জীবনে চাকুরি করার পর জাফর আলী চৌধুরী চট্টগ্রামে ওকালতি পেশা অবলম্বন করেন। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উকিল ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁরই আদেশে কবি দু'খানি কাব্য রচনা করেন— 'সুজন চিত্রাবতী প্রসংগ' ও 'আজর শাহ্ সমনরুখ্'। এতে বোঝা যায় কবির এ দুটি কাব্য উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই রচিত।

চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার কাথারিয়া গাঁয়ে খোন্দকার বংশে দরবেশ ও কবি চুহরের জন্ম। তাঁর কোনো বংশধর নেই বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। উক্ত গাঁয়ের চাঁদগাজী চৌধুরীর দীঘির পাড়ে, দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'চুহর শার দরগা' নামে কবির কবর বর্তমান।

www.pathagar.com

কবি চুহর পণ্ডিত কবি। তাঁর 'মনোহর মধুমালতী' 'কমিল শাহ্ দিলারাম', 'সুজন চিত্রাবতী প্রসঙ্গ' নামক কাব্য তিনটির কোনো প্রতিলিপি আজো পাওয়া যায়নি। শুধু মাত্র 'আজর শাহ্ সমনরুখ' নামক কাব্যটিরই একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত অনুলিপি পাওয়া গেছে। সৈয়দ সুলতান, আলাওল, শাহ বারিদ খান ও পীর কবি মুহম্মদ খানের গুণ ও কাব্য-মুগ্ধ কবি চুহরের কাব্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব পড়েছে; হিন্দু পুরান ও জ্যোতিষেও তাঁর জ্ঞান ছিলো প্রচুর।

'আজর শাহ সমনরুখ্' কাব্যটির কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ

আবিজ দেশের রাজা 'আজরশাহ্' ও রাণী সুনালার সন্তান হয় না। এজন্য রাজার বড় দুঃখ। দেশের জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিতেরা বললেন, সুনালার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মশ্‌রিক দেশের শা'জাদী 'সমনরুখ'কে বিয়ে করলে রাজার পুত্র জন্মাবে। আজরশাহা সমনরুখকে বিয়ে করলেন। রাণী সুনালা প্রতিহিংসা বশে জাদু-টোনার সাহায্যে রাজাকে নির্বীর্য করে দেন। দৈবজ্ঞের পরামর্শ মতো রাজা প্রতিষেধক ব্যবহার করে পুরুষত্ব ফিরে পান ও সমনরুখের গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সুনালা আবার তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাদু-টোনার সাহায্যে সমনরুখ ও তাঁর পুত্রের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। এদেরকে রক্ষা করার জন্য, আজর শাহার উজির বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে বাগদাদ পৌছেন 'ছাকাহান' নামক পীরের দোয়ার জন্য। সেখানে পীরের সাথে তাঁর দিদার হয়।

এর পর পুঁথির কোনো পৃষ্ঠা বর্তমান নেই। পুঁথিখানা একটি ফারসী কাব্য অবলম্বনে রচিত বলে মনে হয়। কবির নিজের উক্তি ঃ

"তান (জাফর আলীর) আজ্ঞা পাই হীন দুঃখিত চুহর
ভাঙ্গিয়া ফারসী ভাষা রচিল পয়ার।"

(খ) হামীদুল্লাহ খান ঃ

হামীদুল্লাহ খান কবি হিসেবে যতো না প্রসিদ্ধ তার চাইতে বহু গুণে যশস্বী ঐতিহাসিক হিসাবে। তিনি ফারসী ভাষায় 'আহালিসুল খাওয়ানীন' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। চট্টগ্রামের এই ইতিবৃত্তে চট্টগ্রামের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আরবী ও ফারসী ভাষায় হামীদুল্লাহ খান সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর

www.pathagar.com

জন্ম ১৮০৭/৮ খৃঃ-এর দিকে। সিপাহী বিপ্লব হয় ১৮৫৭ খৃঃ-এ ; দেশের আজাদির জন্য এই মুসলিম পরিচালিত আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ সাড়া দেয়। কিন্তু হামীদুল্লাহ খান ছিলেন এই আন্দোলনের বিরোধী এবং ইংরেজ কোম্পানীর সমর্থক। দেশের এই সার্বিক বিপ্লবে দেশবাসীর পক্ষে না দাঁড়িয়ে তিনি ইংরেজকে সাহায্য সহায়তা করেন। তারই ইনাম পান 'খাঁ বাহাদুর' খেতাব।

হামীদুল্লাহ খান শুধু ফারসী ভাষায় ইতিহাসই রচনা করেননি, তিনি বাঙ্গলা কাব্য রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন। 'ত্রাণপথ'ও 'শাহাদতুদ্যান' নামক তাঁর দুখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া তিনি 'পদ্যে-পদ্যে' মিশানো একখানা গ্রন্থও রচনা করেন, গ্রন্থখানির নাম 'ক্লীবত্ব মোচন'। 'ত্রাণপথ' ও 'ক্লীবত্ব মোচন' ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হয়। 'গুলজার-ই-শাহাদত' কাব্যটির রচনা কবির পঞ্চাশ বছর বয়সে। ১২৭০ সালের ১৫ই ফাল্গুন, মোতাবেক ১২৮০ হিজরীর সতেরই রমজান, শুক্রবারে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ ইংরেজীর ১৮৬৩ খৃঃ এ গ্রন্থটি রচিত হয়।

'ক্লীবত্ব মোচন' নামক কাব্যটিতে কবি দাড়ি মুণ্ডনের নিন্দা ও দাড়ি রাখার ফজিলত বয়ান করেছেন। 'শ্রী শ্রী পরমেশ্বর' নামে গ্রন্থটির সূচনা। আরম্ভটি নিম্নরূপ ঃ

'হিজড়ার ন্যায় লোকর্দ্দেশের গতি। আমি তাহার পোনের প্রকার দোষ লিখিতেছি। মহামহিম মহাসয়েরা মনজোগ করিবেন।"

"ওহে ভাই, যদি আপনাকে নামর্দ্দ খোজার ন্যায় বানাইতে চাহ, তবে দাঁড়ি কাট্ কেন না খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয় না।' এই ধরনের পনেরো দফা যুক্তি অবতারণার পর লেখক দাড়ি ছেদন না করার জন্য তাঁর 'হেতুবাদ ও সারকথা' লিপিবদ্ধ করেছেন। তার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

'তাহার মর্ম্ম এই জে ইশ্বর জেমত বানাইয়াছেন তেমন বানাইবার কেহরই কদাচিত সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ম্ম কখনও ব্রেথা ও অনার্থক নহে। জেমত হস্তার্জে পঞ্চ অঙ্গুলি সহিতে সৃজিয়াছেন; যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেসি জোড়া না থাহিত তবে কিছু ধরা না জাইত।' এই ধরনের যুক্তি পেশের পর লেখক ছন্দো বদ্ধ পদের আশ্রয় নিয়েছেন। রচনার নমুনা ঃ

"শুন ভাই দিদাড়িয়া লোকদের গত

মূর্খতার লোমহিন বানরের মত

www.pathagar.com

হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে
ঘসিতে অন্যের সঙ্গে বদনে বদনে।"

কিংবা

"দাড়ি মুখে দিল প্রভু পুরুষ লক্ষণ
নারী খোজা-মুখে দাড়ি না হয় কখন।
আপনার পুরুষত্বে কি মন্দ দেখিলা
যার জন্য পুরুষত্ব লক্ষণ ত্যজিলা।"

কাব্যের সর্বত্র তিনি আল্লাহর পরিবর্তে পরমেশ্বর শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন ঃ—

"প্রমেশ্বরে তার ভার করিতে প্রকাশ'
'উচিৎ প্রমেশ্বরের শোকর সর্বথা—" ইত্যাদি।

'ত্রাণ পথ' কাব্যে 'খোদা নিরঞ্জনের' একত্ব, তাঁকে 'চিনন ও জাননের উপায়।' 'সুকৃতি' যাহাতে 'লোকে ত্রাণ পায়', এবং 'কুকৃতি' যাহাতে মানুষ 'দুইকুল হারায়' ইত্যাদি পদ্যে আলোচিত হয়েছে। কাব্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ

"প্রথমে সকল আদ্যে স্মরি প্রভু নাম
পরিবার সহ করি নবিকে ছলাম
পরে কিছু ধর্মপথ দেখাইতে চাই
যাহাতে তরয়ে লোক নিজ ত্রাণ পাই
কলে পথ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে
দেখাইতে আদেসিল নবে যাহা পারে।"

কাব্যটির সমাপ্তি এইরূপ ঃ

"নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান
সেই যে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান
দশম সে মৃত্যু কথা সদায়ে স্মরণ
পাপ হতে ভয় জন্যে স্মরিলে মরণ।"

www.pathagar.com

ডঃ এনামুল হক 'ত্রাণ পথ' কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে 'দাড়ি রাখন ও কাটনের' কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে 'ক্লবত্ব মোচন' কাব্যেই দাড়ির বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'ত্রাণ পথ' কাব্যে নয়।

'গুলজার-ই-শাহাদত' মহররমের ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কাব্য।

(গ) হাশমত আলী চৌধুরী

কবি হাশমত আলী কাজি চৌধুরী কটিকছড়ি থানার ভোজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বল্পশিক্ষিত, স্বনামধন্য, প্রতাপশালী জমিদার। কিন্তু প্রতিভা অনেক সময়ই শিক্ষার তোয়াক্কা রাখে না। হাশমত আলী শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ হলেও তিনি ছিলেন কবিত্ব শক্তির অধিকারী।

কবি হাশমত আলী 'কমরুচ রাজা ও কপফুর শাহ' তথা মলয়া-মাহমুদ নামে একখানি কাহিনী কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি আকারে প্রকাণ্ড। তবে মৌলিক সৃষ্টি নয়, কোনো ফারসী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির ভাষা মোটামুটি সুন্দর এবং স্থানে স্থানে নতুন ছন্দ ঝঙ্কারে মুখরিত। কাব্যটিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ আছে। কাজেই ইহা ১৮৫৮ খৃঃ-এর পরে রচিত।

হাশমত আলী 'আরব্য উপন্যাসের' কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেন বলে শোনা যায়—কিন্তু তার কোনো প্রতিলিপি আজো পাওয়া যায়নি।

কবি বহু গান এবং গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলির অধিকাংশই সংগীত এবং 'প্রণয় ও আদিরস ঘটিত'। কোনো কোনো গানে তিনি বাঙলা ও উর্দু পদের অদ্ভুত সম্মিলন ঘটিয়েছেন। যেমনঃ

এ পন্থ দি গেলে বুঝি এয়ার
পাওঙ্গারে।
গর পাওঙ্গা গলে লেপট লে লেওঙ্গারে। ধুঃ
জান মেরে করকে চুরি ধাই কোথা গেল প্যারি
চাতরে চাতরে চোরারে।

www.pathagar.com

কবির আরেকটি গান ঃ

"নবীর কলেমা পড় মুখে, মোমিন ভাইরে
নবীর কলেমা পড় মুখে। ধুঃ
রাত্রি অবশেষ কালে ফিরিস্তা ডাকিয়া বোলে
আমি সব যাই নিজস্থানে
ভুত প্রেত দৈত্যসব ফিরে প্রতি ঘরে ঘরে
তুমি সব রহ সাবধানে।
রাত্রি হৈল অবশেষ রবি হৈল পরকাশ
শয্যা হইতে উঠি বৈস ঘরে।
যেই অঙ্গে বহে স্বর সেই অঙ্গে করি ভর
গৃহ হন্তে নিকল বাহিরে।
ভূমিতে যে দিয়া পাও স্মরি নিজ বাপ মাও
নিজ নাম লইবে যতনে।
অন্তর দেখলে যাইবা, নূরের পেয়ালা পাইবা
তবে পাইবে রসুলের দিদার।
যাহার জরুর যাইবা, সাফ ওজু করিবা
কলিমা পড়িবা মোমিন ভাই
যে পড়ে কলিমাসার, সিন্ধুনদী হইব পার
আখেরে ভিহস্তে হইব ঠাঁই।
ভিহিস্তের হুর সঙ্গে থাকিব কৌতুক রঙ্গে
আনন্দে রহিবে সুখে আর।
ক্ষুরের সাঁকোয়া পার চুলের ধরনী আর
দুই হস্ত নাড়ি হইবা পার।" ইত্যাদি।

(ঘ) সৈয়দ নাসির উদ্দিন

সৈয়দ নাসির উদ্দিন উনিশ শতকের প্রথম দিকের একজন কবি। আওরঙ্গজীবের হতভাগ্য ভ্রাতা শূজা যখন রোসাঙ্গ বা আরাকান যাত্রা করেন তখন কবির পূর্ব পুরুষ সৈয়দ আব্দুল গনি তাঁর সহযাত্রী ছিলেন; তিনি সাতকানিয়া থানার আমীরাবাদ গ্রামে

www.pathagar.com

বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়। কবি 'সিরাজ ছবিল' নামক হাদীস-সম্পর্কিত একখানি কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের দৌলৎপুরের বাসিন্দা, 'অস্ত্রে-শাস্ত্রে বিশারদ' ও 'আলিম গুণিনের' ভক্ত জমিদার জান আলীর নির্দেশে তিনি এ কাব্য রচনা করেন ঃ

"কহিল মোহর স্থানে সেই মহামতি
রচিবারে গ্রন্থ এই করিয়া আরতি
হাদিস না বুজে সবে আরবী বচন।
বুঝিতে রচ পুস্তক বাঙ্গালা বচন।"

গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কবির উক্তি ঃ

"গুরু স্মরি নবি ভজি প্রভুতে মাগিলুং
'ছেরাজ ছবিল' নামে পুস্তক রাখিলুং।
ছেরাজ ছবিল কহে আরবের গণ,
"পন্থেরো চেরাগ' কহে বাঙ্গালা বচন।"

কবির উপর আলাওলের প্রভাব ছিলো ব্যাপক। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আলাওলের বাক্-ভঙ্গী পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। কবির রচনার নমুনা হিসাবে নিম্ন উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"যে চাহ সে কর তুমি আএ নিরঞ্জন
কোন কাজ নহে বিনে আজ্ঞাএ তোমার।
তুই ঢেউ মুই তৃণ আএ জগপতি
ঢেউর সাক্ষাতে তৃণে কি ধরে শকতি।
ঢেউএ তৃণেরে নিআ যথাতে ঠেকাএ
আবশ্য তৃণের যুক্ত যাইতে তথাএ।
কিবা শক্তি ধরে কাষ্ঠ পোতলার গণ
শিল্পীকে যেমত করে নাচএ তেমন।
শিল্পীকে অঙ্গুলি ডোরে যেমত লাড়ঁএ
কাষ্ঠের পোতলা সব তেমত নাচএ
কি শক্তি ধরিতে পারে মৃত কাষ্ঠ যন্ত্র—
যেমতে বাজাএ যন্ত্রী সেই বোলে যন্ত্র।
আর মত বুলিতে না পারে যন্ত্রগণ
তুই যন্ত্রী মুই যন্ত্র আএ নিরঞ্জন।"

www.pathagar.com

'বেনজির বদর-ই-মনির' নামক অপর এক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতার নামও সৈয়দ নাসির। কেউ কেউ মনে করেন আলোচ্য কবি এবং 'বেনজির বদর-ই-মনির' কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি। 'বেনজির বদর-ই-মনির' আরবী হরফে লিখিত একটি প্রেম কাহিনী; ভাষায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই।

(ঙ) মোশারফ আলী

সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবি দীর্ঘকাল বার্মা মুলুকে বাস করেন। তাঁর কাব্যে সীতাকুণ্ডের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে

মোশারফ আলীর কাব্যের নাম 'কমরুজ্জামান ছফুরা খাতুন' বা রসমঞ্জরী। কমরুজ্জামান ইরানের বাদশাহ্ আন্দলণ্ডের পুত্র আর ছফুরা খাতুন চীনরাজ কলিংগদা মণির কন্যা। এদের দু'জনের প্রণয় কাহিনীই এ কাব্যের উপজীব্য। বারশত বত্রিশ মঘীতে কাব্যটি রচিত; ইংরেজি সন হচ্ছে ১৮৭০। এটি একটি হিন্দী গদ্য উপন্যাসের তর্জমা।

"কাব্য মূল ছিল আদ্যে গদ্য উপন্যাস
তছনিপি মোজামেল হক হিন্দুস্থানী ভাশ।"

মোজাম্মেল হক বিরচিত, হিন্দুস্থানী গদ্য উপন্যাস অবলম্বনে এ কাব্য রচিত। রচনা রীতি গতানুগতিক।

(চ) উজির আলী মুন্সী

কবি উজির আলী মুন্সী উনিশ শতকের শেষার্ধের লেখক। তাঁর একটি পুঁথি পাওয়া গেছে—পুঁথিটির নাম 'ছায়েদ কুমারের পুঁথি'। ইহা একটি কাহিনী কাব্য।

কাব্যে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ঃ

"চট্টগ্রাম জেলার মাজে পটীয়ার অন্তর
শ্রীমতির কূল জান উত্তম নগর।
"শ্রীমাই সিন্দুর উত্তর দিগে বেলপর্বত নাম
তাহার উপরে জান অধিন মোকাম।"

www.pathagar.com

পটীয়া থানার নিকটেই শ্রীমতি বলে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামেই কবির জন্ম। কবির পিতার নাম মহম্মদ আলী। পিতামহের নাম রফি এবং পীরের নাম আব্দুল জব্বার। কাব্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ

"রসুলের চারিসখা সিদ্দিক ওমর
হযরত ওসমান আর আলী ধনুর্ধর।
সে সব তারীপ আমি কি কইতে জানি,
সে সকল কহিয়াছে আদ্যর সে গুণি।"

(ছ) হায়দর আহমদ

কবির একখানি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যটির নাম 'এলমাজ্ বাদশার পুঁথি। ইহা একখানা কাহিনী কাব্য। মাগরিবের রাজা শামশাদের ছিল সাত পুত্র। সর্ব কনিষ্ঠের নাম 'এলমাজ্'। এল্মাজ শিকার করতে গিয়ে এক দরবেশের সাক্ষাৎ পায়; দরবেশ ছিলেন কাজিব দেশের রাজা; তাঁর সাত সাতটি পুত্র প্রাণ হারিয়েছে 'অরুণ' দেশের রাজকন্যার সওয়ালের জওয়াব দিতে গিয়ে। রাজকন্যা 'মেহের আঙ্গেজ'কে বিয়ে করতে হলে আগে তার সওয়ালের জবাব দিতে হবে, বা সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু। এই খবরে 'এলমাজ' 'মেহের আঙ্গেজের' প্রতি আসক্ত হয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। অবশ্য বহু চেষ্টার ফলে সে 'মেহের আঙ্গেজ'কে লাভ করে।

কবির পিতার নাম ছদরুদ্দিন। কবির বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলার 'মুরাদপুর' মৌজা ঃ

"মৌজে মুরাদপুর আর জিলে চাটিগ্রাম
শহর কাতালগঞ্জ সাকিন মোকাম।"

কাব্যটি ১২০৪ মঘীতে রচিত। ইংরেজি সন অনুসারে ১৮৪২ খৃঃ। কবি অল্প বয়সে কাব্যটি রচনা করেন। মূল কাব্যটি ফারসী ভাষায় লিখিত; ফারসী এদেশের সর্বসাধারণ বোঝেনা, তাই কবি এর বাঙ্লা তর্জমা করেন ঃ

"ফারছির ভাসে সবে না বুঝে কারণ,
বাঙ্গালার ভাসে রচিলুম তেকারণ"

www.pathagar.com

(জ) আসাদ আলী চৌধুরী

উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি—কবির পিতার নাম; বেচাগাজী চৌধুরী; চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার হোসনাবাদ প্রকাশ 'ধীলমগল নামক গ্রাম। বর্তমানে গ্রামটিকে রাজানগরও বলা হয়ে থাকে। কবি এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন।

'জিন্নন্দিনী' কাহিনীমূলক কাব্য। মনে হয় কবি পূর্ববর্তী কোনো কবির কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করেন।

কবির কাব্যের আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ

"অনন্ত জগত পতি; সেই করতার
অশেষ প্রণাম করি। উদ্দেশে তাহার
অপরূপ অদ্ভুত অদৃশ্য অতুল
অনন্ত অখীল অন্তে সেই সারমূল।"

(ঝ) সলিম উদ্দীন

চট্টগ্রামের কবি সলিম উদ্দীনও উনিশ শতকের শেষার্ধের কবি। কবির একটি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে—কাব্যটির নাম 'তোতী ময়না'। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের কাহিনীর মতোই এ কাব্যও একটি কাহিনী কাব্য—কাহিনীটি অনেকখানি রূপ-কথা ধর্মী।

'নানা বিদ্যায় সুপারজ্ঞ', 'গুণের সাগর', 'রসিক নাগর', 'শ্রীমন্ত ইছুপ আলী'র আদেশে কবি এ কাব্য রচনা করেন। কবির কাব্যটির আরম্ভ এইরূপ ঃ

"সেই শোক কষ্ট দুঃখ সহিতে না পারি
ভ্রমিক হইলু নিজ দেশ পরিহরি।
যেইমতে নানা দেশ ভ্রমনা করিল
যেন মতে সব রাজ্যে কৌতুক দেখিল।"

www.pathagar.com

(এঃ) ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার টেরিআইল গ্রামে কবি ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ক্ষুদ্র একটি কাব্য পাওয়া গেছে—কাব্যটির নাম 'গরকির বচন'। চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় সহ প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক বন্যাকে 'গরকি' বলা হয়ে থাকে। কবিতাটিতে ১২৩৮ মঘী বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যে ধ্বংসকরী বন্যা হয়েছিল, তারই সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থক বর্ণনা আছে। সম্প্রতি ১৯৬১ খৃঃ-এর অক্টোবরে এবং ১৯৬৩ খৃঃ-এর মে মাসে চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় ও তৎসহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে—এই খন্ড প্রলয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমরা নিজেরাই। ১৯৬১ খৃঃ-এর 'গরকি' নিয়েও কবিতা রচিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াজিউদ্দীন চৌধুরীর কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাই সম্পূর্ণ কবিতাটিই নিম্নে তুলে দেয়া হলো ঃ

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
এ তিন ভুবন মধ্যে যার অধিকার।
এ তিন ভুবন মধ্যে তিন খণ্ড হৈল
স্বর্গ মত্য পাতাল বলি নাম যে রাখিল।
স্বর্গেতে রাখিল বেহেস্ত দোজক পাতালে
মর্ত্যেতে আদম সৃজে আশকের হালে।
মহাম্মদ নবি আগে করিলেন পএদা,
তান নূরে ইতি আদি সৃজিলেন খোদা।
ফাতেমা বিবির পদে প্রণাম যে করি,
হাচেন হোচেন পদে শির আমি ধরি।
শরিয়তের চারি ইমাম করিনু প্রচার,
এক লাখ চব্বিশ হাজার পএগাম্বর।
গুনি গণের পাদপদ্মে করি নিবেদন,
হীন ওয়াজদ্দিনে কহে গর্কির বচন।"

(২)

"সওয়ালের তের রোজ পূর্ণিমার দিনে,
বারশ আটত্রিশ মঘি কার্তিক পুনি খেনে।

www.pathagar.com

এলাহি গজব ভেজে বাঙালা জমিনে,
রোজ মঙ্গলবার ছিল জান সব জনে।
শরতের ঋতু ছিল সেইতো সময়,
তক্ত তাজ লুটি নিল আসি বসন্তয়।
বসন্ত হইল রাজা পবন উজির,
বরুন সাহায্য বাহনি হৈল নীর।
বরুন সাহায্য পাই করিলেক জোর,
বসন্ত শরৎ সনে জোরিল সমর।
প্রথম যুদ্ধেতে আইল হনুমানের পিতা,
গৃহ আদি উখারি ভাঙ্গিল বৃক্ষ মাথা।
বরুন সাজিল রণে জল অধিপতি,
লোনা জল পাঠাইয়া পবনের 'ত'...।
তারা দোন যোগ হৈয়া করিলেক বল,
না রাখিল বৃক্ষ আদি বসতি সকল।
উচু নীচু সব ভাঙ্গি করিল সমান,
হরি নিল মেমা আদি বারৈর বরের পান।
উপহার দ্রব্য যত সব হরি নিল,
আবাদি মুলুক সব বিরান করিল।
ছরদ আছিল রাজ্য করিল গরম,
সুখের সাগরে দিল লাগাইয়া গম।
দুনিয়াতে মিষ্ট ফল না রাখিল এক গোট,
মিষ্ট পানি না রাখিল ধুইবারে ঠোঁট।
পবনের জোরে সব সোওয়াইয়া দিল,
জলস্রোত আসি সব ভাসাইয়া নিল।
কার নিল ঘর দরজা কার ধানের গোলা,
কার তামা পিত্তল নিল আর কোলের ছাইলা
ইতি আরম্ভিলাম এবে শুন সর্বজন,
অবধান কর এবে তারিখ বিবরণ।
ভাস্কর দক্ষিণ পানে নেত্র বসাইয়া,
তার ডাইনে বসু রাখি জওন করিয়া।
ঋতু বসু দিন জান বিশ্চিক মাসের,
লিখন সমাপ্ত রোজ গুরু অসুরের।"

www.pathagar.com

(ট) তমিজী

কক্সবাজারের একটি থানার নাম রামু। রামু থানার মিঠাসরাই নামক গাঁয়ে এক জমিদার বংশে আলী হোসেন চৌধুরী ১৮১৫ খৃঃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ চৌধুরী নামেও পরিচিত। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কবি সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতার যে ঐতিহ্য মুসলমান রাজা বাদশাহ্‌রা সৃষ্টি করেছিলেন আলী হোসেন চৌধুরী তা-ই অনুসরণ করেন। তিনি চারজন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রামুর আলী হোসেন চৌধুরীর হাট, গর্জনিয়ার হাট, হাইস্কুল ও মাদ্‌রাসা, তাঁরই কীর্তি।

আলী হোসেন চৌধুরীর আশ্রিত কবি চারজনের নাম—কবি তমিজী, কবি হাজি আলী, ফকির আসকর আলী ও লোকমান আলী।

কবি তমিজীর কাব্যের নাম 'লালমতী-তাজল-মুলুক'। এটি একটি কাহিনী কাব্য। মরহুম আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিখানি প্রথম ও শেষ দিকে খণ্ডিত। এর রচনার তারিখ জানা যায়নি। তবে জনাব আহমদ শরীফের ধারণা—কাব্যখানি ১৮৫৫ খৃঃ-এর মধ্যে রচিত। মস্‌রেকী রাজ্যের রাজা জেবল মুলুকের পুত্র তাজল মুলুকের সংগে মগ্‌রেবী রাজ্যের শাজাদী লালমতীর পরিণয় এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

কবির ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী সুন্দর। তাজল মুলুকের সংগে লালমতীর সাক্ষাতের পর দু'জনের শাদি হয় মনকীর নকীরকে সাক্ষী রেখে ঃ

"আপাদ মস্তক যদি কুমারে হেরিল
পক্ষী প্রায় অপ্সরার ফান্দেত বাঝিল
প্রথমে বয়ান হেরি দিল আলিঙ্গন
শাস্ত্রনীতি নিকাহা পড়িল দুইজন
সাক্ষী হেতু মানুষ্য নাইক কোন জন
মনকীর নকীর সাক্ষী করিলা তখন।"

মিলনের পর দিবাশেষে এলো বিচ্ছেদের লগ্ন ঃ

"দিবাশেষে কন্যা তবে মাগিল মেলানি
বিহঙ্গম আইসএ পাখার শব্দ শুনি
মেলানি দিবারে মুখে না নিঃসরে বাণী
বচনের আগে নিঃসরিতে চাহে প্রাণি।"

www.pathagar.com

আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর তাজল মুলুক বললো ঃ

'মনে লয় মর্মান্তরে তোমা দিতে ঠাঁই
যেন শত্রু না দেখএ রাখিতে ছাপাই।"

(ঠ) হাজি আলী

কবি হাজি আলীর একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। পুঁথিটির কোন নাম নেই—খণ্ডিত পুঁথি। বিষয়বস্তু বিচার করে কেউ কেউ এর নাম করেছেন 'মওত নামা' বলে। মানুষের শরীরে রোগ-ব্যাধি পয়দা এবং মৃত্যুর পর মানুষের দাফন পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার বিশদ বিবরণ এ কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যটি বহু 'বাব' বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

কাব্যটি যে ফারসী হিন্দী কাব্য অবলম্বনে রচিত সে সম্বন্ধে কবির উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"ভাঙ্গিয়া ফারসী হিন্দী লিখি পরস্তাব।"

রচনায় তেমন কোনো বৈশিষ্ট নেই। দাফনের পর, মৃতের প্রতি মওতের উক্তি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

"দাফন পশ্চাতে সঙ্গী মৃত্যুএ কহিব
অই মৃত নাম নিজ ধরিয়া ডাকিব।
তোমার অগ্রেতে আমি আসিয়াছি এথা
কতদিন বিলম্ব করিলি তুই তথা।
আমার সঙ্গতি হৈবি কেনে না স্মরিলি
মৃত্যু পন্থ তুই কি কারনে না চাহিলি।
তোহার হইব মৃত্যু না স্মরিলি মন
ভুলিয়া রহিলি কেনে মালের কারণ।
মালের হিসাব লৈব কেনে না জানসি
অন্তকালে কি হইব না ভাবিলি বসি।"

www.pathagar.com

(ড) কবি ফকির আসকর আলী

কবি ফকির আসকর আলীর পাণ্ডুলিপিটি আসলে আরবী হাদিসের তর্জমা। পাণ্ডুলিপিটি প্রথম ও শেষ দিকে খণ্ডিত। আশ্রয়দাতা আলী হোসেন চৌধুরীর ইংগিতে তিনি এই তর্জমা কার্যে হাত দেন ঃ

"আরবী হাদিস তবে বাঙ্গালা গ্রহণে
প্রকাশিয়া রাখ ভূমে রাজকৃতি সনে।"

অথবা

"আরবী কালাম নবী বঙ্গে পয়ারিয়া
সাবদি রাখহ ভূমে প্রকাশ করিয়া।"

'পঞ্চসতী প্যারজান' নামক মুদ্রিত পুঁথিটিও এই কবিরই রচিত বলে মনে হয়। এটি একটি কাহিনী কাব্য। ভাষা দুর্বোধ্য, কবিত্ব-বর্জিত এবং বহু ক্ষেত্রে অর্থহীন।

(ঢ) লোকমান আলী

কবি লোকমান আলীর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তা-ও আদ্যন্ত খণ্ডিত। পুঁথিটির কোনো নাম নেই। সাহিত্য বিশারদ জনাব আব্দুল করিম এর নামকরণ করেছেন—'হাদিস কালাম বাণী'। তাঁর এইরূপ নামকরণের ভিত্তি নিম্নলিখিত ভণিতা ঃ

"মাতা পিতা গুরুজন শিরে বন্দি সে চরণ
ঝাম্প দিলু সাগরের মাঝে
আলী হোসেন মুখে শুনি হাদিস কালাম বাণী
রচিলেক মোহ্‌সিন কাজে।"

কবির আশ্রয়দাতা, আলী হোসেন চৌধুরীর সাথে, প্রশ্নোত্তর স্থলে কবি হাদিস আলোচনা করেন। আলী হোসেন চৌধুরী একদিন বললেন—দু'জনের এ মৌখিক আলোচনা তো টিকে থাকবে না, আরবী-ফারসীও লোকে বুঝে না, কাজেই কবি যদি এসব বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যে গ্রথিত করেন মানুষের উপকার হবে ঃ

"পার যদি কর সব করি এক ঠাঁই
পুস্তক ভণিতে এক পয়ার মিলাই।

www.pathagar.com

আরবী ফারসী লোকে নাহি বুঝে ভাস,
বাঙ্গালা হইলে পূরে সকলের আশ
বাঙ্গালা করিয়া রচ মোর আজ্ঞা ধরি
এ কথা শুনিব লোকে বহু শ্রদ্ধা করি।"

গ্রন্থখানির সূচীপত্র থেকে জানা যায়, সালাত, রোজা, শরীয়ত, তরীকত, আঠার মোকাম, দশ দরওয়াজা এবং নবীর ওফাতের বিবরণ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নানা ধরনের কেতাব থেকে কবি তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কবির জন্মস্থান পটিয়া থানা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত নাইখাইন গ্রামে। কবির পিতার নাম মোহাম্মদ জমা।

(ণ) নীলকমল দাস

চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাউজানের অন্তর্গত কোয়েপাড়া নিবাসী নীলকমল দাস বিরচিত 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। উনিশ শতকে কিংবা তার পূর্বে বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কোনো কাব্য বা গ্রন্থের সাক্ষাত এ এলাকায় পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে কাব্যটির গুরুত্ব অনেকখানি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, লেখক নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন না।

কাব্যটি চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরা নিবাসী মরহুম আব্দুল হামিদ মাস্টার প্রকাশ করেন। কাব্যের ভূমিকায় প্রকাশক লিখেন—"এক প্রাচীন পালি ভাষায় 'থাদুত্তাং' বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্বত্য প্রদেশের রাজা মৃত ধরমবক্স খান বাহাদুরের পত্নী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা ইহাতে বুদ্ধ দেবের বাল্য ক্রীড়া হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সম্যক ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" ১২৯৬ বাঙলায় এ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলকমল দাস সম্ভবত চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের উক্ত রাজসরকারের কর্মচারী ছিলেন।

www.pathagar.com

কাব্যের ভণিতায় আছে ঃ

"শ্রীমতী কালিন্দী রাণী ধর্মবক্স রাজরাণী
পূণ্যবতী সুশীলা মহিলা
তান আজ্ঞা অনুবলে দাস শ্রী নীলকমলে
এ বৌদ্ধ রঞ্জিকা প্রকাশিলা।"

(ত) শংকর ভট্ট ও সদানন্দ ভট্ট

চট্টগ্রাম জেলার উত্তর রাউজান মুনসেফীর অন্তর্গত কদলপুর একটি বিখ্যাত গ্রাম। 'নিমাই সন্যাস'-এর রচয়িতা শংকর ভট্ট ও সদানন্দ ভট্টের জন্মস্থান এই কদলপুর বলে জানা গেছে। এ ক্ষুদ্র কাব্যটি এঁদের যুক্তরচনা বলে মনে হয়। কাব্যটির চরণ সংখ্যা মাত্র ১৬৮। চট্টগ্রামে বহু বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গেলেও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেব সম্পর্কে অন্য কোনো কাব্য চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে বলে আমাদের জানা নেই।

কাব্যটির ভনিতায় দু'জন কবির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে বলেই এটিকে দু'কবির যুগ্ম রচনা বলে মনে করা হয়। কাব্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ

"বন্দ মাতা সিন্ধু সুতা করি পুটাঞ্জলি
কৃপা কর নারায়নী কহি পদাবলী
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই
নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন
মৎস্য কূর্ম বরাহশ্চ রূপে যে বামন
* * * *
নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ
যেমতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস।"

www.pathagar.com

(থ) রঞ্জিৎরাম দাস

কবি রঞ্জিৎরাম দাসের বাসস্থান চট্টগ্রামের পরৈকোড়া নামক গ্রামে। কবির কাব্যের নাম 'লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি বা পাঁচালী'। ক্ষুদ্র পুস্তিকা, পাতার সংখ্যা মাত্র পনেরো। ভণিতায় আছে ঃ

"লক্ষ্মীর পাঞ্চালি ভনে রঞ্জিৎরাম দাস,
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ।"

কাব্যের বন্দনা অংশটি নিম্নরূপ ঃ

"বন্দম যে গণপতি মূসিক বাহন
চারি ভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন।
গরুড় বাহনে বন্দঘ দেব নারায়ন
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভূষণ।'

কবির বিশ্বাস, যে এই পাঁচালী শুনবে তার মনস্কাম সিদ্ধ হবে আর ভক্তির সাথে যে পাঠ করে 'অন্তকালে' সে 'বৈকুণ্ঠ ভুবনে' যাবে।

কাব্যটিতে তাইর (তাহার, তুচ্ছার্থে), ভোম (ভূমি), উজাল (মাতাল) জালা (অংকুরিত ধানের চারা), নিবৃত্তে (নিমিত্তে), চোবা (চৌচা ধান), চা'র (মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা) পেরাআ, টচক্কা' প্রভৃতি এমন কতকগুলি আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি আজো চাটগাঁয়ে হুবহু ব্যবহৃত হয়।

(দ) রামতনু আচার্য

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা বাসী শ্রীরামতনু আচার্য 'তারিণী চৌতিশা' নামক একখানা কাব্যের লিখক। তাছাড়া শুভংকরের ন্যায় 'দেশীয় কালির' অনেক আর্যারও তিনি রচয়িতা। তাঁর পিতার নাম দৈবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ। জয়কালীর নিকটে 'দেবগ্রামে' তাঁর বসতি ছিলো। দেবগ্রামই বর্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা থানা।

www.pathagar.com

কাব্যটির আরম্ভ ঃ

"গো তারিনি, তারগো এইবার,
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম বারে বার।"

কাব্যটির সমাপ্তি নিম্নরূপ ঃ

"ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী।'
ক্ষিতির জথেক লোক শুনএ বচন
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্বক্ষণ।
তারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে
অন্তকালে জাইবা ভাই ভবানী নিকটে।"

(ধ) রামলোচন দাস

রামলোচন দাসের জন্মস্থান কাশ্মীস (কাশিয়াইস), চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার একটি গ্রাম। তাঁর পিতার নাম রামদুলাল মুন্দার, শ্বশুরের নাম শিবচরণ দেওয়ানজি।

রামলোচন দাসের দু'খানি চৌতিশার সন্ধান পাওয়া গেছে—'ত্রিপদী চৌতিশা' এবং 'আত্ম নিবেদনী চৌতিশা'। 'ত্রিপদী চৌতিশাতে' কবি বাঙলা চৌত্রিশটি হরফের সাহায্যে ত্রিপদী ছন্দে দেবীর চৌত্রিশটি রূপের বন্দনা করেছেন—অক্ষর পরিচয়ের সংগে সংগে দেবীদেরও পরিচয় দিয়েছেন কবি। যেমন ঃ

ক-এ মাতা কাত্যায়ণী
খ-এ খাবর পানি
গ-এ মাতা গজানিন আই
ঘ-এ ঘোরতর রূপা
উমে-ইউমা স্বরূপা
চ-এ চতুর্ভুজ দেবী মাই। — ইত্যাদি।

'আত্ম নিবেদনী চৌতিশা'তে দারিদ্র পীড়িত লেখক ধন-লাভের জন্য ভবানী পদে আত্ম নিবেদন করেছেন। চৌতিশাটির পদসংখ্যা ১৩৬; এবং রচনাকাল ঃ

www.pathagar.com

"রুদ্র বসু চন্দ্র সখী সন নিরূপণ
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন
কুজবার সিত পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে
সমাপ্ত হইল বেলা দশ দণ্ড স্থিতে।"

অর্থাৎ মঘী ১১৮১ সনে বা খৃষ্টীয় ১৮৫৯ সনে চৌতিশাটি রচিত। কবির ভাষা সুন্দর এবং অনুপ্রাসের প্রয়োগ সুষ্ঠু ঃ

"ক্ষেমংকরী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ
খণ্ডাইয়া অবোদ মোর করহ প্রসাদ
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে
খেদ রৈল তুয়াপদ নারি দেখিবারে।"

(ন) ভৈরব আইচ

ভৈরব চন্দ্র আইচের বাড়ীও চট্টগ্রামের দেবগ্রাম (বর্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)। তিনি যে ক্ষুদ্র কাব্যটি রচনা করেন তার নাম 'ষড়ানন ব্রত-কথা'। মাত্র ৫টি পত্রে কাব্যটি লিখিত। কবির ভণিতায় জানা যায়, জরীপের সময় কবির জননী ঘরে না থাকায়, চোরেরা তাঁর সব কিছু হরণ করে নিয়ে যায়। কবির যত 'সম্বল' ছিল সবই অপহৃত হয়। তাঁর পুস্তকাদিও চোরেরা চুরি করে; শুধু 'ষড়ানন ব্রত-কথা'টিই রয়ে যায়।

১২০০ মঘীর ২রা কার্তিকে কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃঃ কাব্যটির রচনাকাল। পূর্বোল্লিখিত হিন্দু কবিদের রচনার মতোই তাঁর রচনা গতানুগতিক এবং দেবমাহাত্ম্য প্রতিপাদক। কবিতাটির বর্ণনা অংশে চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং বাজালিয়া প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ আছে।

রচনার নমুনা ঃ

"মেঘনালে কাট গুয়া মাজে দুইখান
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চূন ভালো আন
সেই চূন দিয়া তবে তুলাইল পান
সুবর্ণের খিলান দিয়া সেই পান তুলান।"

www.pathagar.com

(প) কবিরাজ ষষ্ঠিচরণ মজুমদার

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে কবিরাজ ষষ্ঠিচরণের জন্ম। যৌবনে দারিদ্রের জন্য তিনি গৃহত্যাগী হন। পরে অনেক ধন-সম্পত্তি উপার্জন করে দেশে ফিরেন।

তিনি কয়েকটি শ্যামাসংগীত রচনা করেন বলে শোনা যায়। 'শুকাখ্যান লহরী' নামক একটি গ্রন্থেও তাঁর ভণিতা বিদ্যমান। মরহুম সাহিত্য-বিশারদ ষষ্ঠিচরণের একটি পাণ্ডুলিপির নামকরণ করেছেন—'শনি চরিত্র'। 'ইহার আরম্ভে গুরু বন্দনা, গনেশ বন্দনা, অভয়া বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, সর্বদেব বন্দনা, গৃহ বন্দনা, এবং শনি বন্দনা।' এর পর ভূমিকা থেকে আসল বক্তব্যের শুরু।

ভণিতায় আছে ঃ

তব পদ পংকজে অলিরূপে যেই মজে
সেই যায় অমর ভুবন
পাদ পদ্মে অলি করি রাখ মোরে সুরেশ্বরী
ষষ্ঠিচরণের এই আকিঞ্চন।

প্রাচীন ধারার গীতি কবি

পদাবলীর আদর্শে ও রূপে গীতি কবিতা রচনার যে ধারা মধ্য যুগে প্রবর্তিত হয় উনিশ শতকেও তার জের চলতে থাকে। সূফী ও মা'রফতী ভাবধারা প্রকাশের জন্য উক্ত কাব্যরীতির উপযোগিতা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছিলো। সমাজে পীরবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কাব্যে আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্ব-রস-রসিকতার প্রসারের জন্য অনেকখানি দায়ী। পীর বা গুরুর প্রভাব কিভাবে কবির জীবনে ক্রিয়া করেছে, মধ্য যুগের কাব্যে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। উনিশ শতকে, চট্টগ্রামে দু'একজন কবির রচনায় এ প্রভাবের পরিচয় মেলে।

কবি আলী রজার এক পুত্র কবি এরশাদুল্লাহর কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি আঠারো শতকের একেবারে সমাপ্তির দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর অন্য পুত্র শরফতল্লাহ ১৮৫০ খৃঃ-এর দিকে আশি বছর বয়সে মারা যান বলে জানা যায়। তাহলে

www.pathagar.com

তাঁকে আঠারো শতকের সমাপ্তি ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি বলে ধরা যায়। তিনি তাঁর পিতা কবি আলী রজার মুরীদ ছিলেন; তাঁর নিবাস চট্টগ্রামের ওসখাইন নামক গ্রামে। কবির একটি কবিতার অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

"জাগ মন আলস ছাড়িয়া।
সতত গুরুর নাম জপরে বসিয়া॥
সকল ছাড়িয়া সার পন্থে বান্ধিমন
সত্ত্ব-রজঃতম হের মুদিয়া নয়ন।
উকার সকার আর আকার সহিত
অনাহত চক্র ধ্যান করহ সতত।
রেচক পূরক সঙ্গে তথা বাজে তত।
চন্দ্রসূর সঙ্গে তথা একত্র করিয়া
পঞ্চশব্দ পঞ্চরত্ন তাতে মিলাইয়া।
নানা বাদ্য রঙ্গ তথা হের হর সদায়
কিঞ্চিত কহিল বুঝ তরিতে উপায়।"

কবিতাটিতে চর্যাপদের অনুকরণ লক্ষণযোগ্য।

উনিশ শতকে, এই ধারার আরেকজন গীতি কবি হচ্ছেন মুহম্মদ হাশেম বা হাসিম। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার একটি গ্রাম শ্রীমতি বা শ্রীমাই; এই গ্রামেই কবি জন্মগ্রহণ করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি 'হাশিম পণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পদাবলীর ঢঙে বহু গীতি-কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি গান নিম্নরূপ ঃ

"কৈ খাম কৈ যাম মুঞিরে ননদীর আগুনে
রাত্রি দিবা কানা কানি না সহে পরানে
শাশুড়ি, ননদী জাল সতিনী মোহিনী
এক ঘরে চারিজন মুঞি সে অভাগিনী।
সোয়ামী রসিয়া নাগর মুঞি সে অভাগিনী
ননদীর বাক্য ধরে তত্ত্ব নাহি জানি।
সোয়ামী পদে সেবা দিতে না রহে চিত
এত দুঃখ দেখি আঁখি ভাঙ্গি পরে নিত।"

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

আধুনিক ধারা

ইংরাজ আমলের বাঙ্‌লা সাহিত্যে তথা আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে সব কারণে হিন্দুরা অগ্রণী এবং মুসলমানেরা পশ্চাৎপদ তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষাভাসী সমগ্র অঞ্চল সম্পর্কেই এ কারণগুলি মোটামুটিভাবে সত্য—চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও। প্রসঙ্গক্রমে কবি নবীন চন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছিলো—চট্টগ্রামে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্‌লা কাব্য রচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন নবীন সেন।

নবীন চন্দ্র সেন

(১৮৪৬-১৯০৯)

নবীন সেন চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাউজানের নোয়াপাড়া নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে ১৮৪৬ খৃঃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচনা করেন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন কাল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। কাজেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে যখন মহাকাব্যের যুগ চলছে ঠিক সেই সময়েই নবীন সেনের আবির্ভাব হয়। তিনি মধুসূদনের অনুসারী হিসেবে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

নবীন সেনের প্রথম গ্রন্থের নাম 'অবকাশ রঞ্জিনী (১৮৭১ খৃঃ)। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় বাঙ্‌লা ১২৮৪ সনে। দুটি কাব্যই কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। আন্তরিকতা, ভাবাতিশয্য, অসংযত উচ্ছ্বাস তাঁর এসব কবিতার বৈশিষ্ট। ইংরেজ ভক্ত কবি ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র এডোয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫) নামক কবিতা লিখে বিলাত থেকে ৫০ গিনি পুরস্কার পান। এর মাত্র ২৫ বৎসর আগেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন—সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। কবির স্বাধীনতার কল্পনা "আর্যামিতেই" সীমাবদ্ধ, এবং ইংরাজ প্রশস্তিতে গদ্‌গদ।

www.pathagar.com

'পলাশির যুদ্ধ' নামক ঐতিহাসিক গাঁথা কাব্যখানি প্রকাশিত হবার পর নবীন সেনের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্লাইভের জয় এবং সিরাজের পতন দেখানোই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বিষয়বস্তু। লিরীক উচ্ছ্বাস ও ছন্দ-লালিত্যে মধুর কাব্যটিতে, চরিত্র পরিকল্পনায় কোনো বৈশিষ্ট নেই। সিরাজের পতন মুসলিম শক্তির পতন, কবির তাতে আনন্দের সীমা নেই কারণ আজ থেকে সবাই নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারবে। "মোহনলালের মুখ দিয়ে কবি নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ

"ভারতেরো নহে আজ অসুখের দিন,
আজি হতে যবনেরা হল হতবল,
কিবা ধনী মধ্যবিত্ত, কিবা দীনহীন,
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।"

স্কটের আদর্শে রচিত নবীন সেনের আখ্যায়িকা কাব্য হচ্ছে 'রঙ্গমতী'। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী রঙ্গমতী বা রাঙ্গামাটি এই কাব্যের পটভূমি। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ও বর্ণনা বাহুল্যে ভারাক্রান্ত।

চাকুরী উপলক্ষে কিছুকাল নবীন সেন ঐতিহাসিক স্মৃতি ভারাক্রান্ত রাজগীরে অবস্থান করেন। এ সময় সারা ভারত জুড়ে আর্যামির প্লাবন বইতে থাকে। নবীন সেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে মহাভারত পাঠ করেন এবং এক অভিনব 'ভারত কাব্য' রচনার তাগিদ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণই সে ভারত কাব্যের নায়ক। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', এবং 'প্রভাস'—এই তিনটি কাব্য নবীন সেনের এই উদ্যমেরই ফল। কাব্যত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা হচ্ছে যথাক্রমে 'সুভদ্রাহরণ', 'অভিমন্যু বধ', এবং 'যদুবংশ ধ্বংশ'। এর মূল কথা "নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের রজ্জুতে আর্য-অনার্যের মিলন এবং অখণ্ড হিন্দু সংস্কৃতির পত্তন।" (সুকুঃ সেন) নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যে অবতরণের লক্ষ্য তা-ই।

'রৈবতক কাব্য'টি ২০ সর্গে, 'কুরুক্ষেত্র' ১৭ সর্গে এবং 'প্রভাস' ১৩ সর্গে বিভক্ত। প্রভাসের ১৩শ সর্গে অর্জুনের কাছে শৈল শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা বলছে ঃ

"আর্যদের আছে জ্ঞান আছে শাস্ত্র আর্যদের
অনন্ত শাস্ত্র শিক্ষক আছে আর্য ঋষিগণ—
পতিত অনার্যদের কেহ নাই কিছু নাই,
দিও তাহাদের মুক্তি পতিত পাবন।

www.pathagar.com

এই মন্দিরের ক্ষেত্রে আর্যের ও অনার্যের
হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম
অনার্য ব্রাহ্মণ আর্য গাবে এক কৃষ্ণ নাম
আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান,
প্রতিধ্বনি তুমি সিন্ধু গাবে হরি নাম।"

নবীন সেনের কাব্যত্রয়ীর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আর্য ও অনার্য জাতির মিলন। বিষয়বস্তুটি একটি মহাকাব্যের উপযুক্ত, সন্দেহ নেই; "কিন্তু আখ্যান বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনায় মূলবস্তুর মহত্ব রক্ষিত হয় নাই।" অনার্যরা তাঁর কাছে কৃপার পাত্র, তাঁর অনার্য চরিত্রগুলি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যে তারা আর্যদের চেয়ে হীন; কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে তা সত্য নয়। তাঁর রচনার গাঁথুনি বড়ো শিথিল এবং ছন্দ ত্রুটিপূর্ণ। ভাবাতিশয্য ও ভক্তিরস তাঁর কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য, ফলে অসংযম তাঁর রচনার একটা প্রধান লক্ষণ।

'রঙ্গমতীর' পর নবীন সেন যে সব কাব্য রচনা করেন তার সবগুলিরই বিষয়বস্তু কোনো না কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার জীবনী আলোচনা অথবা ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপার। হজরত ঈসার জীবনী সংক্রান্ত 'খৃষ্ট' (১২৯৭), বুদ্ধের জীবন কথা নিয়ে 'অমিতাভ' (১৩০২) এবং শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা কাহিনী নিয়ে 'অমৃতাভ' (১৩২৪) রচিত হয়। নবীন সেন 'ভগবদ্ গীতা' এবং 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর' পদ্যানুবাদ করেন।

নবীন সেনের গদ্য গ্রন্থগুলির নাম 'প্রবাসের পত্র, 'ভানুমতী, এবং 'আমার জীবন'। 'ভানুমতী নামক গদ্য আখ্যায়িকাটিতে কিছু কিছু পদ্যও আছে। ধর্মমতের দিক দিয়ে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এ গ্রন্থটিতে তার পরিচয় আছে।

নবীন চন্দ্র দাস

চট্টগ্রামের আরেকজন কবি নবীন চন্দ্র দাস, নবীন সেনের কিছু পরবর্তী কালে আবির্ভূত হন। তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদক হিসাবে। মূলানুগত তর্জমার ক্ষেত্রে, বাঙলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান আছে।

নবীন দাস কালিদাসের 'রঘুবংশ' (১৮৯১) ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়' (১৯০৬) এবং 'শিশু পাল বধে'র খানিকটা তর্জমা করেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'আকাশ কুসুম' ১২৯০ বাঙলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে কাব্যটি 'হালি সহর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

শশাঙ্ক মোহন সেন

কবি সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে তাঁর একটা বিশেষ স্থান আছে।

শশাঙ্ক মোহন সেনের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম যথাক্রমে 'সিন্ধু সংগীত' (১৮৯৩), 'শৈল সংগীত' (১৯০৭), 'সাবিত্রী' (১৩১৬), 'স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে' (১৩১৯), 'বিমানিকা' (১৩৩১) প্রভৃতি। তিনি মূলতঃ গীতি কবি হলেও সমালোচনা এবং সাহিত্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণেও বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁর ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। চট্টগ্রামের প্রকৃতি কবি চিত্তকে কী ভাবে গড়েছে তার স্বীকৃতি আছে কবির 'শঙ্খনদী' নামক কবিতায় ঃ

তুমি মম জীবনের জননী-নির্ঝর
তোমাতে বর্ধিত এই অশান্ত কাতর
অনন্ত অতৃপ্তি লয়ে, ছুটি অনিবার
এত দূর আসিয়াছি।

সাহিত্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণমূলক কবির বিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গবাণী' বাঙলা সাহিত্যে একটা মূল্যবান অবদান। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ 'মধুসূদন' (১৯২১) বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ গ্রন্থগুলির অন্যতম।

কবি তাঁর এক আত্মীয় কর্তৃক নিহত হন।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

(১৮৭১-১৯৫৩)

চট্টগ্রামের গৌরব, মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্মস্থান চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। এতিম আব্দুল করিম চাচা ও দাদার হাতে মানুষ হন। এফ,এ, পর্যন্ত পড়ে, পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি জীবিকার্জনের জন্য চাকুরী গ্রহণ করেন। স্কুলসমূহের বিভাগীয় ইন্‌সপেক্টারের অফিসে তিনি দ্বিতীয় কেরাণীর কাজ করে নিজের সংসার চালাতেন।

মুন্‌শী আবদুল করিমের সাহিত্যিক জীবনের দুটি ধারা লক্ষ্যযোগ্য। "একটা হইল প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও তাহার তথ্য তালাস করা—অপরটি হইল সাময়িক পত্রাদি

www.pathagar.com

পাঠ।" তাঁর বিশেষ কীর্তি হচ্ছে প্রাচীন পুঁথিপত্রের সংগ্রহ। বিশেষ করে তিনি মুসলিম কবিদের তথ্য উদ্‌ঘাটনে ছিলেন তৎপর। বহু পত্রিকার লেখক ও বহু পত্রিকা সম্পাদক মুন্‌শী আবদুল করিমের নিজস্ব কোনো মৌলিক গ্রন্থ নেই। যে সব পুঁথি পুস্তকের সংগে তাঁর নাম জড়িত আছে সে সবই তাঁর সম্পাদিত পুঁথি এবং কোনো না কোন প্রাচীন কবি কর্তৃক রচিত। ডঃ এনামুল হকের সংগে তিনি যুগ্মভাবে 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গবেষণা পুস্তক লিখে মুসলিম সাহিত্যের একটা গৌরবময় অতীত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা হচ্ছে প্রায় ছয় শতাধিক প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধেই সাহিত্য বিশারদ তাঁর গবেষণালব্ধ সমস্ত তথ্য ধরে রেখেছেন। অবশ্য সাহিত্য বিশারদের পাণ্ডিত্য ও মনীষার পূর্ণ পরিচয় বহন করছে তাঁর সম্পাদিত পুঁথিগুলি। তাঁর রচনা মৌলিক না হলেও সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছেন তা মৌলিকতায় অসাধারণ। তাঁর সম্পাদিত 'রাধিকার মান ভঙ্গ' নামক পুঁথির ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ

"তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন—সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না।"

সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' প্রকাশের পর পরিষদের সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁকে লিখেন ঃ

"আপনি যেরূপ অফুরন্ত অধ্যাবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙ্‌লা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাহাতে আপনার নিকট বঙ্গ সমাজ চিরঋণী থাকিবে। ... আপনার ঋণের পরিশোধে আমরা অক্ষম। আপনার প্রবন্ধগুলি পাঠক সমাজে প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ আপনার নিকটে ঋণমুক্ত হইতে পারিলেই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করিতে পারিব। আপনার পুরস্কার ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের হস্তে।"

বাঙ্‌লা সাহিত্যে সাহিত্য-বিশারদের অবদানের মূল্য নির্ণয়ের ব্যাপারে এই দুইজন সাহিত্য-সাধক মনীষীর উক্তিই যথেষ্ট।

সাহিত্য-বিশারদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার; তাঁর মধ্যে মুসলমান রচিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বারোশতের উপর বলে জানা গেছে। তাঁর সংগৃহীত মুসলিম রচিত পাণ্ডুলিপিগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হিন্দু রচিত পাণ্ডুলিপিগুলি রাজশাহী 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র হেফাজতে রক্ষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সাহিত্য-বিশারদ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ১৫০ জনেরও বেশী মুসলিম কবি ও গ্রন্থকারের নাম ও কীর্তি উদ্ধারে সমর্থ হন। তিনি প্রমাণ করেছেন—মধ্য যুগে, এমন কি ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরাই ছিলেন অগ্রসর, সৃষ্টি প্রাচুর্যে ও বৈচিত্রে শ্রেষ্ঠতরো।

সাহিত্য বিশারদের সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়', রতি দেবের 'মৃগলুব্ধ' এবং আলী রজার 'জ্ঞান-সাগর' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) মহামূল্যবান গ্রন্থ; এ গ্রন্থ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের গবেষক মাত্রের পক্ষেই প্রধান অবলম্বন। তাঁর সম্পাদিত 'মুসলিম প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হওয়াতে, মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' পুঁথিটি আজো মুদ্রিত হয়নি। ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক ৪ খণ্ডে সম্পাদিত 'মুসলিম বৈষ্ণব কবি', নামক পুস্তকের মাল-মশলা সাহিত্য-বিশারদই সংগ্রহ করেন।

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী

(১৮৭৫—১৯৫০)

মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার 'বরমা' গ্রামে ১৮৭৫ খৃ-এ জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফারসী, ও উর্দূ ভাষায় সুপণ্ডিত ইসলামাবাদী সাহেব রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মী হিসাবেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এ জন্য তাঁর সাহিত্য-কীর্তি অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী এবং পাকিস্তান বিরোধী। তা সত্ত্বেও গঠনমূলক সামাজিক কর্মী হিসাবে তাঁর কীর্তি মুছে যাবার নয়। চট্টগ্রামের 'ইসলামাবাদ টাউন ব্যাংক', ও 'এতীমখানা' তাঁরই কীর্তি।

সাংবাদিক হিসাবে ইসলামাবাদী সাহেব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'আল-ইসলাম' ও 'দৈনিক সুলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানাবিধ প্রবন্ধ সেকালে একটা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিলো।

www.pathagar.com

রাজনীতি ও গঠনমূলক সামাজিক কার্যকলাপে তাঁর জীবন নিয়োজিত থাকলেও মুসলিম জাতির অতীত ঐতিহ্যের উদ্ধারের জন্য যেমন তিনি গবেষণা করেছেন, ঠিক তেমনি সমসাময়িক মুসলিম জগৎ ও জাতির নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি কলম ধরেছিলেন। 'খগোল' শাস্ত্রে মুসলমান, 'ভূগোল' শাস্ত্রে মুসলমান', 'ভারতে মুসলিম সভ্যতা', 'ভারতে ইসলাম প্রচার'—প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের লুপ্ত উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য ইসলামাবাদী সাহেবের মধ্যে যে উদ্যম দেখা যায় তা সত্যই প্রশংসার্হ। জাতিকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসলে এ ধরনের কাজের তাগিদ আসে তার প্রমাণ তাঁর এই পুস্তকগুলি।

'মুসলিম জগতের অভ্যুত্থান ও কনস্টানটিনোপল' নামক গ্রন্থে ইসলামাবাদী সাহেবের সমকালীন মুসলিম জগৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইসলামী রাজনীতির মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন 'কোরাণ ও রাজনীতি' নামক গ্রন্থে। 'সমাজ সংস্কার', 'সুদ সমস্যা', 'কোরআন ও স্বাধীনতার বাণী' 'নিম্ন শিক্ষা ও শিক্ষাকর' প্রভৃতি পুস্তকে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মেলে। 'নিজামুদ্দিন আওলিয়া' তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ।

তাঁর সম্পাদিত 'আল ইসলাম' পত্রিকায় তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নজির আহমদ চৌধুরী

বাঁশখালী থানার সাধনপুর ডাকঘরের অধীন, ডোগরা গ্রামে নজির আহমদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মকবুল আহমদ চৌধুরী। তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ সাংবাদিক হিসাবে। তিনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

তর্জমাকার হিসাবেও তাঁর নাম আছে। তিনি আল্লামা শিবলী নোমানীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল্-ফারুক' 'ফারুক চরিত' নামে তর্জমা করেন। পুস্তকটি মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা রাখে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর আগে লেখক কলকাতায় ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

আবুল মা আলী মুহম্মদ হামিদ আলী

কবি হামিদ আলী আখ্যান-কাব্য রচয়িতা হিসাবে সেকালের কাব্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মোট চারটি কাব্য রচনা করেন।

কবির প্রথম কাব্য 'ভ্রাতৃ-বিলাপ' ১৩১০ বাংলা মাঝামাঝি কোনো এক সময় প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, ভ্রাতৃ বিয়োগজনিত গভীর বেদনাই তাঁর মধ্যে কাব্যশক্তির স্ফূরণ ঘটায়। কবির জাতীয়তাবোধ ছিলো প্রবল। সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, এই নীতিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না; বরং 'মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়ার সংকল্প' নিয়েই তিনি কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কবির এই উদ্যম স্বভাবতঃই আমাদের মনে তাঁর প্রতি গভীরে সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করে।

কবির পরবর্তী তিনটি কাব্যের নাম 'কাসেম বধ', 'জয়নালোদ্ধার' এবং 'সোহ্‌রাব বধ'। কাব্যগুলির নাম থেকেই কবির মানসিকতার দিক্‌নির্দেশ মেলে। ঐতিহ্য সচেতন কবি কাব্য রচনা করতে গিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের উপরই নির্ভর করেছেন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'কাসেম বধই' সর্বশ্রেষ্ঠ। ছন্দের ত্রুটি এবং চরিত্র চিত্রণে দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর রচিত কাব্যগুলি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

www.pathagar.com

মাহবুব উল্ আলম

জন্ম–১ মে, ১৮৯৮, ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক। 'মোমেনের জবানবন্দী' নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম সুপরিচিত হন। 'মোমেনের জবানবন্দী' আত্ম–কথা জাতীয় রচনা; আন্তরিকতা ও সুনিপুণ বর্ণনার গুণে রচনাটি রসোত্তীর্ণ।

মাহ্‌বুবুউল আলমের দুটি গল্প সংকলন 'তাজিয়া' ও 'পঞ্চঅন্ন'। 'মফিজন' তাঁর একটি বড়ো গল্প। 'গাঁয়ের মায়া' –তাঁর উপন্যাস। গ্রন্থকারের 'পল্টন–জীবনের স্মৃতি' রচনা হিসাবে উপভোগ্য। 'গোফ–সন্দেশ' নামক একটি 'ব্যঙ্গ–রচনা' ও তাঁর রয়েছে।

এইসব গল্প ও আত্মকথা ছাড়া, তিনি কয়েকটি ইতিহাস পুস্তক এবং দেশ পরিচিতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'বার্মার হাংগামা', 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (পুরানা আমল), 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (নবাবী আমল) উল্লেখযোগ্য। বহুদিন তিনি সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৭ আগষ্ট, ১৯৮৬ তে ইন্তেকাল করেন।

দিদারুল আলম

মাহবুবুউল আলমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিদারুল আলম কয়েকটি বাস্তবধর্মী ছোটো গল্প রচনা সাহিত্যিক মহলে সীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগে, অতি অল্প বয়সেই মারা যান।

মুহম্মদ এনামুল হক

জন্ম––১৯০৬; চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখ্‌তপুর গ্রামে। বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, ডঃ এনামুল হক তাঁদের অন্যতম। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' এবং 'চট্টগ্রামী বাঙলার রহস্যভেদ' নামে তাঁর দু'খানা গবেষণামূলক পুস্তক প্রাক–স্বাধীনতা আমলে ছাপা হয়। এছাড়া, মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগে, যুগ্মভাবে তিনি 'আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য' নামক একখানি পুস্তক রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্যের একটি বিস্তৃত অথচ গৌরবময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। ডাঃ হক্ কিছু প্রাচীন কলমী পুঁথিও সংগ্রহ করেন। তাঁর পাকিস্তানোত্তর কালের উল্লেখযোগ্য রচনা 'বঙ্গে ইসলাম' এবং 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য'। শেষোক্ত পুস্তকটি মুসলিম বাংলা–সাহিত্যের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক মৌলিক ইতিহাস।

আবুল ফজল

জন্ম–১ জুলাই, ১৯০৩, কাজির পাড়া, কেউচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রামে বহু গ্রন্থ রচয়িতা আবুল ফজলের বইগুলোর নাম––––মাটির পৃথিবী, আয়েশা, চৌচির, সাহসিকা,

www.pathagar.com

জীবন-পথের যাত্রী, রাঙা প্রভাত, কায়দে আজম, একটি সকাল, আলোকলতা, প্রগতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবন, রেখাচিত্র, শ্রেষ্ঠগল্প প্রভৃতি । আবুল ফজলের সাহিত্য চর্চা দীর্ঘদিনের। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা, এমনি কি ধর্মগ্রন্থের তর্জমায়ও তিনি ছিলেন নিরলস। শিল্প ও সাহিত্যগুণের দিক দিয়ে তার নিরলস লেখনী চালনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ও বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্

জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ১০ অক্টেবর, ১৯৭১। এই প্রতিভাবান লেখক ছোটো গল্প রচনা করে প্রাক-পাকিস্তান আমলে প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'নয়ন তারা' দুই তীর, গল্প সমগ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস 'লাল সালু' 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো'।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ 'বহিপীর' নামক একটি নাটকও লিখেছেন।

বুলবুল চৌধুরী (১৯১৯-১৯৫৩)

নৃত্য-শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর জন্ম চট্টগ্রামের 'সাতকানিয়া থানায়। কথা শিল্পী হিসাবেও তাঁর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিলো। বৃটিশ আমলে 'মাসিক পরিচয়ে' প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গল্প পাঠক মহলে প্রচুর ঔৎসুক্য জাগিয়েছিলো। পাকিস্তানী আমলে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'প্রাচী' তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

ওহীদুল আলম

জন্ম ১ জানুয়ারী, ১৯১১, ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম। মাহবুব-উল আলমের ভাই ওহীদুল আলম প্রধানতঃ কবি এবং গৌণতঃ গল্পী। তাঁর উপন্যাস শামীমা, সোনাগাজী, জীবনী---- আমাদের নেতা, স্মৃতিকথা----পৃথিবীর পথিক, ইতিহাস-চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য। তাঁর প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'জোহরার প্রতীক্ষা' । তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

আবুল কাসেম

পাকিস্তানী আমলের লেখক-----জন্ম চট্টগ্রামের পটীয়া থানার ছেবন্দী বরমা গ্রামে ১৯২০ সনে। তিনি মূলতঃ প্রবন্ধকার। ভাষা আন্দোলনের জনক ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী। এই উদ্দেশ্যে, তিনি যেসব পুঁথি পুস্তক লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে 'একমাত্র পথ', (অধ্যাপক শাহেদ আলীর সংগে যুগ্মভাবে রচিত), 'শ্রেণী সংগ্রাম ও মার্ক্সবাদ,' একুশ দফার রূপায়ন' 'ইসলাম কি

www.pathagar.com

দিয়েছিলো ও কি দিতে পারে', 'আধুনিক চিন্তা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্লা ভাষায় স্কুল-কলেজের উপযোগী বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় তিনি পথিকৃত।

ফেরদৌস খান

জন্মঃ ১ ডিসেম্বর, ১৯২২, চট্টগ্রাম। পাকিস্তানোত্তর কালের লেখক। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনার ক্ষেত্রে লেখক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাঙ্লা হরফের হেরফের' এবং 'শিশু মনের পরিপুষ্টি' নামক তাঁর দুটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এগুলোতে তাঁর যুক্তিবাহী মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'সর্বোত্তম কাহিনী' আমপারার অনুবাদ' ছড়ার ফুলঝুরি, তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আবদুর রহমান

স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর আবদুর রহমান আলকোরআনের নির্বাচিত কতকগুলো আয়াতের প্রাঞ্জল তর্জমা এবং এসব আয়াতে বিবৃত ইসলামের চিরন্তন নীতিগুলির বিশদব্যাখ্যা 'কোরআন ও জীবন দর্শন' নামে ২ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এদেশে এ উদ্যম অভিনব। লেখক বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত দৃষ্টি ভংগীতে, আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলির উপর আলোকপাত করে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তিনি যে আত্ম-জীবনী লিখেছেন তা ও বহু প্রশংসিত।

আহমদ শরীফ

জন্ম-১৯২১, সুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রাম। পাকিস্তানোত্তর কালের লেখক। প্রাচীন মুসলিম পুঁথি পুস্তকের আলোচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চাচা মরহুম মুন্‌শী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদেরই উত্তরাধিকারী। তাঁর সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই 'মধু মালতী', 'ইউসুফ জোলেখা', 'মুসলিম পদকর্তা', 'তোহফা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ---- বিচিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, জীবনে সমাজে সাহিত্য , যুগমন্ত্রনা, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, প্রত্যয় প্রত্যাশা প্রভৃতি।

আব্দুল হক চৌধুরী ----- চট্টগ্রাম জেলার নোয়াজিশ পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম ১৩২৮ বাংলা, তারিখ ৭ ভাদ্র। আব্দুল হক চৌধুরী প্রকাশিত গ্রন্থ--চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, সিলেটের ইতিহাস প্রসংগ।

সফিনাজ নুরুন্ নাহার ঃ জন্ম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১, চট্টগ্রাম। কাব্য-----আমার ভালোবাসার ফুল; গল্প--সোনালী দিগন্তের ইশারা; শিশু সাহিত্য সন্দীপার চার বছর স্মৃতিকথা----এলেম আপন দেশে।

www.pathagar.com

সুচরিত চৌধুরী- জন্ম ২১ জানুয়ারী, ১৯৩০ কদূরখীল, চট্টগ্রাম, ছোট গল্প- আকাশে উড়ে ঘুড়ি, একদিন একরাত, শেষ্ঠ গল্প- অনুবাদ-নানা

ছোট গল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার

সুলতানা রহমান- ১৯২৪, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম,

গ্রন্থ বুলবুল চৌধুরী, বুলবুল চৌধুরীর পুণ্যজীন, শিশু সাহিত্য কাকের ছা বকের ছা, আমাদের মহানবী।

এন, এম, হাবীব উল্লাহ্ ঃ জন্ম ১৯৭৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের পোকখালী গ্রামে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "রোহিঙ্গা জাতীয় ইতিহাস", "অসীমে পাড়ি" জনাব এন, এম, হাবীব উল্লাহর দু'টি উল্লেখযোগ্য বই।

হাল আমলের আরো কতিপয় লেখক-লেখিকা

উপরে আলোচিত লেখকগণ ছাড়াও চট্টগ্রামে আরো বহু লেখক-লেখিকা রয়েছেন। কামালুদ্দীন খান প্রবন্ধ রচনা ও সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরেই 'প্রেমের দেশে' নামে একখানা ভাবাবেগপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন আলদীন আলীনূর। তিনি কবিতাও রচনা করেছেন। আহমদ ফরিদ একদা বহু বুদ্ধি-প্রধান উচ্চাংগের প্রবন্ধ রচনা করে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ, এ, রেজাউল করীম চৌধুরী বহু সার্থক গীতি-কবিতা রচনা করেছেন। মাহফুজুল হক, গল্পকার শহীদুল্লাহ্ সাবের, চৌধুরী জহুরুল হক, মোহাম্মদ হোসেন খান, চট্টগ্রামের কয়েকজন আধুনিকতম লেখক। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আইনুন নাহার, নুরুন নাহার জহুর, মমতাজ বেগম, জুলেখা খাতুন, চেমন আরা, শিরীন জহুর, উমরাতুল ফজল ও আলেয়া চৌধুরীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য

মুখে মুখে প্রচলিত অলিখিত সাহিত্য বা লোক সাহিত্যে চট্টগ্রামের ভাষা, নিসর্গ ও মানব প্রকৃতির যে নিগুঢ় পরিচয় মেলে তেমন আর কিছুতেই নয়। চট্টগ্রামের লোক-সাহিত্যকে পালাগান বা কাহিনীগান, প্রেম, আটিয়ালী, জারি, বারোমাসী, মর্সিয়া, ছাঁদ পেটা, হাইল্যা, পুঁথিয়ালী, উৎসব-পার্বনমূলক, খেলাধূলামূলক ও দরবারীগান, গাজীর গান—ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

চট্টগ্রামের পালাগানগুলির বেশির ভাগই সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই পালাগুলির অধিকাংশই প্রেমমূলক হলেও ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলির মতো এগুলি কোমল এবং নারী প্রধান নয়। মুখ্যতঃ এগুলি পুরুষ প্রধান এবং সংঘাত-সংগ্রাম বহুল। একদিকে দুর্দান্ত দস্যু হার্মাদের দল, অন্যদিকে খামখেয়ালী সমুদ্রের ধ্বংসলীলা—এ দু'য়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পালাগানগুলির অধিকাংশ নায়ক তাদের অভীষ্টকে পেতে চেয়েছে। চট্টগ্রামের উপকূলভাগ উন্মুক্ত বলেই শুধু সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসের দ্বারাই চট্টগ্রাম বারংবার আহত হয়নি, বৈদেশিক জল দস্যুদেরও বারবার চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চলে বয়ে এনেছে। চট্টগ্রামকে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। আরণ্যক ও নাবিকরক্তের উত্তরাধিকারও চট্টগ্রামের লোক-চরিত্রের বীরত্ব ও পৌরুষের অন্যতম কারণ। এ অঞ্চলের পালাগানগুলির নায়কদের মধ্যে যে সাহস ও বেপরোয়া মনোভাব দেখা যায় তা সমুদয় বাঙলা সাহিত্যেই বিরল।

জীবনের এমন কোনো দিক নেই চট্টগ্রামী পল্লীগীতির কোনো না কোনোটিতে যার প্রকাশ ঘটেনি। এদিক দিয়ে এই পল্লী বা লোকগীতিকাগুলি চট্টগ্রামের গণজীবনের সার্থক পরিচয়বহ।

পালাগান পরিচয়

ভেলুয়া

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার গান এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। এই গানের অনেকগুলি মুদ্রিত সংস্করণও আছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত পালাগানটি আশুতোষ

www.pathagar.com

চৌধুরী চট্টগ্রামের কয়েকজন পালাগান গায়কের নিকট হতে সংগ্রহ করেন। এঁদের মধ্যে রাউজানের বাগোয়ান গ্রামের জেবল হোসেন, লাম্বুর হাটের ইসমাইল এবং রাংগুনিয়া থানার পোমরা গ্রামের ওমর বৈদ্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ওমর বৈদ্যের নিকট থেকেই তিনি সমগ্র পালাটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

ভেলুয়ার পালার পটভূমিকা

এই গানটিতে উল্লেখিত শাফ্‌লাপুর আর মহিষখালী দ্বীপের অন্তর্গত শাফ্‌লাপুর অভিন্ন। এককালে, বিশেষ করে পর্তুগীজ দৌরাত্ম্যের সময়ে, শাফ্‌লাপুর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিলো। ভেলুয়ার পিত্রালয় তৈলন্যাপুর হচ্ছে, আনোয়ারা থানায় শংখনদীর তীরস্থ সমুদ্রোপকূলবর্তী তৈলারদ্বীপ। ভোলা সদাগরের বাড়ী ছিলো কাউলী গ্রাম—এখানে পাহাড়তলী স্টেশনের নিকটেই ভেলুয়ার দীঘি বর্তমান। 'খুলসী'র ঢালার পশ্চিমেই কাউলী। খুল্‌সীতেই সম্প্রতি চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সারেঙ্গ বাদক টোনাবারুই-এর বাড়ী রাঙ্গুনিয়া থানার সৈয়দ নগরে। সেখানে টোনা বারুই-এর ভিটা আজো বিদ্যমান। ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত সরইপাড়া নামক স্থানে কাব্য বর্ণিত মুনাপ কাজির কাছারী ছিলো। চতুস্পার্শবর্তী এলাকা আজো কাজিরপাড়া নামে খ্যাত। এখানে মুনা কাজির নামে দিঘী আছে।

কুড়াল্যামুড়া নামক পাহাড়টি চট্টগ্রাম হতে বিশ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর নিকটে অবস্থিত; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্থানটি মনোরম। কুড়াল্যামুড়ার কিছু উত্তর-পূর্বে ভয়াবহ কাউখালীর পাক বা ঘূর্ণি; আমির সদাগর এই ঘূর্ণিতেই ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। কাব্য বর্ণিত শ্রীমাই, শংখ, কাইচা প্রভৃতি নদী চট্টগ্রামে সুপরিচিত।

কাহিনী

শাফ্‌লা বন্দরের মানিক সদাগরের একমাত্র পুত্র আমির সদাগর শিকারে বেরিয়ে তেলন্যানগরের ভেলুয়া সুন্দরীর প্রিয় কবুতরীকে তীর বিদ্ধ করে। তীর-বিদ্ধ কবুতরী ভেলুয়ার কোলে এসে পড়লে ভেলুয়া হায় হায় করে ওঠে, এবং তার সাত ভাই, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমির সদাগরকে বেঁধে নিয়ে আসে। পথে জানা গেলো, আমীর সদাগর ভেলুয়ারই খালাতো ভাই এবং তারই সংগে ভেলুয়ার বিয়ে দিতে ভেলুয়ার মা

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরপর তাদের বিয়ে হয়ে গেলো, এরপর আমীর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরলো।

কিছুদিন পর আমীর সদাগর বাণিজ্যে বেরোলো। কিন্তু পথ ভুলে রাত্রে আবার নিজের ঘাটেই ফিরে এলো। ফিরে এসে সে ভেলুয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলো, এবং ভেলুয়ার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, তাকে ঘুমে রেখে, দরজা বন্ধ না করেই আবার তার বাণিজ্যের নৌকায় গিয়ে চড়লো। এরই সুযোগ নিয়ে আমীর সদাগরের বোন ভেলুয়ার উপর সতীত্বহীনতার অপবাদ দিলো। আর ভেলুয়ার উপর শুরু হলো মা-এ-ঝি-এ মিলে অকথ্য নির্যাতন। একদিন ভেলুয়া কাঁখে কলস নিয়ে ঘাটে পানি আনতে গেলে ভোলা সদাগর তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার জন্য সাধাসাধি শুরু করে; ভেলুয়াকে সে বলে যে, আমীর সদাগর মারা গেছে। ভেলুয়া নিরুপায় হয়ে ইজ্জত পালনের জন্য তার কাছে ছ'মাসের সময় নেয়।

এদিকে বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আমীর সদাগর সব কিছু বুঝতে পেরে বিরাগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং চট্টগ্রামের বহু দুর্গম এলাকা সফর করে, রাঙ্গুনিয়া থানার সৈয়দ নগরে পৌঁছে, টোনাইবারুইএর নিকট সারেঙ্গ বাজাতে শেখে ও সেখান থেকে কাট্টলী পৌঁছে ভেলুয়ার দেখা পায়। ভেলুয়া তার সংগে পালিয়ে যেতে বললে— আমির সদাগর বললো—সে বীর পুত্র, ভেলুয়াকে চুরি করে নিয়ে সে পালাতে পারে না। সে মুনাপ কাজির কাছে বিচার দিলো। কিন্তু বুড়ো কাজি নিজেই ভেলুয়ার উপর আশক হয়ে উঠলো। ভেলুয়াকে নিজের ঘরে রেখে দিয়ে সে আমির সদাগরকে তাড়িয়ে দিলে, আমির দেশে ফিরে বহু লোক-লস্কর নিয়ে ভেলুয়া উদ্ধারে বেরোলো। এদিকে, ভীত মুনাপ কাজি, কাট্টলী গিয়ে ভোলাকে বললো— 'এ নারী তোমার মতো যুবককেই মানায়'। তারপর সে বললো আসল কথা—আমির সদাগর তাকে উদ্ধার করতে আসছে। ভোলাও সাজলো তার লোক লস্কর নিয়ে। দু'দলে লড়াই হলো। ভোলাকে হত্যা করা হলো, কাজি বেহুঁশ হলো, ভোলার বাড়ী ঘর ধ্বংস করে সেখানে দীঘি দেয়া হলো তারি নাম ভেলুয়ার দীঘি।

অস্থি-চর্মসার ভেলুয়াকে কাজির ঘর থেকে উদ্ধার করে নৌকোয় করে আমির সদাগর নিয়ে চললো দেশে, শাফলা বন্দরে। নৌকা শাফলা বন্দরে এসে ভিড়লো— দেশের লোক সব জমায়েত হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন করবার জন্য—কিন্তু হায়!

"বন্দরের লোক জন দেখে খাড়া হই
ঘাটে আইল চৈন্দ ডিঙ্গা মরা কন্যা লই।"

www.pathagar.com

চরিত্র সৃষ্টি

এই পালা গানটিতে একটা বৈশিষ্ট লক্ষিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার পালা গানগুলিতে নারী-চরিত্রগুলিরই প্রাধান্য; পুরুষ চরিত্রগুলি যেন গৌণ এবং অনেকখানি নিষ্প্রভ। কিন্তু 'ভেলুয়ার পালাগানে নায়ক আমির সদাগরের চরিত্রের পৌরুষ দীপ্ত মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। ভেলুয়ার চরিত্রটিও মাধুর্যমণ্ডিত।

কালিদাসের মেঘদূত ভারতের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে অলকায় পৌছেছিলো—আমির সদাগর শাফ্‌লা বন্দর থেকে, পায়ে হেঁটে চট্টগ্রামের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে খুল্‌সীর ঢালা অতিক্রম করে কাট্টলী নগরে পৌছেছিলো।

ভেলুয়ার কাহিনী উপকথা নয়, এর ভিত্তি ইতিহাসের উপর। 'তারিখই হামিদী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা হামিদুল্লাহ্ খান, হোসেন শাহের পুত্র নস্‌রত শাহের সময়ে ষোড়শ শতকে, এই ঘটনা ঘটে বলে বর্ণনা করেছেন। আমিরের পত্নী ভেলুয়াকে ভোলা সদাগর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো; ইতিহাস পুস্তকে, ভোলাকে 'চোর সদাগর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চোর সওদাগরের সাথে আমিরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ 'তারিখই হামিদী'তে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই পালাটি এককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা 'বিবাহ বাসরে' গাইত। এসব গান চট্টগ্রামে 'হাওলা' নামে পরিচিত।

হাতী খেদা

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসামের অরণ্য সমূহ হাতীর প্রধান আবাস স্থল। এ এলাকার লোকেরাই জগতে প্রথম হাতী ধরার কৌশল উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতিকে খেদা বলা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর ও ব্রহ্মদেশের পাহাড় সমূহ পরস্পর সংলগ্ন এক বিরাট এলাকা। এই অরণ্য সংকুল বিশাল এলাকায় হাতী, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, গয়াল প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতির জন্তুরা বিচরণ করে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায়, 'হাতী খেদা' নামক যে পালাটি গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায়, এইসব পাহাড়ের গুহায় বিপুলকায় অজগর এবং চন্দ্রবোড়া সাপ চলাফেরা করে; সাপগুলি এমনি ভীষণাকৃতি ও বৃহৎ যে এদের মুখের সন্ধান পেলে লেজের সন্ধান করতে হয় অনেক দূরে। দলবদ্ধ হাতীর ডাকে ভীত হয়ে এসব সর্পও গুহার গহীনে গিয়ে আত্মগোপন করে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের নয়াপাড়া নিবাসী মকবুল আহমদ 'হাতী খেদা' নামে ছোট্ট একটা পালা গান রচনা করেছিলেন। অছি মিঞা নামক এক বিখ্যাত শিকারীর হাতী ধরার কাহিনী এ পালা গানে বর্ণিত হয়েছে। গানটি চট্টগ্রাম স্বরস্বতী প্রেস হতে মুদ্রিত হয়েছিলো। এই খেদা নির্মাণের ব্যয় বহন করেন চট্টগ্রামের চকবাজার নিবাসী জমিদার নবকৃষ্ণ রায়। অছি মিঞার সহকর্মী ছিলেন মফিজুল্লাহ্ চৌধুরী, আর পথ প্রদর্শক ছিলেন শিকদার মেহের আলী ও ধুঞ্চি নামক জৈনক মগ। এই খেদায় ৪৫টি হাতী ধরা পড়ে। মকবুল আহমদ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার বর্ণনা করেছেন জোরালো ভাষায়।

মকবুল আহমদ রচিত 'খেদার' ঘটনাটি খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত হাতীগুলো ৪০ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করে নিয়েছিলেন।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত 'হাতী খেদা' নামক পালা গানটি আরো প্রাচীন। অছি মিঞার পিতা 'গোল বদনের শিকার কাহিনী এই পালার বিষয়বস্তু। গ্রাম্য ভাষায় রচিত এই পালা গানটিতে প্রাকৃতের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তেজনামূলক শিকার কাহিনীটি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি রচনার মধ্যে যে গতি ও নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন, তা চমৎকার। ইহা এতো স্বাভাবিক যে, আমরা যেন এই ছন্দের তালে তালে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হস্তীর পদক্ষেপ, ঝরণায় জল পান, শিকারীদের বিকট চীৎকার ও অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ শুনতে পাই। এই পালা গানের রস জীবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক। যেমন খেদায় বন্দী হাতীর বর্ণনা ঃ

"সপ্ সপা সপ্ গুম্ গুমা গুম্ হাতীর আবাজ
দুনিয়াতে রোজ কেয়ামত হবে বুঝি আজ।
হাতী যদি ভাঙে খেদা পরান লৈয়া টান,
স্থানে স্থানে মুসলমানে ফুকারে আজান।
হিন্দুবলে 'জয়কালী', মঘে বলে 'ফরা'
এইবার প্রভু নিরঞ্জন সঙ্কটেতে তরা।
এম্নি কালে কী হইল শুন বিবরণ
হাবুই ছাড়ে, গোল্লা ফুডায় যত চৈক্কালগণ।
উজাল জ্বালিয়া তারা রাইতরে করে দিন
কাংসাডংত বাড়ি মারে বাজায় মোষর শিং॥
ধুনির আগুন তখন ছুঁইল আছমান
বাহিরের জংলা ধাইল লৈয়া নিজের জান॥"

www.pathagar.com

কমল সদাগর

এই পালাটিও আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক চট্টগ্রামের নবুচন্দ্র ধুপি এবং আরো কয়েকজন মাঝি গায়কের নিকট থেকে সংগৃহীত। আশু বাবু মনে করেন, এই কাহিনীর কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু দীনেশ বাবু এমত মানেন না। তাঁর মতে, রূপকথা সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দশার কাহিনী। এ কাহিনী তারই অন্যতম। তিনি মনে করেন ইহা 'শীত বসন্ত' নামক পালা গানটির রূপান্তর।

পালাটির ঘটনা তেমন কবিত্বগুণ সম্পন্ন নয়। তবে প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদের পরই কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে এবং নাট্যগুণ সমন্বিত হয়ে উঠেছে। সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের প্রসংগ থাকলেও কবির রচনা অশ্লীলতা মুক্ত। পল্লীর খুঁটি-নাটি বর্ণনায়, নৈসর্গিক চিত্র অংকনে কবি সিদ্ধহস্ত।

মহফুলা দাসীর চরিত্র কবির সৃষ্টি ক্ষমতার সাক্ষ্য। কমল সদাগরের দ্বিতীয় বিবাহের পত্নী সোনাইয়ের প্রতি গোবর্ধনের প্রেম সমাজের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হলেও কবি অত্যন্ত নিপুণতার সংগে তার ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। সোনাই নবযৌবনা; সে ভাবে "সদাগর শুকা কাঠ, মাদার লাকড়ি, রসের আনটনে আমি শুকাইয়া মরি।" কমল সদাগরের বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্র কর্মচারী গোবর্ধন। প্রথমে সে খুবই ভালো লোক ছিল, কিন্তু—

"তেতুল লাড়িলে কেহ মুখর কাছে আনি
কেমনে সম্বরি হায়রে রাখে জিব্বার পানি,
গোবর্দ্ধন ভুলি গেল সে নিমকের গুণ
ভিতরে গুজরি তার উঠিল আগুন।"

দুশ্চরিত্রা নারীর কুহকে পড়ে মনুষ্যত্বের কী বিপর্যয় ঘটে তারই প্রমাণ, গোবর্ধনের শেষ পরিণতি। সোনাই-এর পাল্লায় পড়ে তার এমনই অধঃপতন হয় যে, সে তার প্রভুর দুই শিশু পুত্র, চানমনি ও সূর্যমনিকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলো। সদাগর পত্নী সোনাই-এর ইন্দ্রিয় লালসা বর্ষার নদী প্রবাহের মতোই দুর্দাম, কিন্তু গোবর্ধন এগিয়েছে ভীত সংকিত পদে; প্রতি পদেই তার ভয়, আর আশংকা; হয়তো বিবেকের কষাঘাতও। কিন্তু ধীরে হলেও, যে ব্যক্তি এ পথে একবার যাত্রা করেছে তার আর ফেরার উপায় নেই, চরম অধঃপতনেই ঘটে তার শেষ পরিণতি।

www.pathagar.com

কাফন চোরা

১। 'কাফন' চোরা কাহিনীটির সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী। পটীয়ার হাইদগাঁও নিবাসী সেকান্দর গাইন, বোয়ালখালি থানার ধোরলা নিবাসী অলিয়র রহমান ও কোতোয়ালী থানার চরচাকতাই নিবাসী ওজু পাগলার নিকট থেকে তিনি পালাটি সংগ্রহ করেন।

২। চট্টগ্রামে যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভীষণ উৎপাত সেই যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর অন্যতম শাখা, কুর্মাই নদীর তীরে, গজালি গ্রামে নায়ক দস্যু মনসুরের জন্ম হয় বলে দীনেশ বাবুর অনুমান।

নিম্ন উপত্যকাবাসিনী চেঁউয়া পরীকে লুধা গাজী নামক এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি বলপূর্বক হরণ করে। তারই ঔরষে দস্যু মনসুরের জন্ম। সে আজিমের স্ত্রী আয়রা বিবির আশেক হয়েছিল—সে মারা গেলে তার কবর খুঁড়তে গিয়ে সে গৈবী চপেটাঘাত খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। বেহুঁশ অবস্থায় সে স্বপ্নে দেখে আয়রা বিবি তাকে আর ডাকাতি করতে নিষেধ করছে এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে নির্দেশ দিচ্ছে। নামাজ পড়তে গিয়ে এই পালার নায়ক মনসুরের পরিবর্তন হয়। নিজাম ডাকাইত, কেনারাম এবং সনসুর এই তিন পালার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তিনজনই দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করে সাধু হয়েছিলো। নিজাম ডাকাইতের পালাও চট্টগ্রামের সম্পদ।

"মনসুর ডাকাইত যে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল স্বপ্নদত্ত সেই আদেশ এই—সে ডাকাতি বা চুরি করা যদি না ছাড়িতে পারে তাহা হইলে সে সেই ব্যবসা চালাইতে পারিবে কিন্তু প্রতিদিন তাহাকে অন্তত পাঁচবার নামাজ পড়িতেই হইবে। এই আদেশ সে কতকদিন পর্যন্ত পালন করিয়া আসিয়াছিল। একদিন সে এক বড় ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছে। সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। পার্শ্বের লোহার সিন্দুক সে লৌহযন্ত্রের সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে তোড়া তোড়া টাকা, বিচিত্র অলংকার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি। তাহার অতি নিকটে গৃহস্বামী ও তদীয় স্ত্রী নিদ্রিত। দলের লোকেরা গৃহের চারিদিকে প্রতীক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে এই বিপুল অর্থ তাহার অধিগত হইবে এমন সময়ে অদূরে বৃক্ষ হইতে কুড়া পাখী ডাকিয়া জানাইল, ভোর হওয়ার আর বিলম্ব নাই। জানালা পথে সে দেখিল, পূর্বাকাশে সিঁন্দুরের রাগ পড়িয়াছে। হঠাৎ গ্রাম্য মসজিদ হইতে মোল্লাদের সমবেত কণ্ঠের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি শ্রুত হইল। মনসুর তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত; ধন রত্নের কথা

www.pathagar.com

তাহার স্মরণ নাই। আসন্ন বিপদকে সে যে আরও ডাকাইয়া আনিতেছে সে তাহা ভুলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার দুর্লংঘ্য প্রতিশ্রুতি তাহারে অধিকার করিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। সেইদিন সেই দস্যু পীর হইলেন, মনসুর ফকির হয়ে গেলো" এরপর ঃ

"কাফন চোরার কেহ আর না পাইল খবর
মাঝে মাঝে জংগল হইতে আসে এক পীর।
কদমে কদমে জবে আল্লাহর জিকির
মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে
আয়রার কবর পীর জিয়ারত করে।"

প্রেমের যাদুকরী প্রভাবে চরিত্রের বিবর্তন দেখানো এ কাব্যের লক্ষ্য। মনসুরের চরিত্রের ক্রমপরিণতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে।

এ পালাগানটির ভাষা অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিবেশ বর্ণনায় কবির সাফল্য অনস্বীকার্য ঃ

'দোলা যায় যায়রে দোলা অষ্ট বেরার কাঁধে
দোলার ভিতর নয়া বউএ গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁদে
মা বাপের মনেতে পড়েররে আরও ছোট ভাইএর মুখ
ঝিঁ ঝিঁ পোগর ডাক শুনি কাঁপি উডের বুক।
আগে পাছে বৈরাতি যায়, যায়রে ধীরে ধীরে
দক্ষিণা হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় উড়ে।

লুধার ঔরষ ও চেঁউয়া পরীর গর্ভজাত দুর্ধর্ষ মনসুর কীভাবে বেড়ে উঠেছে, পল্লী কবি তা নিম্নলিখিত ভাষায় বয়ান করেছেন ঃ

"দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্চার মতো
পূগের জঙ্গলের মাঝে ঘুরে অবিরত।"

লুটপাট এবং দস্যু-বৃত্তি মনসুরের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঃ

"মানুষ মারিতে বেটার দিলে দুঃখ নাই
খুশি হয় ধন-দৌলত সঙ্গীরে বিলায়।"

www.pathagar.com

মনসুরের রূঢ় বর্বর প্রকৃতির অন্তরালে যে একটি মহৎ মানুষের সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখানে, অতি চমৎকার করে কবি প্রকাশ করেছেন। অথচ ঃ

'দাফনের সম্বাদ যখন পায়রে মনসুর চোরা
রাইত নিশিতে শুরু করে মরার কয়বর খোড়া
আখেরের সম্বল চুরি করি নিশি রাইত
দোজকের রাস্তা কাডি লৈয়াছে ডাকাইত।'

নসর মালুম

প্রেম ও সতীত্বমূলক এই পালাগানটির সংগ্রাহক হচ্ছেন আশুতোষ চৌধুরী। তিনি এই কাহিনীর বেশীর ভাগ চট্টগ্রামের কাঠাল ভাংগার নূর হোসেন ভাজেয়ার নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। নূর হোসেনের পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে পালাগানের গায়েন। তাঁর পিতা কুরবান আলী ও দাদা হায়দর আলী এই পালা গায়কদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই পালাটির অংশ বিশেষ তিনি কাঠালভাংগার নিকটবর্তী মহিষমারা গ্রামের গুরু মিঞা নামক গায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ পালাটি তিনি প্রাপ্ত হন কর্ণফুলীর মোহনার নিকট রহমান নামক সাম্পানের একজন মাঝির নিকট।

কাহিনীটি সপ্তদশ শতকের শেষ দিকের রচনা বলে দীনেশ বাবু অনুমান করেন।

'মাঝির গাঁয়ের দরিদ্র হায়দর আলীর একমাত্র সন্তান আমিনা আর পিতা-মাতাহীন ভাগ্নে নছর এক সংগে খেলাধুলা করে, বড়ো হয়—'কৈতর কৈতরার মতো তারা দোন জন।" দু'জনেই দু'জনের উপর আশিক হয়ে ওঠে। "পুত নাই, ক্ষেত নাই বিয়ের উয়র আশা।" তাই হায়দর আলী ও আমিনার মা ভাগ্নের কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু "কাউয়ার বাসাৎ কোকিলার ছা পোষ মানলো না।" একদিন নছর গাঁয়েব হয়ে গেলো। ছয় বছর আর তার কোনো খোঁজ খবর নেই।

গাঁয়েই "মস্ত তোয়াঙ্গর" এছাক মিঞার বাড়ী; তার বিবি 'সেমাজান সুরতে' 'পুন্নমাসীর চান'কেও হার মানায়। খালি বাড়ীতে এছাক আমিনার সাথে দেখা করে 'পানের বিড়া আর ভলা নারিকেল তেল নিয়ে। কিন্তু আমিনা তার সাথে কথা বলে না ঃ

"পানির সঙ্গে তেল মিশে না, চিনির সাথে নূন
এছাকের সঙ্গে তেমনি আমিনা খাতুন।"

www.pathagar.com

অগত্যা একদিন এছাক মিঞা হায়দরের কাছে আমিনাকে শাদি করার প্রস্তাব দেয়। আর বলে—

"আষ্ট কানি জমি দিব শংক নদীর কূলে
ভরি ভরি সোনা দিব কান হাতে চুলে।"
আর—
"তোমরারে পালিবাম সারা জীবন ভরি।"

দরিদ্র দম্পতি প্রলুব্ধ হয়ে কন্যা আমিনার মত জিগ্‌গেস করে— কিন্তু আমিনা রাজি হলো না, সে দুঃখে দানাপানি ছেড়ে দিলো। বুধা গুণীণের সাহায্যে এছাক আমিনার মন জয় করতে চাইলো, দারু টোনায় বুধা ওস্তাদ। বুধার তেল পড়া মুখে মেখে এছাক একদিন হায়দরের বাড়ী গিয়ে হাজির; 'খৈশীর' বাড়ী যাবে বলে আমিনার মা ও বাপ আগেই আমিনাকে ঘরে একলা রেখে বেরিয়ে গেছে। এছাককে দেখে আমিনা খাতুন কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

এদিকে নছর 'রুম' নামক জাহাজের লস্কর হলো— কার্য-দক্ষতার গুণে, সে 'মালুম' পদে উন্নীত হয়ে বহু ধন-দৌলত উপার্জন করে। একবার বাণিজ্য উপলক্ষে 'অঙ্গী' নামক শহরে গিয়ে 'মাফো পোয়াজা'র পরমা সুন্দরী কন্যা এখিনের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। 'অঙ্গীতে মেয়েরা অবাধে চলাফেরা ও প্রেম করে বেড়ায়। এখিনকে বিয়ে করে নছর আমিনার কথা একদম ভুলে গেলো।

আমিনার দুঃখের সীমা নেই। কারণ—
"খোদায় ছুরুত দিয়ে ছুরত হৈয়ে বৈরি।" তবু
"নারীর দৌলত সতীপনা রাইখতে যদি চায়
এমন পুরুষ কেহ নাই কাড়ি লৈয়া যায়।"

সে ইল্‌সাখালির কূলে, আশি বছরের বুড়ো খেতিয়াল গফুরের বাড়ীতে পেলো আশ্রয়; ঘরে 'গুজা' বুড়ি আছে, সে চোখে দেখে না, গফুরের গরু-মোষ আর ধন-ধান্য অঢেল, সে হলো তার ধর্মের বাপ।

দক্ষিণ সাগরে 'চর পরীদিয়া' নামক স্থানে শুট্‌কি মাছের বিরাট কারবার; মাফো তার খবর পেয়ে, জামাতা নছর মালুমকে সেখানে সস্তায় শুট্‌কি কিনতে পাঠায়। শুট্‌কি বোঝাই করে মাঝির গাও এসে শুনতে পায়—আমিনার মা-বাপ মরে গেছে, আর 'বেশ্যামতি' আমিনা—

www.pathagar.com

"তারারে ফালাইয়া শেষে বজ্জাত সে মাইয়া
লোভৎ পড়ি কন দেশেতে গেইয়ে ধাইয়া।"

নছর আর দানাপানি মুখে দিলো না। জাহাজে চড়ে সে সমুদ্রে ভাসলো আর প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ গিয়ে আটকা পড়লো "গোবর্ধ্যার চরে"। সেখানে হার্মাদের দল হামলা করলো তাদের উপর। সমস্ত মাল-মাত্তা, বেসাত লুট করে ডাকাতেরা নছর মালুমসহ তার দলের সবাইকে বেঁধে নিয়ে চললো।

এদিকে, গফুরের গুজা বুড়ি মরে গেছে। আমিনার কথা চিন্তা করে করে গফুরের ঘুম হয় না। সাত বছর হলো, নছরের খবর নেই, কাবিনের শর্ত মত তালাক হয়ে গেছে। এখন তার আবার বিয়ে করা উচিত, কারণ ঃ

'কয়বরে ডাকিছে মোরে শুন মোর মাও'।
কিন্তু আমিনা- কিছুতেই রাজি হলো না। সে বললো—
"মা বাপরে ছাড়ি আইলাম ছাইড়লাম বাড়ী ঘর
শাদি দিতে চাইল বলি মা-বাপ হৈল পর।"

কন্যার মন বুঝে গফুর আর কিছু বললো না, কিছুদিন পর, একদল মগ এসে গফুরের বাড়ীর এক পড়ো ভিট খুঁড়ে দশঘড়া সোনার মোহর পায়, এবং দুঘড়া গফুরকে দিয়ে যায়। বুড়ো কিছুদিন পর সমস্ত সম্পত্তি আমিনাকে সঁপে দিয়ে মারা গেলো। এদিকে এছাক আমিনার মাকে হাত করে, তিনটি লোক দিয়ে আমিনাকে ধরে নিয়ে যায়। অঙ্গী শহরে মাকো পোয়াজ নছর মালুমের ফিরতে বিলম্ব দেখে এখিনের আবার অন্যত্র বিয়ে দেয়। জানের ভয়ে নছর অঙ্গী ছেড়ে পালিয়ে আসে। টাকা নেই, পয়সা নেই, পথের ভিখারী হয়ে নছর উত্তর মুলুকে ঘুরে ঘুরে ফিরে। একদিন সে স্বপ্ন দেখলো—আমিনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ

"সন্তিপনা রাইখ্যে কন্যা রাইখ্যে জাতি কূল।"

যৌবন কলসী আজো তার ভরাট রয়েছে, 'এই ফুল ঝরাও নহে, বাসিও নহে। আমিনাকে লুট করে নিয়ে নানাভাবে তার মন জয়ের জন্য চেষ্টা করেও যখন এছাক সফল হলো না, সে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো। কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী এসে আমিনা ভাঙ্গা ঘরে বসে রইলো। সেখানে রাত্রির অন্ধকারে হানা দিলো এছাক ঃ

'হরিণীরে পাইয়ে বাঘ ধরিবে কামড়ি।'

www.pathagar.com

কিন্তু নছর মালুমের এক আঘাতেই সে খতম। এরপর নছর আর আমিনার মিলন হলো ঃ

"কথাবার্তা নাই তাহার চোগৎ বয় পানি।"

এই পালা গানটিতে আমিনা চরিত্রটি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে অংকিত হয়েছে। প্রেম ও সতীত্বের ভাস্কর প্রতিমা এই আমিনা—নছর মালুমের চরিত্রটি এই নারী চরিত্রটির নিকট অনুজ্জ্বল।

এ গানটি আর একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা এতে পাওয়া যায়। পর্তুগীজ জলদস্যুও হার্মাদদের উপদ্রব এবং শায়েস্তা খান কর্তৃক মগ-বিতাড়নের ফলে দক্ষিণমুখী 'মগ-ধাওনি' ঐতিহাসিক সত্য। পালা গানটিতে 'মগ-ধাওনি'র কথা আছে। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দীনেশ বাবুর অনুমান—পালাটি ঐ সময়ের কিছু পরে রচিত হয়ে থাকবে। পালায় উল্লেখিত 'দিয়াঙ্গের পাড়ি' হচ্ছে আধুনিককালের দিয়াঙ্গের বন্দর, 'গোবধ্যার চর' কর্ণফুলীর মোহনার নিকটবর্তী একটি চর, এবং পরীদিয়া অথবা 'শাহ্-পরীদিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

নুরুন্নেহা ও কবরের কথা

৬৩২ পঙক্তিতে সম্পূর্ণ এই পালাটি ১৯২৮ সনে আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। 'বড় উঠান' গ্রামের জমিদার আলী খাঁর নিকটে পালাটির সংবাদ পেয়ে আশুতোষ তাঁর সাথে দেখা করেন, তাঁর কাছে তিনি পালা গায়ক, বুড়ো সাম্পান-মাঝি হায়বত আলীর খবর পান এবং পেশকার হাট নামক গ্রামে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর সাম্পান ভাড়া করে হায়বত আলীর সাথে এক ক্ষুদ্র নদীতে আট ঘন্টাকাল সাম্পানে কাটান। সাম্পান বাইতে বাইতে হায়বত আলী এই সুদীর্ঘ আটঘন্টা ধরে এই গান গেয়ে যান। হায়বত এতো সুকণ্ঠ ছিলেন যে এ এলাকার লোকেরা তাঁর গানকে 'জীবনের একটি প্রধান আনন্দোৎসব' বলে মনে করতো।

কোতোয়ালী থানার চর-চাকতাই গ্রাম নিবাসী হাসীম খাঁ, বোয়ালখালির 'পূবদিয়া' নিবাসী গুণা মিঞা এবং রাউজানের নোয়াপাড়া গ্রামের পৈথান চন্দ্র দে নামক কৃষকের নিকট পালাটি শুনে আশুতোষ বাবু তা সম্পূর্ণ করেন।

www.pathagar.com

কাহিনী

দেয়াঙ পাহাড়ের পিছনে নয়াচর 'রঙ্গদিয়া'য় আজগর খেতিয়ালের বাস। তার একমাত্র কন্যা নুরুন্নেহা পরমা সুন্দরী, তার উঠন্ত যৌবন। চৈতালি বায়ুতে পশ্চিম সাগর যখন ডাকতে শুরু করে তখন "আপন যৌবন কন্যা ফিরি ফিরি চায়।"

এদিকে দেওগাঁয় পরম ধার্মিক নজু মিঞা তার একমাত্র ছেলে মালেককে রেখে মারা গেছে। নজু মিঞা যতো দিন বেঁচে ছিলো ততোদিন আজগরের সাথে তার সদ্ভাব ছিলো না মোটেই। তখন আজগরও বাস করতো দেওগাঁয়, নজু মিঞার সামনাসামনি বাড়ীতে। একবার বাণিজ্য করতে গিয়ে নজু মিঞা মারা যায়। মালেক এতিম হয়ে পড়ে; মা নেই, বাপ নেই, ঘরে এক বুড়ো দাদী আছে। আজগর ও তার বউ এতিম মালেকের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে ওঠে, মালেক আজগরের 'শাদা দিল' দখল করে বসলো। মালেকের দুঃখে নুরুন্নেহারও 'পরান পোড়ে'। নুরুন্নেহার মা তাকে আদর যত্ন করতে থাকে। এই সুযোগে নুরুন্নেহা ও মালেকের সম্পর্ক নিবড়তরো হয়ে ওঠে—তারা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে। নুরুন্নেহার

"যৌবন উট্টে বসন ফাড়ি, ওরে কলসী কাঁকে লই
চোগে চোগে চাহি নুর চলি যাইত গই।"

"রৈস্যা রোসিকা ভইন" নুরুন্নেহা মালেককে ঘুম থেকে তুলে লঙ এলাচি দিয়ে পানের গোলাপী খিলি খাওয়ায়। মালেক হুকা আর বেনা নিয়ে যায় মাঠে—যেখানে আজগর চাষ করে—

"আইলর পাড়ত বসিয়ারে তারা দোনজন
খুশী হৈয়া খাইতরে ভাত বাপ পুতর মতন।"

এলাকাটি এরি মধ্যে একদিন 'গরকি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেলো। আজগরের সর্বস্ব গেলো। মালেক যে কোথায় ঢেউএর সাথে ভেসে গেলো তার কোনো হদীসই পাওয়া গেলো না। নিরুপায় আজগর স্ত্রী কন্যা নিয়ে দেওগাঁও ছেড়ে রঙ্গদিয়ার চরে কুটীর তৈরি করলো—

"স্তিরি কন্যা লইয়া আজগর থাকে রঙদিয়ায়
সুখে দুঃখে এক মতন দিন কাডি যায়।"

www.pathagar.com

এদিকে মালেক বহু জায়গা ঘুরে দেওগাঁর খালি ভিটা দেখে রঙ্গদিয়ার চরে এসে হাজির। নুরুন্নেহা তাকে পরম যত্ন করে খাওয়ায় তার বাপের সংগে বসিয়ে, এবং রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন সে উঠে পড়লো—অবুঝ মন কিছুতেই মানা মানলো না—

'মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে
হরা চাপা দিলেরে ভাত যেমন করে ফুটে।

নুরুন্নেহা সেই নিঝুম রাতে মালেকের কাছে গিয়ে হাজির হলো। এমনি করে দিন-রাত তারা "পীরিতির রসে ভাসতে" থাকে। এরি মধ্যে একদিন হার্মাদেরা আজগরের বাড়ী আক্রমণ করে তার টাকা পয়সা সব লুটে নিলো; এবং নুরুন্নেহা আর মালেককেও বেঁধে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের মাঝে জেলেরা ডাকাতদেরকে হারিয়ে মালেক ও নুরুন্নেহারকে উদ্ধার করে। বেহুশ নুরুন্নেহার হুশ ফিরিয়ে আনতে ওদের খুবই কষ্ট করতে হয়। হুশ ফিরে এলে—

'ইছুপরে পাইল যেন জোলেখা সুন্দরী'। মালেক নুরুন্নেহারকে নিয়ে রঙ্গদিয়ার চরে ফিরে এলো। বাপ-মার সুখ আর ধরে না।

প্রেম কিছুতেই গোপন করা যায় না—
"আউনে উনায় ঘি-ও যদি কাছে থাকে
ছাড়াই দিতে ন পারেঁরে যদি পীরিত থাকে।
নুনা পানি ছাকি রৈলে ন যায়রে নুন
দিনে দিনে বাড়ে পীরিত এমনি তার গুণ।
পাষাণের দাগ পীরিত মনে পৈলে আঁকা
যত না গোপনে হৌকরে না থাকিব ঢাকা।"

আজগর নুরুন্নেহা ও মালেকের মতিগতি বুঝতে পেরে মালেককে কাছে ডেকে নিয়ে বললো—নুরুন্নেহার সাথে তার শাদি হতে পারে না। কারণ, মালেক ও নুরুন্নেহার মা একই, তারা ভাই-বোন হয়। নজু মিঞা খুব ধুমধাম করে বিয়ে করলেও, মালেকের জন্মের পরই তাকে নানা জনে নানা কথা বলতে থাকে, তখন নজু তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। সেই অসহায় নারীকেই পরে আবার নিকা করে আজগর, তারই গর্ভে জন্ম হয়েছে নুরুন্নেহার। মালেক এ কথা শোনার পর আর ঘরে ফিরে এলো না, বিরাগী হয়ে এক বালাম নৌকায় চড়ে দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেলো। এদিক আজগর, নুরুন্নেহার কী উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা মালেকের জন্য! কিন্তু মালেক এলো না।

www.pathagar.com

কিছু কাল পরে আজগর, তার স্ত্রী ও নুরুন্নেহা সবই একের পর এক বসন্ত হয়ে মারা গেলো। পাঁচ বছর পর, মস্তবড়ো তোয়াঙ্গর হয়ে মালেক রঙ্গদিয়ার চরে ফিরে এসে সব কিছু শুনে প্রচণ্ড এক আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়লো। সমুদ্রের পারে সে খুঁজে পেলো তাদের তিনটি কবর। তারি একটির উপর সে গিয়ে শুয়ে পড়লো। দিন গেলো, রাত এলো, তার হুশ নেই। শেষ রাতে সে শুন্‌তে পেলো, নুরুন্নেহা কবরের ভেতর থেকে যেন বলছে তার গায়ে গোশ্‌ত আর লৌ শিরা না থাকলেও সে মালেকের কথা ভুলেনি, গিরা খুলেনি ঃ

'খুলিত নাই গিরারে ভাই রইয়ে মনর বান
মওতেও হামিশ খন কাঁদে পরান নান।

দাঁড়ি মাল্লারা বহু টানাটানি করলো, তবু মালেক আর গেলো না। সেই মালেক হলো মালেক পাগলা।

কাব্য বর্ণিত রঙ্গদিয়ার চর, দেওগাঁও, পাঁচ গৈরা, কালা পানি, উজানটেক, লালদিয়া ও সোনাদিয়া দ্বীপ চট্টগ্রামের কতিপয় স্থানের নাম। এই গ্রাম ও দ্বীপগুলি এখনো বর্তমান আছে। শুধুমাত্র 'ধান-চিবান্যা ও আণ্ডার চর বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত।

এই পালাটিতে পর্তুগীজ হার্মাদদের উৎপাতের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

নুরুন্নেহা চরিত্রটি অংকনে অজ্ঞাতনামা পল্লী কবি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন পল্লী সাহিত্যে তা বিরল। মালেক চরিত্রটি তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। 'নুরুন্নেহা যেন স্বভাবের শিশু। প্রেমই তাহার জীবন এবং তাহার বাঁচিবার উপাদান ও অবলম্বন।' (দীনেশ সেন)'

সূজা তনয়ার বিলাপ

এই পালা গানটি শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী সংগ্রহ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের অন্যতম ভ্রাতা সূজা ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পরিণাম স্বরূপ বিতাড়িত হয়ে কিছুকাল ঢাকায় বসবাস করেন। তারপর সেখান থেকে হস্তী-পৃষ্ঠে চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমায় নাফ নদীর তীরে উপনীত হলে আরাকানের রাজ প্রতিনিধি তাঁকে অত্যন্ত তাজিমের সাথে স্বাগতম জানান।

www.pathagar.com

প্রায় সকল ঐতিহাসিকই আরাকান রাজের মহানুভবতা ও সহৃদয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, আরাকান রাজ শাহ্ সূজা ও তাঁর পরিবার পরিজনবর্গের জন্য একটি সুন্দর দালান বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শাহ্ সূজার কন্যার রূপে মোহিত হয়ে আরাকানরাজ সন্দ-সুধম্ম তাঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলে, একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় শাহ্ সূজাকে পত্নী পরীবাণু ও একটি কন্যাসহ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে মারা হয়।

'রাজ-মালা'র গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্রের মতে, "সূজার পত্নী পরীবানুর রূপ ও গুণ গাঁথা এক সময়ে বঙ্গে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। সে সকল গ্রাম্য গীতি এখন বিস্মৃতির সাগরে বিলীন হইয়াছে।" 'সূজা-তনয়ার বিলাপ' নামক ক্ষুদ্র গীতিটিও একই জাতীয়। ইহা সম-সাময়িক কোনো অজ্ঞাত চাষী-কবির রচনা বলে অনুমিত হয়। সূজা পরিবারের বিয়োগান্ত পরিণতি এবং বঙ্গোপসাগরে তাদের শেষ সমাধি, স্বাভাবিকভাবে এই এলাকার তৎকালীন বাসিন্দাদের মধ্যে গভীর সমবেদনা ও কারুণ্য উদ্রেক করেছিলো। সন্দ-সুধম্মর মুসলিম সভাসদ, তাঁর কাব্যে যা অতি গোপনে ও রেখে-ঢেকে বর্ণনা করেছেন, নিরক্ষর চাষী কবির হাতে তা-ই হয়ে উঠেছে আবেগের তীব্রতায় প্রচণ্ড। কেউ কেউ এ গীতিকাটিকে বাড়বানলের সাথে তুলনা করেছেন—এর "একদিকে তরঙ্গায়িত নয়নবারি এবং অন্যদিকে ধুমায়মান বহ্নি।" শোকাহত, অপমানিত সূজা-তনয়া একবার বলছেন ঃ

"দুরগত্যা পরাণ আমার ন যায় নিকলি
তুইষর আইল্যা হৈয়েরে বুগ উডের জ্বলি জ্বলি।"

আবার অন্য সময় তিনি রাগে, বিক্ষোভে আহতা ফণিনীর মতো ফুসে উঠ্ছেন, এবং চাষী রমনীর ভাষায় গালি দিয়ে উঠ্ছেন ঃ

"কন্ সতীনর পুতর সঙ্গে করিলি ছুহুক।"

মগরাজা সন্দ-সুধম্ম সূজা, পরীবাণুও তাদের একটি কন্যাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে নিহত করে এবং সূজার অপর কন্যাকে বলপূর্বক তার অন্তঃপুরে বন্দী করে। সম্ভবতঃ এই কন্যাকে নিয়েই শাহ্ সূজার সাথে তার মনোমালিন্যের কারণ ঘটেছিল। জগজ্জয়ী তাজমহলের নির্মাতা শাহ্ জাহানের পৌত্রী মাছ পঁচিয়ে তৈরি করা 'নাপ্পি' খেতে, কালো "থামী" ও কানে সোনার 'নাধং' পরতে বাধ্য হয়েছিলেন। সূজা তনয়ার এ দুঃখ

www.pathagar.com

ও মর্মবেদনা বর্ণনা করার ভাষা নেই বটে, তবু পল্লীর নিরক্ষর চাষী কবি এ নিয়ে যে পালা গান রচনা করেছেন, তাতে সীমাহীন দুঃখের অনেকখানিই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ভাষার নমুনা ঃ

"কু সাহাতে আইলরে বাপ মঘ্যা রাজার দেশে
কুলও দিলি মানও দিলি জানও দিলি শেষে।
ধন-দৌলত লৈয়ারে তুই পোলালি কার ডরে
সোনার জেয়র হীরামতি রাখিলি কার ঘরে।

অথবা

আচমানেরি ফুলরে ছিলাম আচমানেরি ফুল
মঘ্যা রাজার হাতে পড়ি দিলাম জাতি কুল।
সাইগরের তলে মা বাপ করিলি কয়বর
হার্মাদ্যার মুল্লুকে আমার কে লৈব খবর।"

পরী বানুর হাঅলা

'সুজা' তনয়ার বিলাপের অনুরূপ এই পালাটিও আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার আনরাবাদ গ্রামের খলিলুর রহমান ও আরাকানের মংডু মহকুমার মৌলবী আবদুল হালিমের নিকট থেকে এ পালা গানের কিছু অংশ তিনি সংগ্রহ করেন। বেশীর ভাগ সংগ্রহ করেন পেরুয়া দ্বীপের উজান টেইয়া গ্রাম নিবাসী মনসুর আলীর কাছ থেকে। পেরুয়া দ্বীপের ঐ অঞ্চলটিতে এ পালা গানটি 'পরী বানু হাঅলা' নামে পরিচিত।

এই পালা গানটিতে আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণকারী হতভাগ্য সুজার জীবনের শেষ কয়দিনের কাহিনী করুণ রসাত্মক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সুজা ও তাঁর পত্নী পরী বানুর কাব্য বর্ণিত এই পরিণতি ইতিহাস-সম্মত কিনা তা বলা মুশকিল, তবে এ কাহিনী যে পাঠক মাত্রকেই বিচলিত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ গানটিতে জানা যায়, সুজা ও পরী বানুকে আরাকানরাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়ে মারেন নি,

www.pathagar.com

বরং তাঁরা আরাকান রাজের দুরভিসন্ধি থেকে নিজেদের ইজ্জত রক্ষা করার অভিপ্রায়ে নিজেদের কন্যা দু'টিকে রেখে রাত্রিযোগে নৌকায় করে বঙ্গোপসাগরে ভেসে পড়েন। বাদশাহ্ সুজা ধরলেন নৌকার হাল। কিন্তু সমুদ্রের বুকে ক'দিনই বা অমন করে চলে? অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়ে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সুজা। কালাপানিতে এসে তাঁর নৌকা ডুবুডুবু—তখন বাদশাহ্ ও বেগম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে—তাজমহল নির্মাতা শাহ্জাহানের পুত্র ও পুত্রবধুর অন্তিম শয্যা রচিত হলো বঙ্গোপসাগরের তলায়।

এ গীতিকাটির ভাষা কারুণ্যের গভীরতায় মর্মস্পর্শী।

কবি যখন বলেন ঃ

'ভাইয়ে চাইলো ভাইয়ের লোউ মিছা রাজ্যর লাগি
গরীব গুইন্যা বেশী ভালা যারা খায় মাগি।
কিসের রাজ্য কিসের ধন কিসের টাকা কড়িরে
সাইগরে ডুবালি পরীরে'-

তখন ইতিহাসের পটভূমিতে মানব জীবনের একটা করুণ, একটা পরম সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে।

ভ্রাতা আওরঙ্গজীব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সুজা স্ত্রী-কন্যাসহ রোসাঙ্গরাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন— কিন্তু হায়,

'ভোগালুয়ে ভাত চায় তিয়াসিয়ে পানি
পানিরে পাইলে নন্দী বুকে লয় টানি।

নসিবের দোষে আরাকানরাজ তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো, কারণ,

'পরীর লাগিয়া রাজা হইল পাগল।'

'দেশ নাই, রাজ্য নাই, না আছিল দুখ', কিন্তু বিদেশ বিভুঁয়ে যে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলো, তারই লুব্ধ নজর পড়েছে পরীবানুর উপর। এ দুঃখ রাখার ঠাঁই কোথায়? দু'জনে সলাপরামর্শ করে, ইজ্জত বাঁচানোর জন্য, এক আরাকানী জেলেকে পরীবানুর সোনার হার উপহার দিয়ে, প্রভাতকালে 'পরথম জোয়ারের 'হু হু করা পানিতে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন—সুজার হাতে নৌকার বৈঠা ঃ

www.pathagar.com

'বেমান দরিয়ার মাঝি নয়া এক মাঝি
আওরতে লইয়া সঙ্গে পাড়ি দিয়ে আজি।'

তারপর, মাঝ দরিয়ায় এসে, 'ঢেউ-এর বাড়ি খেয়ে

'ডুপিল ডুপিল নৌকা—সূজা পরীজান
দরিয়ার মাঝে হায় দিলরে পরাণ।
মরণেও রৈল তারা বুক জড়াজড়িরে—
সাইগরে ডুবালি পরীরে।'

লোক সাহিত্যের আরো কয়েকটি দিক

উপরে আলোচিত পালাগানগুলি ছাড়াও চট্টগ্রামে আরো বহু পালাগান, বারমাসী ও কিস্‌সার খবর পাওয়া গেছে। এর কিছু কিছু সংগৃহীত এবং প্রকাশিতও হয়েছে। এই কিস্‌সা, পালাগান ও বারোমাসীগুলির নাম 'নসিরাম বাদশার কিস্‌সা', 'গোরফ বাদশার কিস্‌সা', 'কাঁশ বাশী ও বাঁশ বাশী', 'রাখাল রাজা', 'আলু-কালুর বারোমাস, 'রাধার বারোমাস, 'সীতার দশমাসী', 'সীতার বারোমাসী, 'নিমাই-এর বারোমাসী', প্রভৃতি। এসব গানের রচয়িতা ও কাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শেষোক্ত পাঁচটি বারোমাসী বাদ দিলে, বাকী পালাগান ও কিস্‌সাগুলি চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত; এগুলিতে কবিত্বগুণ বেশি কিছু নেই, চরিত্র-চিত্রণও বৈশিষ্ট বর্জিত। আঞ্চলিকতাই এগুলির বিশেষ গুণ। বারোমাসীগুলি বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় রচিত এবং চট্টগ্রামী ভাষার কোনো প্রভাব এগুলির উপর দেখা যায় না। এসব শিক্ষিত লোকের রচনা বলে মনে হয়। এই পাঁচটি বারোমাসী সংগ্রহ করেছেন চট্টগ্রাম ধলঘাটের শ্রীআদিনাথ সরকার। বারোমাসীগুলির নামেই বিষয়বস্তুর বিজ্ঞাপন রয়েছে।

এগুলিকে বাদ দিলে আরো যেসব পল্লীগীতির সন্ধান পাওয়া গেছে তা বৈচিত্রে, ব্যাপকতায় বিস্ময়কর। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা নিয়ে চট্টগ্রামের নিরক্ষর লোকেরা গান রচনা করেননি। বাচ্চাদের মাথা কামানোর গান থেকে শুরু করে নাতিনের গান, বিয়ে-শাদীর গান, রোদ আর বৃষ্টির গান, ঘুম পাড়ানি গান, মা-বাপের বিলাপের গাণ, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী খেলোয়াড়ী গান—ইত্যাদি অজস্র রকমের গানে চট্টগ্রামের পল্লী গান সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের শাদি-বিয়ের গানকে 'হাঁহলা বা 'হঁলা বলে। ঘুম পাড়ানি গানগুলিতে মাসী-পিসীর স্থান গ্রহণ করেছে "নিদ্রাউলী মাউ"।

www.pathagar.com

এ জাতীয় পল্লগীতিগুলির কিছু কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া যাচ্ছে ঃ

মেয়েলী গান ঃ

"ছিবা গাছত বৈস্যের তোতা
মা'রে জ্বালাতি,
মায় দিয়ে দস্তর খান
বাপে দিয়ে শাড়ি,
সেই শাড়িখান যদ্দুর লম্বা
খুল্যা মায়ুর বাড়ী॥
খুল্যা মাঁউ ভাত খাইত বৈস্যে
হানক ভরা লই
মুঙ্গি মিঞা পুঁথি পড়ের
মালত্যা লই।
মালত্যা বেজার অইয়ে
কুরার ঠেংগান লই॥"

নীচের দু'টি পদে বুড়োর তরুণী-স্ত্রীর মনোভাব অতি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"বুজ্যা যদি মরে
কুদাল ভাঙ্গি নথ্ গড়াইম
নাকে যত ধরে।"

রোদ এবং বিষ্টির জন্য চট্টগ্রামী ভাষায় অনেক ছড়া আছে। রোদের একটি ছড়া নিম্নরূপ ঃ

'রইদলে রইদানী
চাঁদার মারে পুতানী
চাঁদার হাতে বৈল ফুল
চিড়চিড়ি মারি রৈদ তুল।
উইর তলে ধোরা হাপ
ফালদি উঠ্যে বৌয়র বাপ
বৌয়র বাপ চতুরা
দরগ্যার পানি মথুরা।"

www.pathagar.com

খরায় যখন দেশ-জুড়ে 'হা পানি' 'হা পানি' রব ওঠে তখন চাটগাঁর মানুষ বিষ্টির ছড়া কাটে ঃ

"মেঘ রানিরে ঠেং ধুই ধুই পানি ফেলা পানিরে
ঠেংরে পানি ন পাইয়া
হাইল্যা মরে ঠাঁডাইয়া
হাইল্যা তারা সাত ভাই
নাকল ধুইত পানি নাই
মোল্লা তারা পাঁচ ভাই
অজু বানাইত পানি নাই
ধুইজ্জা তারা দোন ভাই
কাপড় ধুইত পানি নাই
মেঘ রানিরে ঠেঙ ধুই ধুই ফেলা পানিরে।" ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের একটি ঘুম পাড়ানি গানের নমুনা ঃ

"ঘুম যারে দুধের বাছা
ঘুম যারে তুই
ঘুমরতন উডিলে বাছা
লই বেরাইয়ম মুই।
সোনার দিয়ম ঢুলইন কোঁডা
রূপার দিয়ম দড়ি
ঢুলইনের বাইর কাইর দি
চারজন দিয়ম চৌকিদার প্রহরী।
বাইরগ্যা বাঁশর বেতর ঢুলইন
অমোর কেরাগ বেতর বান
সেই ঢুলইনে ঢুলিবরে যাদু
মোর পূর্ণ মাসীর চাঁন।
ঝর পড়েরলে ফোড়া ফোড়া
বাইরে ভিজের লাই
দুধের বাছা ঘুম যাদ্দে
সোনার ঢুলইন পাই।"

www.pathagar.com

একটি বিরহের গান নিম্নরূপ ঃ

সূর্য উডের লে ভাই লাল মারী,
রস্যা বন্ধু ছাড়ি গেল গৈ রে বুগত ছেল্ মারি।
শংকর খালর কূলর উয়র ও ভাই রস্যা বন্ধের ঘর
লাগত পাইলে কইয়রে তারে আমার পরাণের খবর।
নিদয়া বন্ধের জ্বালায়রে পরাণ আমার যায় ছাড়ি।
শংকর খালর পানিরে কালা, কালারে দুশ্‌মন
তারতুন অধিক কালা ও ভাই পাষাণ বন্ধুর মন।
ফিরিয়া ন চাইল বন্ধুরে অবলারে গেল ছাড়ি।
কইয়রে কোকিলা বন্ধু পাষাণ বন্ধের ঠাঁই,
এতোদিনে পীরিতের নারী তোমার এ জগতে নাই—
পাইল্লে একবার কইয় বন্ধুরে—
মরা মুখখান চাই তারি।

রুহের সংগে দেহের সম্পর্ক একটি গানে পোষা ময়না পাখির রূপকে অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"আমারি পালনা ময়না কোন্ বনে যায়রে
আমারি চুটালী ময়না কোন্ বনে যায়রে।
ঝাঁকে থাকে ঝাঁকে উড়ে
ঝাঁকে আদার খায়রে—
আমারি পালনা ময়না কোন্ বনে যায়রে।
যাইবারে না কালে ময়না ফিরিয়া ন চায়রে॥"

এসব ছড়া প্রেমগীতি ছাড়া চট্টগ্রামে অনেক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতামূলক গানেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। গীতি কবিতা আলোচনাকালে সুফীভাবাপন্ন কবিদের কারো কারো নাম উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু যেসব গানের রচয়িতার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না সে সবের সংখ্যাও নেহায়েৎ নগন্য নয়। এসব ছড়া ও গানের কিছু কিছু চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হলে একটা মূল্যবান সম্পদের সাথে দেশের সুধী মহলের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে।

www.pathagar.com

গ্রন্থ পঞ্জী

১। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ঃ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ঃ

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

২। পুঁথি পরিচিতি ঃ আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশ্যারদ,

সম্পাদনা-আহমদ শরীফ

৩। Antiquity of Chittagong : S.C Das. JASB 1898

৪। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ঃ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

৫। মুসলিম বাঙ্‌লা সাহিত্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক

৬। আরাকান রাজসভায় বাঙ্‌লা সাহিত্য ঃ ডক্টর এনামুল হক

আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

৭। History of Bengal, Voll. II : Ed. by Sir Jadunath Sarcar

৮। চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানো আমল) ঃ মাহবুব-উল-আলম

৯। চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল) ঃ মাহবুব-উল-আলম

১০। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ ডক্টর সুকুমার সেন

১১। ইসলামি বাঙ্‌লা সাহিত্য ঃ ঐ

১২। বাঙ্‌লা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৩। An Advance History of India : Dr. R. C. Majumdar

১৪। বাঙ্‌লা লোক-সাহিত্য ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৫। মধ্যযুগে বাঙ্‌লা ঃ শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়

১৬। সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্যা ঃ ১৩৬৭

www.pathagar.com

১৭। সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ গোপাল হালদার

১৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ ডঃ দীনেশ সেন

১৯। ভারতবর্ষ ঃ ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

২০। বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী অবধি পটভূমি ঃ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা- ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার *চতুর্থ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা)

২১। বাংলা পুথি সাহিত্য Pakistan Publications

২২। পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আদামুদ্দিন (মাসিক মোহাম্মদী)

২৩। ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসে মুসলমান ঃ বাঃ এঃ পঃ ৫ম বঃ ১ম সঃ

২৪। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ঃ এস, এম, ইকরাম

২৫। মানব ধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ ঃ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

২৬। সাময়িক পত্রে বাঙলা সমাজ চিত্র ঃ ১ম খণ্ড, বিনয় ঘোষ

২৭। Social History of Muslims of Bengal by :

Dr. Abdul Karim.

২৮। পূর্ববংগ গীতিকা ঃ তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

২৯। পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

৩০। মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(মাহেনও, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮)

৩১। চট্টগ্রামী বাঙলা রহস্য ভেদ ঃ ডঃ এনামুল হক

৩২। মধু মালতী ঃ সম্পাদনা, আহমদ শরীফ

৩৩। বাঙলা ভাষাতত্ত্বেও ভূমিকা ঃ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩৪। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড) ঃ গোপাল হালদার

৩৫। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড) ঃ গোপাল হালদার

#########

www.pathagar.com

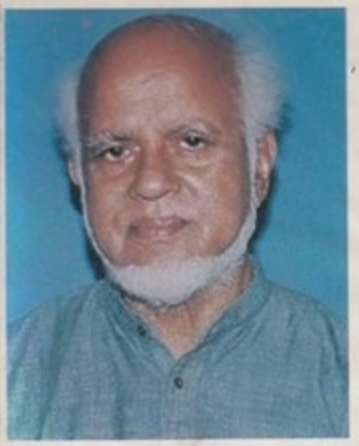

বাংলা ভাষার প্রখ্যাত গল্পকার, প্রবন্ধকার, অনুবাদক, সাবেক এম.পি.এ. ইসলামিক ফাউণ্ডে-শনের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শাহেদ আলীর জন্ম দায়িরপুর থানার মাহমুদপুর গ্রামের ১৯২৫ সালে। তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রভাতী, সৈনিক, দৈনিক বুনিয়াদ, ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা, সবুজপাতা সম্পাদনা করেন। তিনি বগুড়া আজীজুল হক কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, বাংলা কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইস-লামিক ফাউণ্ডেশনের পরিচালক হিসাবে ১৯৮২ ইং সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক শাহেদ আলী বাংলা ভাষার অন্য-তম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে উপন্যাস হৃদয় নদী, গল্প গ্রন্থ জিব্‌রাইলের ডানা, একই সমতলে, শা'নযর, অতীত রাতের কাহিনী, নতুন জমিনদার, অমর কাহিনী, শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প। সাহিত্যের জন্য তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, জালালাবাদ স্বর্ণপদক সহ আরো অনেক পদক। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, আবুজর গিফারী কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজ এলাকায় মোয়াজ্জমপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

www.pathagar.com

BANGLADESH CO-OPERATIVE BOOK SOCIETY LTD.

ISBN : 984-493-019 -7

www.pathagar.com